ড. নাজীহ ইবরাহীম

আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে

সন্দীপন

ইসলাম আমাদের তাদের মতো হতে আদেশ দেয়, আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে তারা ভয় করত না।” (সূরা আল-আহ্যাব : ৩৯) কিন্তু এই শক্তিমত্তা আজ অনেক দাঈ-র ভেতরেও দেখা যায় না। মিথ্যের কাছে পরাজয় মেনে নিয়েছে তারা। এখন তারা নিজেদের কাছে থাকা সত্যের ব্যাপারে লজ্জিত। এখন তারা মিথ্যের কাছে সন্তুষ্টি ভিক্ষা করছে। করজোড়ে বলছে, “হে মনিব! দয়া করে আপনার সাথে আমাকে শান্তিপূর্ণভাবে করতে দিন। আমার মধ্যে এমন কিছু নেই যা আপনাকে দুশ্চিন্তায় ফেলবে। আমি আপনার মতোই। মানুষকে কল্যাণ, জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের দিকে ডাকি।” কী দুর্ভাগ্য আমাদের! দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা একে বাতিল শক্তির সাথে ইসলামকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে! সত্যকে টুকরো টুকরো করে এক নতুন ইসলাম গড়ে তুলতে চাচ্ছে, যাতে কাফিররা খুশি হয়। অনেকেই তো আবার ইসলামকে শাসকদের স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। ইসলামকে শাসকের প্রাসাদের চাকর বানিয়ে সমাজতন্ত্র বা পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগাচ্ছে। নিজেদের এবং অন্যদের নফসকে সন্তুষ্ট করতে আজ সত্যের আহ্বানকারীরা জেনেশুনে সত্য গোপন করছে। এসব পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে নিজেদের সঁপে দিতে পারি, সে জন্যেই এই লেখনী।

আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে

মূল :

ড. নাজীহ ইবরাহীম

শাইখ আসিম আবদুল মাজিদ

শাইখ ইসামুদ্দীন দারবালাহ

তত্ত্বাবধান :

ড. শাইখ উমার আব্দুর রাহমান (রাহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদ :

আশিকুর রহমান

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁর প্রশংসা করি ও তাঁর সাহায্য কামনা করি। আমরা তাঁর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করি এবং আমাদের নিজেদের মধ্যকার খারাবি ও আমাদের কাজকর্মের খারাবি থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও বার্তাবাহক।

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আলেমগণ হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী।"[১]

হকপন্থী আলেমগণ হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণের পর তাঁরাই জনগণের নেতা। তাঁরা মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে পরিচালিত করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দ্বীন শিক্ষা দেন। তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ মহান ও প্রশংসনীয়। তাঁরা সত্যের বাহক, হিদায়াতের মাধ্যম ও নবীগণের উত্তরসূরি। তাঁরা আল্লাহকে খুব বেশি ভয় করেন, নিজেদের কাজকর্ম সংশোধন করতে থাকেন এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে সচেতন থাকেন।

শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, চরিত্র-কর্ম, কথা-আচরণ সবকিছুতে তাঁরা নবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ফলস্বরূপ, নবীগণের মতোই তাঁরা দুঃখকষ্টে আপতিত হন। নবীগণের মতোই হকপন্থী আলেমগণ জেল-জুলুম,ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও হত্যার সম্মুখীন হন। তাঁরা যেখানেই যান, সেখানেই উচিত কথা বলেন 'যেন আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"(সূরা আত-তাওবা ৯:৩৩) আর এ কাজ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আলেমদের চড়া মূল্য দিতে হয়।

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কিয়ামাতের

---

[১] সহীহ ইবনু হিব্বান : ৮৮

একটি লক্ষণ হলো ইলম হারিয়ে যাওয়া এবং অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়া।[২]

ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, "নিশ্চয় আলেমগণের মৃত্যুর মাধ্যমেই কেবল ইলম হারিয়ে যাবে।"[৩] এই জামানায় শুধুমাত্র হক কথা বলার কারণে নির্যাতন ভোগ করা আলেমের সংখ্যা কতই-না কমে গেছে! কাউকে হত্যা করা হয়েছে, কাউকে কারাবন্দি করা হয়েছে, কাউকে করা হয়েছে গৃহবন্দি।

"*আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে*" বইটি "মীসাকুল আমালিল ইসলামি" (ইসলামি কাজের রূপরেখা) গ্রন্থের অনুবাদ। এর লেখক তিনজন আলেম : ডক্টর নাজীহ ইবরাহীম, আসিম আবদুল মাজিদ এবং ইসামুদ্দীন দারবালাহ। মিশরের 'লিমান তুররাহ' কারাগারের ভেতর থেকে ১৯৮৪ ঈসায়ি সনের ফেব্রুয়ারি মাসে এটি প্রকাশিত হয়। বইটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ডক্টর শাইখ উমর আব্দুর রহমান, যিনি কেবলমাত্র হক কথা বলার অপরাধে আমেরিকার কারাগারে দীর্ঘ তেইশ বছর কাটিয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

বর্তমান যুগে ইসলামি আন্দোলন কেমন হতে হবে, তার একটি পরিপূর্ণ রূপরেখা তুলে ধরেছেন লেখকগণ। 'আকীদা থেকে দাওয়াত, জিহাদ থেকে খিলাফাত, তাকওয়া থেকে সবর—এই সবকিছু কীভাবে প্রতিটি মুসলিমের জীবনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একসাথে কাজ করে, তা দেখানো হয়েছে। আর সেই উদ্দেশ্য হলো পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। কারাবন্দি আলেমদের লেখনী থেকে উঠে এসেছে আজকের মুসলিমদের সার্বিক অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র।

বইটি এমনিতেই চমৎকার। তার ওপর সুপরিকল্পিত পন্থায় ইসলামকে জানার জন্য যদি এই বইটিকে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তা হলে আরো ভালো। পাঠচক্রে ব্যবহার করার জন্য বইটি অসাধারণ ও সহজবোধ্য। কুরআনের জ্ঞান ও অন্যান্য প্রাথমিক কিতাবাদি অধ্যয়নের পাশাপাশি এই বইটি অধ্যয়ন করলে বর্তমান যুগের ইসলামি কর্মীরা খুবই উপকৃত হবে।

আল্লাহ তাআলা লেখকদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। এই বইটিকে তাঁর দ্বীনের গৌরব পুনরুদ্ধারের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য আমাদেরকে কাজ করার সামর্থ্য দিন এবং সেগুলোকে আমাদের নেক আমলের পাল্লায় যোগ করে আখিরাতে সাফল্য দিন। আমীন।

---

[২] বুখারি : ৫২৩১ ; মুসলিম : ২৬৭১
[৩] ফাতহুল বারী, ১/২৩৯, হাদীস নং ৮০

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি ও তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করি। আমরা তাঁরই কাছে ক্ষমাভিক্ষা করি এবং আমাদের নিজেদের মধ্যকার খারাবি ও আমাদের কাজকর্মের খারাবি থেকে তাঁরই নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।"[৪]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একজন মাত্র ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন; এবং সেই দুজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (অধিকার) চেয়ে থাকো। আর (সতর্ক থাকো) জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[৫]

---

[৪] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০২

[৫] সূরা আন-নিসা, ৪ : ১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সরল-সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে ত্রুটিমুক্ত করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে লাভ করে মহাসাফল্য।"[৬]

অতঃপর...

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি তাদের জমিনে খিলাফাত দান করবেন, যেমনটা তাদের পূর্ববর্তীদের আল্লাহ দান করেছিলেন। আর তিনি (ইসলামকে) তাদের জন্য পছন্দ করেছেন, সেই দ্বীনকে কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করবেন। আর তিনি তাদের ভয়ভীতিপূর্ণ অবস্থা পরিবর্তন করে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, কোনোকিছুকে আমার সাথে শরিক করবে না।"[৭]

আল্লাহ আমাদের বিজয়, সাফল্য, কর্তৃত্ব ও গৌরব দান করার ওয়াদা করেছেন। উম্মাহর এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় এই ওয়াদা এক উজ্জ্বল আলোকচ্ছটার ন্যায়। এই উম্মাহ দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ব শাসন করেছে। এর মাধ্যমে দূর-দূরান্তে খিলাফাত বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর কিতাবের দ্বারা ভূমিগুলোকে শাসন করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে সেই একই উম্মাহ আজ অপমান ও লাঞ্ছনার তিক্ত স্বাদ ভোগ করছে। অতীত গৌরব কেবল টিকে আছে শিশুদের ছড়াগানে। বিশাল খিলাফাত টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিরাষ্ট্রে। কিছু চলে গেছে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের দখলে, কিছু শাসিত হয় মূর্তিপূজারি ও নাস্তিকদের হাতে, আর কয়েকটি কথিত ইসলামি রাষ্ট্রে দখল করে আছে কিছু সেক্যুলার শাসক।

---

[৬] সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১

[৭] সূরা আন-নূর, ২৪ : ৫৫

শত্রুরা দলে দলে আমাদের দিকে ধেয়ে এসেছে। ভ্রান্ত বিশ্বাস-মতবাদ, তন্ত্র-মন্ত্র, দর্শন, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র, সংবিধান—সব রূপ ধরে তারা সম্মিলিত আক্রমণ করছে। কারো অন্তরে আছে গোপন বিদ্বেষ আর কারো আছে পুরোনো শত্রুতা।

এই উম্মাহর ওপর ইতিহাসে যত আঘাত এসেছে, তার মাঝে সবচেয়ে মারাত্মক আঘাতগুলোর একটি প্রত্যক্ষ করেছে বিংশ শতাব্দী। আর তা হলো খিলাফাতের পতন। তাদের ষড়যন্ত্র যদি খিলাফাত ধ্বংস করার মধ্যেই শেষ হয়ে যেত, তা হলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু তারা এরপর মুসলিমদের ভেতরে অদ্ভুত সব বিশ্বাস-মতবাদ ও তন্ত্র-মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের দ্বীনের বুঝকে কলুষিত করেছে। যখনই আমরা জেগে উঠে দ্বীনে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালাব, তখনই আমাদের সামনে বুদ্ধিবৃত্তিক বাধা হয়ে দাঁড়াবে ভালো-মন্দের মিশ্রণে গড়া এসব মতবাদের সমষ্টি। সত্য হয়ে যাবে অস্পষ্ট আর আমরা হব পথভ্রষ্ট। হারাব দ্বীন ইসলামের সঠিক বুঝ। এই হলো আমাদের অবস্থা। অথবা বলা চলে, শত্রুদের ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় আমাদের অজ্ঞতা ও অলসতার এই হলো পরিণাম।

তাই বলে বিশ্বাসস্থাপনকারী ও সৎকর্মশীলদের প্রতি আল্লাহর এই ওয়াদা কিন্তু মুছে যায়নি :

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ

> "তিনি তাদের জমিনে খিলাফাত দান করবেন, যেমনটা তাদের পূর্ববর্তীদের আল্লাহ দান করেছিলেন। আর তিনি (ইসলামকে) তাদের জন্য পছন্দ করেছেন, সেই দ্বীনকে কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করবেন। আর তিনি তাদের ভয়ভীতিপূর্ণ অবস্থা পরিবর্তন করে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন...।"[৮]

সত্যি বলতে এই উম্মাহর প্রথম দিককার প্রজন্ম সাহাবিগণ নিজেদের ইসলামি শিক্ষার প্রতি সঁপে দিয়েছেন এবং ইসলামের এই শিক্ষাকেই নিজেদের ঐক্যের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন বলেই আল্লাহ তাঁদের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব দান করেছেন। এরপর তাঁরা সামষ্টিক ও পরিকল্পিত কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী ইসলামের শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেছেন। এটিই তাঁদের সাফল্যের রহস্য।

আমাদের যদি কোনো একদিন ঘুম থেকে উঠে দ্বীনে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় আর শত্রুদেরকে চ্যালেঞ্জ করার ইচ্ছা জাগে, তা হলে এই একই পথে হেঁটেই সাফল্য লাভ করতে হবে। আমাদের ও আমাদের পূর্বসূরিদের মাঝে যে বিশাল ব্যবধান তৈরি হয়েছে, তা পূরণ করতে দ্রুত কাজ করতে হবে। তাঁদের মতো করে দ্বীনের বুঝ অর্জন করে

[৮] সূরা আন-নূর, ২৪ : ৫৫

তাঁদেরই মতো করে ইসলামের জন্য প্রচেষ্টা ও জিহাদ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর সাহাবিগণ ও তাঁদের সত্যনিষ্ঠ অনুসারীগণকে হুবহু অনুসরণ করার কোনো বিকল্প নেই।

ইমাম আওযাঈ সত্যই বলেছেন, "ধৈর্য ধরে সুন্নাহর অনুসরণ করতে থাকুন। সালাফগণ যা বলেছেন, তা আঁকড়ে ধরে রাখুন। তাঁরা যা বলেছেন, তা-ই বলুন। তাঁরা যা থেকে বিরত থেকেছেন, তাতে জড়িয়ে পড়বেন না। আর ন্যায়নিষ্ঠ পূর্বসূরিদের (সালফে সালেহীনদেরকে) অনুসরণ করুন। তা হলেই আপনি তা অর্জন করতে পারবেন, যা তাঁরা অর্জন করেছিলেন।"

এ জন্য আমাদের প্রথমেই যা শিখতে হবে তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে হুট করে নিজে কিছু না বলে বসা, নিজেদের কণ্ঠস্বরকে রাসূলের কণ্ঠের চেয়ে উচ্চ না করা, অন্য সব রকম আনুগত্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের আনুগত্যে আবদ্ধ হওয়া। তা হলেই দ্বীনের পুনরুজ্জীবনের পথে প্রথম ধাপ পেরোনো সম্ভব হবে।

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّـهُ مَن يَنصُرُهُ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে।"[১]

এ লক্ষ্যেই আমাদের প্রচেষ্টা এই বই—*আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে*। এর মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—যেন শরীয়তের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তাদের আন্দোলনে অনুপস্থিত না থাকে। আর তারা যেন সকল ব্যাপারে নিজেদেরকে শরীয়তের হুকুম আহকামের প্রতি সমর্পণ করে।

এখানে বর্ণিত মূলনীতিগুলো দ্বীন ইসলামে কোনো নব-উদ্ভাবন বা সংযোজন নয়। বরং এগুলো অকাট্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত বিধান, যা কোনো মুসলিম অস্বীকার বা অবজ্ঞা করতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত, দ্বীনের জন্য কাজ করা অধিকাংশ কর্মীর মন থেকেই এসব বিষয় মুছে গেছে। কিছু লোক হয়তো কয়েকটি মূলনীতি জানে, কিন্তু বাকিগুলোকে দামই দেয় না। আবার কেউ কয়েকটি মূলনীতি অনুযায়ী কাজ করে আর বাকিগুলো এড়িয়ে যায়।

শরীয়তের এসব মূলনীতি ও মৌলিক বিষয়গুলো যেহেতু অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যেতে চাইছেন, তাই উম্মাহকে এসব ব্যাপার স্মরণ করিয়ে দেওয়াকে আমরা দ্বীনি দায়িত্ব মনে করছি। এর মাধ্যমে আমরা এসব মূলনীতির বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও অনুসরণের নিয়ম তুলে ধরতে চাই। ইসলামি আন্দোলনের দৃঢ় প্রত্যয়ী কর্মীরা যেন পথ চলতে গিয়ে

[১] সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ৪০

মাঝপথে দিশা হারিয়ে ছত্রভঙ্গ না হয়ে যায়, সেজন্যই পুরো পথের চিত্রটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে আমাদের এই প্রচেষ্টা।

এ পথ বৈচিত্র্যময় ও দুর্গম। তারপরও শরীয়তের এমন সব আবশ্যক মূলনীতি রয়েছে, যা না মানলে বিজয়ের সব আশা শেষ হয়ে যাবে। একবার যদি মানুষের মনে এসব মূলনীতি স্পষ্ট ও বদ্ধমূল হয়ে যায়, তা হলেই এগুলোর ভিত্তিতে একটি চিন্তাগত ঐক্য গড়ে তুলে কর্মক্ষেত্রে সামনে আগানো সম্ভব হবে। অনেকে এই বুদ্ধিবৃত্তিক ঐক্যকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল লোকসংখ্যা বাড়ানোকেই গুরুত্ব দেয়। ঐক্যের জমিতে তারা আসলে নিজের অজান্তেই বপন করে অনৈক্য ও ভাঙনের বীজ। চিন্তাগত ঐক্যবিহীন একটি দল হলো নানা রকম মত-পথের একটি স্তূপ মাত্র, যা প্রথম পরীক্ষার আঘাতেই ভেঙে ছন্নছাড়া হয়ে যাবে। এমনকি এর একটি অংশ অপর অংশের সাথে সংঘাতেও জড়িয়ে যেতে পারে।

ইসলামের কল্যাণে কাজ করতে চাওয়া কোনো সংগঠনের কর্মীরা যদি শরীয়তের মূলনীতির ব্যাপারেই কোনো ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে না এসে থাকে, তা হলে তাদের উচিত নিজেদের কয়েকটি প্রশ্ন করা।

- আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কী?
- আমরা কী বিশ্বাস করি?
- আমরা যা বিশ্বাস করি, তা কীভাবে বিশ্বাস করি?
- আমাদের লক্ষ্য কী?
- এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের কর্মপদ্ধতি কী?
- আমাদের চলার পথের পাথেয় কী হবে?
- আমরা কাদের সাথে মিত্রতা করব?
- আমাদের শত্রুই-বা কারা?
- আমাদের এই জমায়েতে কারা যোগ দিতে পারবে?
- আমরা আমাদের সাথে কাদেরকে নেব না এবং কেন?

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এসব প্রশ্নের উত্তর কেবল ইসলাম থেকেই গ্রহণ করতে হবে। সেই ইসলাম, যা আল্লাহ ওহির মাধ্যমে রাসূল ﷺ-কে জানিয়েছেন, যেভাবে রাসূলের সাহাবিগণ তা বুঝেছেন, যেভাবে আমাদের সালফে সালেহীনগণ আমাদেরকে শিখিয়েছেন। আমরা যদি সঠিক কাজ করি, তা হলে তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে।

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّـهِ

"তোমার কাছে যে কল্যাণই পৌঁছায়, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।"[১০]

সব প্রশংসা আল্লাহর। আর আমরা যদি ভুল করে থাকি, তা হলে তা আমাদের দোষ।

وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ

"কিন্তু তোমার ওপর যা কিছু (বিপদ-আপদ) আপতিত হয়, তা তোমাদের নিজেদের পক্ষ হতে।"[১১]

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ
লীমান তুররাহ কারাগার, মিশর
২৫ জামাদিউল উলা, ১৪০৪ হিজরি

[১০] সূরা আন-নিসা, ৪ : ৭৯
[১১] সূরা আন-নিসা, ৪ : ৭৯

আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে

১. একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিজেদেরকে বিশুদ্ধভাবে সমর্পণ করা

২. সত্যিকার অর্থেই তাঁর রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করা

আবূ সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতিদের ডেকে বলবেন, 'হে জান্নাতিরা!' তারা জবাব দেবে, 'আমরা হাজির, হে আমাদের প্রতিপালক! সকল কল্যাণ আপনারই হাতে।' তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমরা কি এখন সন্তুষ্ট?' তারা জবাব দেবে, 'কেন হব না, হে আমাদের প্রতিপালক? আপনি তো আমাদের এমন সব অনুগ্রহ দান করেছেন, যা আপনার অন্য কোনো সৃষ্টিকে দান করেননি।' তিনি তারপর তাদের বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এরচেয়েও উত্তম কিছু দেব না?' জান্নাতিরা জানতে চাইবে, 'এর চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে?' আল্লাহ বলবেন, 'আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম এবং এরপর আর কখনোই তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।'"[১২]

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনার সন্তুষ্টি অন্য যে-কোনো সুযোগ-সুবিধার চেয়ে অধিক উত্তম। আমরা আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করাকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে ও অগ্রে স্থান দিই। এভাবে আমরা নবীজি ﷺ-এর অনুকরণ করতে চাই। কারণ তিনি জান্নাতের দুআ করার আগে আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের দুআ করে বলেছেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাত চাই।"

আল্লাহ তাআলাই আমাদের কাছে সবচেয়ে দামি এবং তিনি সবচেয়ে মহান। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অন্য যে-কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের চেয়ে বেশি সাধনা করা প্রয়োজন।

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّـهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আর সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটাই হলো বিরাট সাফল্য।"[১৩]

---

[১২] বুখারি : ৬৫৪৯; মুসলিম : ৭৩১৮

[১৩] সূরা আত-তাওবা, ৯ : ৭২

আল্লাহ তাআলাই প্রথম, তাঁর পূর্বে কিছুই ছিল না; তিনিই সর্বশেষ, তাঁর পর আর কোনোকিছু থাকবে না; তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে, তাঁর ঊর্ধ্বে কিছু নেই; তিনি সর্বনিকটে, তাঁর চেয়ে নিকটবর্তী কোনোকিছুই নেই। তিনি শাশ্বত, আর তিনি সকল কিছুর রিযিকদাতা ও রক্ষাকর্তা। তিনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ, তিনি সবকিছু দেখেন, সর্বময় প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান, সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী, তাঁর জন্য সবকিছু সহজ, আর তিনি কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী নন।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

"কোনোকিছুই তাঁর সমকক্ষ বা সদৃশ নয়। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।"[১৪]

তিনিই সবকিছুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনেন এবং বিপর্যস্তকে সহায়-সম্বল দান করেন দেন। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি মৃতদেরকে পুনরুত্থিত করেন। আর কিয়ামাতের দিন তাঁর কাছেই হবে আমাদের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন। তিনি যাকে ইচ্ছা, দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন। আর যার শাস্তি প্রাপ্য, তাকে ন্যায়বিচার করে শাস্তি দেবেন।

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾

"এই হলেন তোমাদের প্রতিপালক, সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। কাজেই তোমাদেরকে কোন দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে?"[১৫]

তাঁর সুউচ্চ সত্তা ব্যতীত সবই ধ্বংস হবে।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

"পৃথিবীপৃষ্ঠে যা আছে সবই ধ্বংসশীল। কিন্তু চিরস্থায়ী তোমার প্রতিপালকের চেহারা, যিনি মহীয়ান, গরীয়ান।"[১৬]

তাই কী করে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর অন্য কোনোকিছুকে প্রাধান্য দিতে পারি? কী করে আমরা মিছে নিরাপত্তা ও সুখের আশায় আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়ে জড়িয়ে পড়তে পারি?

---

[১৪] সূরা আশ-শুরা, ৪২ : ১১
[১৫] সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ৬
[১৬] সূরা আর-রাহমান, ৫৫ : ২৬-২৭

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

"অতএব, দৌড়াও আল্লাহর দিকে, আমি (মুহাম্মাদ) তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে স্পষ্ট সতর্ককারী।"[১৭]

আমাদের নবীজি আমাদের শিখিয়েছেন যে আমাদের রব্ব আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমাদের সবচেয়ে বড় আশ্রয়। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "আমি এক রাতে আল্লাহর রাসূলকে বিছানায় না পেয়ে তাঁকে খোঁজ করতে গেলাম। মসজিদে আমার হাত হঠাৎ তাঁর পায়ের তালু স্পর্শ করল। সেগুলো সিজদাহ করার ভঙ্গিতে উঁচু ছিল আর তিনি বলছিলেন,

اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্রোধ থেকে আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই। আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার আশ্রয় চাই। আমি আপনার থেকে আপনারই কাছে আশ্রয় চাই। আমি কখনোই আপনার (প্রাপ্য) যথাযথ প্রশংসা করতে পারব না। আপনি আপনার নিজের যেমন প্রশংসা করেছেন, আপনি তেমনই।"[১৮]

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি হাসিল করা এমনই গুরুত্বপূর্ণ এক লক্ষ্য, যার সামনে অন্য সব লক্ষ্য মুহূর্তেই বিলীন হয়ে যায়।

وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾

"আল্লাহই শ্রেষ্ঠতর (ফিরআউনের প্রতিশ্রুত পুরস্কারের চেয়ে) এবং স্থায়ী (ফিরআউনের হুমকি দেওয়া শাস্তির চেয়ে)।"[১৯]

আল্লাহর সন্তুষ্টি যে পেয়ে গেল, সে তার প্রয়োজনীয় সবকিছুই পেয়ে গেল। আর যে এটি হারাল বা এর থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, সে সবই হারাল। এরাই এমন সব ব্যক্তি যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ

[১৭] সূরা আয-যারিয়াত, ৫১ : ৫০

[১৮] তিরমিযি : ৩৫৬৬; ইবনু মাজাহ : ১১৭৯

[১৯] সূরা ত্বা-হা, ২০ : ৭৩

"...আর তার কানে ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন আর তার চোখের ওপর টেনে দিয়েছেন পর্দা। তা হলে আল্লাহর পরে আর কে আছে যে তাকে সঠিক পথ দেখাবে?"[২০]

যারা মনেপ্রাণে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তাদের তা দান করেন। এটি বান্দার প্রতি আল্লাহর দেওয়া একটি শ্রেষ্ঠ রহমত।

اللَّـهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন তাঁর পথে বেছে নেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে তিনি তাঁর পথে পরিচালিত করেন।"[২১]

হিদায়াতকামনাকারী কোনো বান্দাকে আল্লাহ তাআলা ফিরিয়ে দেন না। বরং তাকে হিদায়াত পেতে সহায়তা করেন।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"যারা আমার জন্য সংগ্রাম-সাধনা করবে তাদেরকে আমি আমার পথ দেখাবো।"[২২]

হাদীসে কুদসিতে এসেছে, "আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার ব্যাপারে যে-রকম ধারণা রাখে, আমি তেমনই। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও নিজে নিজে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে জনসমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমি তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার কাছে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।'"[২৩]

আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু কী করে আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হতে পারে? আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "হে আমার বান্দারা! আমি জুলুম করাকে নিজের জন্য হারাম করেছি আর তোমাদের জন্যও হারাম করেছি। অতএব, একে অপরকে জুলুম কোরো না। হে আমার বান্দারা! আমি যাদের হিদায়াত করি তারা ব্যতীত তোমাদের সবাই পথভ্রষ্ট।

[২০] সূরা আল-জাসিয়াহ, ৪৫ : ২৩
[২১] সূরা আশ-শুরা, ৪২ : ১৩
[২২] সূরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৬৯
[২৩] বুখারি : ৭৫৩৭, মুসলিম : ৭০০৬

অতএব আমার নিকট হিদায়াত চাও, আমি তোমাদের হিদায়াত দেব। হে আমার বান্দারা! আমি যাদের খাবার খাওয়াই, তারা ব্যতীত তোমাদের সকলেই ক্ষুধার্ত। অতএব আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদের খাদ্য দেব। হে আমার বান্দারা! আমি যাদের পোশাক পরাই, তারা ব্যতীত তোমাদের সকলেই উলঙ্গ। অতএব আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদের পরিধান করাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা তো দিন-রাত গুনাহ করতে থাকো আর আমি তোমাদের ক্ষমা করি। অতএব আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার ক্ষতি করতে চাইলে ক্ষতি করতে পারবে না। আবার আমার উপকার করতে চাইলে উপকারও করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন যদি সবচেয়ে ধার্মিক ব্যক্তিটির সমান ধার্মিক হয়ে যায়, তা হলে তা আমার রাজত্ব একটুও বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন যদি সবচেয়ে পাপিষ্ঠ ব্যক্তিটির সমান পাপিষ্ঠ হয়ে যায়, তা হলে তা আমার রাজত্বে একটুও কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন যদি কোনো জায়গায় উঠে আমার কাছে দুআ করে, আর আমি প্রত্যেককে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু দিয়েও দিই, তা হলে আমার ভাণ্ডার থেকে ততটুকুই কমবে, সুচের আগায় করে পানি তুললে সাগর থেকে যতটুকু কমে।"[২৪]

আল্লাহ তাঁর ওলি বা প্রিয় বন্ধুদেরকে রক্ষা করেন ও সাহায্য করেন। কে না চায় আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করে সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে শামিল হতে?

إِنَّ اللَّـهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের রক্ষা করেন।"[২৫]

আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসিতে বলেন, "যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলির সাথে শত্রুতা করে, তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করি...।"[২৬]

আমাদের তো অবশ্যই সে-সকল ওলিগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। একই হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ সেসব সৌভাগ্যবানদের ব্যাপারে বলেন, "আমার বান্দা আমার নিকট প্রিয় যে কাজের দ্বারা আমার নৈকট্য সবচেয়ে বেশি লাভ করে, তা হলো ফরয ইবাদতসমূহ। এরপর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। আমি যখন তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার শ্রবণক্ষমতা হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, আমি তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই যা

---

[২৪] মুসলিম : ৬৭৩৭

[২৫] সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ৩৮

[২৬] বুখারি : ৬৫০২

দিয়ে সে দেখে, সেই হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে, তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। আর সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায়, তা হলে অবশ্যই তাকে আশ্রয় দান করি।"

আমরা তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করতে চাই এবং তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের সাথে আখিরাতে জান্নাতে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা রাখি।

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

"হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই আর তোমরা দুঃখিতও হবে না। যারা আমার আয়াতসমূহ বিশ্বাস করেছিলে এবং অনুগত ছিলে, তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীরা সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। তাদের কাছে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র। তোমাদের মনে যা চাইবে, আর যাতে চোখ পরিতৃপ্ত হবে সেখানে এরকম (সবকিছুই) আছে। তোমরা তাতে চিরকাল থাকবে। এই হলো জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমাদের। কারণ তোমরা (সৎ) কাজ করতে। তোমাদের জন্য এখানে আছে প্রচুর ফল, যা থেকে তোমরা খাবে।"[২৭]

এতকিছুর পরও কি আমাদের অন্য কোনো লক্ষ্য থাকতে পারে?

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ

"বলো, যে অন্ধ আর যে দৃষ্টিশক্তিধর, তারা কি সমান হতে পারে? অথবা অন্ধকার কি আলোর সমান?"[২৮]

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾

"কে বেশি সৎপথপ্রাপ্ত? যে মুখে ভর দিয়ে উল্টো হয়ে চলে, নাকি যে সোজা হয়ে সরল সঠিক পথে চলে?"[২৯]

[২৭] সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩ : ৬৮-৭৩
[২৮] সূরা আর-র'দ, ১৩ : ১৬
[২৯] সূরা আল-মুলক, ৬৭ : ২২

মুসলিমের জীবনের এই চূড়ান্ত উদ্দেশ্যই তার চলার পথকে আলোকিত করে; তার প্রচেষ্টার রূপরেখা ঠিক করে দেয়; তার পদক্ষেপ, কাজকর্ম ও অবস্থানের মাত্রা নির্ধারণ করে দেয়। তাকে মাটিতে হাঁটতে দেখা যায়, অথচ তার মন থাকে আসমানে। সে কখনো সামনে অগ্রসর হয়, কখনো থেমে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করে। কখনো দ্রুত কাজ করে, কখনো ধীরেসুস্থে। প্রয়োজনে কথা বলে, প্রয়োজনে চুপ থাকে। এ সব কাজই সে করে ওই এক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য। আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘিত হওয়া তার কাছে অসহ্য। কারণ এমনটা করলে তার লক্ষ্য অটুট থাকবে না, বাধা পড়ে যাবে। সে কিছুতেই সময়ের অপব্যবহার করে না। ক্রমহ্রাসমান সময়ের একটি মুহূর্তও যেন রব্বের অসন্তুষ্টিতে না কাটে, এ ব্যাপারে সে সদা সচেতন!

চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ঠিক রাখার আরেকটি উপকারিতা হলো, লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যমগুলোও ঠিক হয়ে যাওয়া। উদ্দেশ্য ঠিক আছে বলেই যেন-তেন একটা রাস্তা অবলম্বন করার কোনো অধিকার তার নেই। বরং উদ্দেশ্য ঠিক করে নেওয়ার সাথে সাথেই নির্ধারিত হয়ে গেছে তাকে কোন রাস্তায় চলতে হবে আর কোন রাস্তায় সে চলতে পারবে না। লক্ষ্য যদি হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি, তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর হুকুমের বাইরে গিয়ে কোনো পথই অবলম্বন করা যাবে না। সালাফদের প্রচেষ্টাই থাকত জীবনে কেবল একটি বিষয় নিয়েই মাথা ঘামানো—কীভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি হাসিল করা যায়। এর ফলেই দুনিয়াবি কামনা-বাসনাকে দূরে ঠেলে তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে বিদ্যমান যে-কোনো বাধা-বিপত্তি সহজে পার হয়ে যেতে পারতেন। এভাবেই তাঁরা ধার্মিকতা, জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতায় সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হয়ে আছেন। তাঁদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার যথাযথ প্রতিদান আল্লাহ তাঁদের দিয়েছেন।

আমরা আজকের মুসলিমরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টিকে পেছনে ছুড়ে ফেলে দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে। আর কেউ কেউ ভাবছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করার পাশাপাশি সকল দুনিয়াবি উদ্দেশ্যও পূরণ করা সম্ভব। এমন লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ

"পরস্পরবিরোধী একাধিক মালিকের দাস।"[৩০]

আল্লাহ তাআলা কোনো শরিক গ্রহণের মুখাপেক্ষী নন। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিও চায়, আবার অন্যান্য উপাস্যদের সন্তুষ্টিও চায়, তাদেরকে আল্লাহ সেসব মিথ্যা উপাস্যের কাছেই সোপর্দ করে দেন। এজন্যই আজকের মুসলিমরা সংখ্যায় এত বেশি হওয়ার পরও

---

[৩০] সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ২৯

উত্তাল সাগরে ভাসমান ফেনার মতো হয়ে গেছে। তুচ্ছাতি-তুচ্ছ বিষয়েও অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, আপন খেয়ালখুশি আর ধর্মদ্রোহিতা নিয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ছে। ঠিক নবীজি ﷺ-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে গেছে। খাবার খাওয়ার জন্য যেভাবে পরস্পরকে ডাকা হয়, মুসলিমদের আক্রমণ করার জন্য সেভাবেই কাফিররা একে অপরকে ডাকছে।

পরিস্থিতি অতি ভয়াবহ। যে উদ্দেশ্যে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, সেটিকে অবজ্ঞা করলে শুধু যে দুনিয়াতেই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করতে হবে, এমন না। আখিরাতেও প্রত্যেককে তার অবজ্ঞার মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করা লাগবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাকে লক্ষ্য না বানানোর অর্থই হলো আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করাকে লক্ষ্য বানিয়ে নেওয়া। কারো যদি ইচ্ছে হয় নিজ নিজ ভ্রান্তিতে ঘুরে ঘুরে মরার, তবে সে তা-ই করুক। কিন্তু নিজেদের ভুলভাল কাজকে নানা রকম চটকদার নাম দিলেও আল্লাহর ক্রোধ থেকে কিছুতেই বাঁচা যাবে না। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ, সেক্যুলারিজম—এই সকল আবরণ দিয়েও বাস্তবতাকে ঢাকা যাবে না। বাস্তবতা হলো তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

"প্রকৃত সত্যের পর পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কীই-বা থাকতে পারে?"[৩১]

আল্লাহ সত্যই বলেছেন,

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

"এরাই সেসব লোক যারা হিদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করেছে। (জাহান্নামের) আগুন ভোগ করার ব্যাপারে তারা কতই-না ধৈর্যশীল!"[৩২]

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

"আর যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মা বিক্রি করেছে, তা কতই-না জঘন্য! যদি তারা জানত!"[৩৩]

তাই আমরা আমাদের জাতিকে সতর্ক করে দিচ্ছি যেন তারা সঠিক পথে ফিরে আসে।

[৩১] সূরা ইউনুস, ১০ : ৩২
[৩২] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ১৭৫
[৩৩] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ১০২

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم

"তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও।"[৩৪]

আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির দিকে ফিরে আসুন। আনুগত্য হোক নিষ্ঠার সাথে আর সংগ্রাম চলুক অবিরাম।

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّـهِ وَآمِنُوا

"হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী (নবী)-র প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনো।"[৩৫]

আর জেনে রাখুন, আল্লাহ্ তাআলা যাদের সাহায্য করেন, তাদের জন্য এই মহান লক্ষ্য অর্জন করা খুবই সহজ। আল্লাহ্ তাআলা যাদের দয়া করে পথ দেখান, তাদের জন্য এই রাস্তা একেবারেই পরিষ্কার-নিষ্কণ্টক।

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

"আর যে তাঁর অভিমুখী হয়, তিনি তাকে তাঁর পথে পরিচালিত করেন।"[৩৬]

যারা এই পথের পথিক হতে চায়, তাদের তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কেবল দুটি জিনিস সাথে রাখতে হবে :

১. ইখলাস বা নিষ্ঠা সহকারে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা।

২. প্রকৃতভাবেই রাসূল ﷺ-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা।

১. ইখলাস বা নিষ্ঠা সহকারে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা

বান্দার ছোট-বড় যে-কোনো কাজ আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার শর্ত হলো, সেই কাজটি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করতে হবে।

হাদীসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমার কোনো অংশীদারের প্রয়োজন নেই। অতএব, কেউ যদি কোনো একটি কাজ করে আমার পাশাপাশি অন্য কারো সন্তুষ্টিও অর্জন করতে চায়, তা হলে আমি নিজের পক্ষ থেকে

[৩৪] সূরা আশ-শুরা, ৪২ : ৪৭

[৩৫] সূরা আল-আহকাফ, ৪৬ : ৩১

[৩৬] সূরা আশ-শুরা, ৪২ : ১৩

সেই কাজকে প্রত্যাখ্যান করি। আর আমার সাথে যাকে অংশীদার বানানো হলো, তার জন্য পুরোটা দিয়ে দিই।”[৩৭]

একজন মুসলিমের সব কথা, কাজ, চিন্তা, ভাবনা, হাঁটা, চলা, বসা, ঘুমানো, আধ্যাত্মিক কাজকর্ম, জাগতিক কাজকর্ম, ভালোবাসা, ঘৃণা, দান করা, দান করা থেকে বিরত থাকা—সবকিছু হতে হবে আল্লাহকে খুশি করার জন্য।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

“বলুন (হে মুহাম্মাদ!), নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।”[৩৮]

বান্দার সব কাজে আল্লাহ তাআলার প্রতি ইখলাস থাকতে হবে।

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّـهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿١١﴾

“বলুন (হে মুহাম্মাদ!) আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে।”[৩৯]

ইখলাস বা একনিষ্ঠতা বলতে বোঝায় শুধুমাত্র আল্লাহকেই খুশি করার নিয়্যাত রাখা, তাঁরই ইবাদত করা, স্রষ্টার ওপর সৃষ্টিকে স্থান না দেওয়া, সকল কর্মকাণ্ডকে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত রাখা। আল্লাহ তাআলার মর্যাদা, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, প্রজ্ঞা ও দয়ার বিপরীতে বান্দাদের অক্ষমতা সম্পর্কে যাদের প্রকৃতই ধারণা আছে, তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব না আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নিজেকে কুরবান করা। কুরআনেরই বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাঁর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। যেমন :

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

“তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ। তিনিই প্রকাশিত তিনিই গোপন।”[৪০]

আবার সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ

[৩৭] মুসলিম : ৭৬৬৬
[৩৮] সূরা আল-আনআম, ৬ : ১৬২
[৩৯] সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ১১
[৪০] সূরা আল-হাদীদ, ৫৭ : ৩

"...এমনকি সকলে একত্র হয়ে একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না। আর মাছি যদি তাদের থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তা হলে তার থেকে সেটি উদ্ধারও করতে পারে না।"[৪১]

وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ۝

"তারা নিজেদের ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না; জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থানের ওপরও কোনো ক্ষমতা রাখে না।"[৪২]

مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ

"তারা তো একটি কিতমীরেরও[৪৩] মালিক নয়।"[৪৪]

এতকিছু জেনেও কী করে বান্দা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করতে পারে?

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সকল কাজ (এর ফলাফল) নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তা-ই পাবে, যার নিয়্যাত সে করেছে। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই (অর্থাৎ, আখিরাতে এর প্রতিদান সে পাবে)। আর যে কোনো দুনিয়াবি স্বার্থ বা কোনো নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরত করল, সে যেই উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে সেটিই পাবে (অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি বা পরকালীন কোনো প্রতিদান পাবে না)।"[৪৫]

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়নি, এরকম প্রতিটি কাজ বৃথা ও অনর্থক। আল্লাহর প্রতি ইখলাস না রেখেই কেউ হয়তো অনেক মহৎ মহৎ কাজ করে ফেলল। কিন্তু এসকল কাজই দুনিয়া ও আখিরাতে তার মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। নবীজি ﷺ আমাদের জানান—

"সর্বপ্রথম তিনজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচার করা হবে। প্রথমজন একজন শহীদ। তাকে এনে আল্লাহ তার প্রতি নিজের অনুগ্রহসমূহ জানাবেন এবং সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ বলবেন, 'তুমি এগুলোর বিনিময়ে কী করেছ?' সে বলবে, 'আমি আপনার

[৪১] সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ৭৩

[৪২] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৩

[৪৩] কিতমীর হলো খেজুরের আঁটি সংলগ্ন পাতলা একটি আবরণ, যা তুচ্ছতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

[৪৪] সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৩

[৪৫] বুখারি : ১

সন্তুষ্টির জন্য শহীদ না হওয়া পর্যন্ত আপনার রাস্তায় যুদ্ধ করেছি।' তিনি বলবেন, 'তুমি মিথ্যে বলেছ। তুমি এজন্যই যুদ্ধ করেছ যাতে লোকে তোমাকে বীর বলে। এবং তা বলা হয়েছে।' তারপর তাকে মুখের ওপর উপুড় করে টেনে জাহান্নামে ফেলার হুকুম দেওয়া হবে। দ্বিতীয়জন (দ্বীনের) জ্ঞান শিখত ও শেখাত এবং কুরআন তিলাওয়াত করত। তাকে এনে আল্লাহ তার প্রতি নিজের অনুগ্রহসমূহ জানাবেন এবং সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ বলবেন, 'তুমি এগুলোর বিনিময়ে কী করেছ?' সে বলবে, 'আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য (দ্বীনের) শিক্ষা অর্জন করেছি ও অন্যকে শিখিয়েছি এবং কুরআন তিলাওয়াত করেছি। তিনি বলবেন, 'তুমি মিথ্যে বলেছ। তুমি এজন্যই শিক্ষা অর্জন করেছ যাতে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলে। এবং তা বলা হয়েছে। তারপর তাকে মুখের ওপর উপুড় করে টেনে জাহান্নামে ফেলার হুকুম দেওয়া হবে। তৃতীয়জন হবে এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সব ধরনের সম্পদ দান করেছেন। তাকে এনে আল্লাহ তার প্রতি নিজের অনুগ্রহসমূহ জানাবেন এবং সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ বলবেন, 'তুমি এগুলোর বিনিময়ে কী করেছ?' সে বলবে, 'আপনি যেসব রাস্তায় সম্পদ খরচ করা পছন্দ করেন, আপনার সন্তুষ্টির আশায় আমি সেগুলোর কোনো পথেই সম্পদ খরচ করতে বাদ রাখিনি।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যে বলেছ। তুমি এজন্যই সম্পদ ব্যয় করেছ যাতে লোকে তোমাকে দানশীল বলে। এবং তা বলা হয়েছে।' তারপর তাকে মুখের ওপর উপুড় করে টেনে জাহান্নামে ফেলার হুকুম দেওয়া হবে।[৪৬]

এই হাদীস থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অনেক বড় বড় নেক আমলও ইখলাসের অভাবে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইখলাসের বিপরীত হলো 'আর-রিয়া'। এর অর্থ হলো—মানুষকে দেখানো বা শোনানোর জন্য নেক আমল করা। মুনাফিকদের সব কাজ ছিল লোক-দেখানো।

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ

"আর যখন তারা সালাতের জন্য দাঁড়ায়, তখন দাঁড়ায় নিতান্ত অলসতার সাথে এবং মানুষকে দেখানোর জন্য।"[৪৭]

কিছু ক্ষেত্রে রিয়া এমন হয়ে থাকে যে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যও থাকে, আবার এর সাথে সাথে মানুষের প্রশংসা পাওয়ারও ইচ্ছা থাকে। আরেক রকম রিয়া হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করে মাঝপথে গিয়ে বা কাজ শেষে মানুষের প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছা তৈরি হয়ে যায়।

[৪৬] তিরমিযী : ২৩৮২

[৪৭] সূরা আন-নিসা, ৪ : ১৪২

মুসলিমদের হুকুম করা হয়েছে তারা যেন নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করে সব রকম রিয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে। তবে রিয়ার ভয়ে নেক আমল ত্যাগ করাও আবার ঠিক নয়। নেক আমল করে যেতে হবে এবং নিয়্যাতকে বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করে যেতে হবে।

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

> "অতএব যে-কেউ তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের দাসত্বে আর কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করে।"[৪৮]

আত্মাকে দুনিয়াবি কামনা-বাসনা থেকে পরিশুদ্ধ করে এক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য স্থির করার জন্য ইখলাস আবশ্যক এবং গুরুত্বপূর্ণ।

২. প্রকৃতভাবে রাসূল ﷺ-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের দ্বিতীয় শর্ত হলো নবীজি ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ। কথা-কাজে নিষ্ঠার সাথে সুন্নাহ অনুসরণকারীদের ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, "এরা হলো ইয়্যাকা না'বুদু (আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি) আয়াতের বাস্তব উদাহরণ। এদের কথা, কাজ, দান করা, দান করা থেকে বিরত থাকা, ভালোবাসা, ঘৃণা, প্রকাশ্য, গোপনীয়—সবকিছুই হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তারা মানুষের কাছে পুরস্কার বা ধন্যবাদ আশা করে না, সমাজে উঁচু আসন পেতে লালায়িত না। তারা প্রশংসা পেতে চায় না, নিন্দিত হওয়াকে ভয় করে না। এদের কাছে মানুষ হলো মরা লাশের মতো যারা (আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে) কোনো উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। জীবন, মৃত্যু আর পুনরুত্থানের ওপরও এদের কোনো ক্ষমতা নেই।"[৪৯]

একদিকে রবের শ্রেষ্ঠত্ব অপরদিকে মানুষের (নিচু) স্বভাব—এ দুটি বিষয় যারা সঠিকভাবে জানে না তারাই কেবল দুনিয়াবি নাম-যশ-খ্যাতির পেছনে ছুটতে পারে। আর এই দুই ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান থাকলে মানুষের (খারাপ) প্রতিক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করা সম্ভব হয়। আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দ মেনে কাজ করা সম্ভব হয়। এরকম ইখলাসপূর্ণ কাজই কেবল আল্লাহর দরবারে কবুল হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ

[৪৮] সূরা আল-কাহফ, ১৮ : ১১০

[৪৯] মাদারিজুস সালিকিন, ১/৮৩

أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব ও রাজত্ব যার হাতে; তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন; যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম।"[৫০]

তিনি আরো বলেন,

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾

"জমিনের ওপর যা কিছু আছে, আমি সেগুলোকে তার শোভা-সৌন্দর্য করেছি যাতে আমি মানুষকে পরীক্ষা করি যে, আমলের (কাজের) দিক দিয়ে কারা উত্তম।"[৫১]

ফুযাইল ইবনু ইয়ায বলেন, "সর্বোত্তম আমল হলো সেটি, যা সবচেয়ে নিষ্ঠাপূর্ণ ও সবচেয়ে সঠিক।"

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "হে আবুল হাসান! সেটা কেমন?"

তিনি বললেন, "যে কাজটি নিষ্ঠাপূর্ণ কিন্তু সঠিক নয়, তা কবুল হবে না। আর যে কাজটি সঠিক কিন্তু নিষ্ঠাপূর্ণ নয়, তাও কবুল হবে না। দুটিই ঠিক থাকতে হবে।"[৫২]

এখানে নিষ্ঠাপূর্ণ বলতে বোঝানো হয়েছে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা কাজ। আর সঠিক বলতে বোঝানো হয়েছে নবীজি ﷺ-এর সুন্নাহ মেনে করা কাজ। আল্লাহ তাআলা ঠিক এই বক্তব্যই তুলে ধরেন :

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

"আর যে-কেউ তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কোনো শরীক সাব্যস্ত না করে।"[৫৩]

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

---

[৫০] সূরা আল-মুলক, ৬৭ : ১-২

[৫১] সূরা আল-কাহফ, ১৮ : ৭

[৫২] তাফসির ইবনুল কাইয়িম, ১/১১৯

[৫৩] সূরা আল-কাহফ, ১৮ : ১১০

> "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং অধিকন্তু সে সৎকর্মশীল সেই ব্যক্তির চেয়ে এই দ্বীনে আর কে উত্তম থাকতে পারে?"[৫৪]

কোনো কাজে এই দুই বৈশিষ্ট্য না থাকলে কিছুতেই তা আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, "আমাদের শিক্ষার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে-কোনো আমলই বাতিল বলে গণ্য হবে।"[৫৫]

নবীজি ﷺ-এর সুন্নাহর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আমল আল্লাহর সাথে বান্দার দূরত্বই কেবল বৃদ্ধি করে। কারণ আল্লাহর ইবাদতও করতে হবে আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী। কারো খেয়াল-খুশি অনুযায়ী নয়। বান্দা যে আসলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, এর স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে বান্দা আল্লাহর কাছে নবী ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ করাকে পেশ করে।

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

> "(মানবজাতিকে) বলো (হে মুহাম্মাদ!), তোমরা যদি আসলেই আল্লাহকে ভালোবাসো, তা হলে আমার অনুসরণ করো। (তা হলেই) আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি মার্জনা করে দেবেন।"[৫৬]

রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ কেবল তখনই প্রকৃতভাবে অনুসরণ করা হবে যখন বিদআতকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। বিদআত হলো দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত জিনিস, ইসলামের মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে-দেওয়া মানুষের বিভিন্ন আচার-প্রথা। বিশ্বাসে ও কাজকর্মে, ধার্মিকতায় ও আচরণে, বিচার-আচারে, যুদ্ধাবস্থায় ও শান্তি অবস্থায়, কথাবার্তায় ও নীরবতায়, স্মরণে ও শয়নে—সব ব্যাপারে একজন মুসলিমের দায়িত্ব হলো পরিপূর্ণভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

> "যারা আল্লাহ ও শেষ-দিবসে বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে, নিশ্চয় তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম দৃষ্টান্ত।"[৫৭]

---

[৫৪] সূরা আন-নিসা, ৪ : ১২৫
[৫৫] বুখারি : ২৬৯৭, মুসলিম : ৪৫৮৯
[৫৬] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩১
[৫৭] সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ২১

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

"আর রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।"[৫৮]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং আদেশ শোনার পর তা অমান্য কোরো না।"[৫৯]

কুরআনের চল্লিশটি জায়গায় আল্লাহর অনুসরণের সাথে রাসূলের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। কাজেই নবীজির সুন্নাহ না মেনে উপায় নেই। সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারীদের জন্যই কল্যাণের সব দরজা খোলা। মানুষ বিভিন্ন রকমে সুন্নাহর বিপরীত করে থাকে। যেমন :

ক. ইসলামকে নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের সাথে খাপ-খাওয়ানোর জন্য নতুন নতুন মতবাদ ও তত্ত্ব খাড়া করানো।

খ. শরীয়তকে মানদণ্ড ধরে মানুষকে বিচার করার বদলে মানুষকে মানদণ্ড ধরে শরীয়তকে বিচার করা। শরীয়ত অনুযায়ী বিচার না করে মানুষের মতামত অনুযায়ী কাজ করা।

গ. নিজেদের কথা ও কাজকে কুরআন ও সুন্নাহর আগে স্থান দেওয়া।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা (কোনো বিষয়েই) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে বেড়ে যেয়ো না; আল্লাহকে ভয় করো; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর আওয়াজের ওপর তোমাদের আওয়াজ উচ্চ কোরো না।"[৬০]

ঘ. কিছু বিষয়ে নবীজি ﷺ-কে অনুসরণ করা আর অন্যান্য বিষয়ে তাঁর নির্দেশকে অবহেলা করা। যেমন : সালাত আদায় ও সাওম রাখার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদ্ধতি অনুসরণ করা, কিন্তু বিচার-আচার ও রাষ্ট্রে পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতি না মানা। আল্লাহ বলেন,

[৫৮] সূরা আল-হাশর, ৫৯ : ৭
[৫৯] সূরা আল-আনফাল, ৮ : ২০
[৬০] সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১-২

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করো আর কিছু অংশ অবিশ্বাস করো?"[৬১]

হিদায়াতের রাস্তায় থাকতে পারা ও ভ্রান্ত পথ থেকে বাঁচতে পারার একমাত্র গ্যারান্টি হলো সুন্নাহকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা।

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ

"এটাই আমার সরল-সঠিক পথ, অতএব এর অনুসরণ করো। আর নানান পথের অনুসরণ কোরো না, তা হলে তোমরা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে।"[৬২]

অতীতে মুসলিমরা এই সুন্নাহর অনুসরণ ছেড়ে দেওয়ার কারণেই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। বিদআত ও ধর্মদ্রোহের উদ্ভব এবং বাহাত্তরটি জাহান্নামি দলের উদ্ভব হয় সুন্নাহর অনুসুরণ ছেড়ে দেওয়ার কারণেই। নাজাতের একমাত্র পথ সুন্নাহর প্রকৃত অনুসরণ। সব রকম বিদআত ও ধর্মদ্রোহিতা কুৎসিত। এদের উদ্ভাবকরা ঘৃণিত, তাদের কর্মকাণ্ড পরিত্যাজ্য, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন।

হে মুসলিম ভাইয়েরা! আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই হলো আপনাদের জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য, যা অর্জন করার জন্য আপনাকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া এবং নবীজি ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ করা আবশ্যক।

এই পথ পুরোটা হেঁটে গিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আপনাকে এই জনসমাজে সংখ্যালঘু অচেনা মানুষের মতো জীবনযাপন করতে হবে। কারণ বেশিরভাগ মানুষই এ পথে হাঁটা ছেড়ে দিয়েছে। তাদের কাছে এ পথের পথিকরা অপরিচিত, অদ্ভুত। মিথ্যায় বসবাস করা লোকদের কাছে সত্যের আলোয় চলা লোকেরা অদ্ভুত। নবীজি ﷺ বলেন, "ইসলাম শুরু হয়েছিল অপরিচিত অবস্থায় এবং আবারো এটি অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। অতএব, অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ!"[৬৩]

এ দুনিয়ায় মানুষ সম্পদ-প্রতিপত্তি, খ্যাতি-ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতা করে। তারা এই দুনিয়াকেই একমাত্র আবাস ও শেষ গন্তব্য মনে করে। এটি অর্জনের লক্ষ্যেই তারা চেষ্টা-মেহনত করে। আর আখিরাতকামনাকারীরা তাদের কাছে নিতান্ত অপরিচিত,

[৬১] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৮৫
[৬২] সূরা আল-আনআম, ৬ : ১৫৩
[৬৩] মুসলিম : ৩৮৯

অদ্ভুত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এই দুনিয়ায় একজন মুসাফির বা পথিকের মতো বসবাস করো।"[৬৪] মুসাফির বা পথিকের মন তো তার চূড়ান্ত গন্তব্য ঘরেই পড়ে থাকে। পথিমধ্যে রঙ-বেরঙের বিনোদন দেখে সে সেখানে থেমে থাকে না।

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

"মুত্তাকীদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট এমন এমন বাগান রয়েছে, যার নিচে দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত। তারা তাতে চিরকাল বসবাস করবে।"[৬৫]

[৬৪] বুখারি : ৬৪১৬
[৬৫] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫

যা বিশ্বাস করি

সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত সকল বিষয়ে আমাদের আকীদা (বিশ্বাস) হলো ন্যায়নিষ্ঠ পূর্বসূরিগণের (সালফে সালিহীনদের) আকীদার অনুরূপ।

আগের অধ্যায়ে যে চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের কথা আলোচনা করলাম, তা হলো প্রতিটি মুসলিমের কিবলাহ (দিক)। কথা, কাজ ও নিয়্যাতের মাধ্যমে এই দিকেই সে এগিয়ে চলে। আর আকীদা হলো তাকে সেই দিকে পরিচালিত করার ইঞ্জিন। এটিই তাকে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করে এবং হাল ছেড়ে দিতে বাধা দেয়।

আকীদা নষ্ট হয়ে গেলে বা হৃদয়ে এর প্রভাব কমে গেলে নেক আমল করার স্পৃহা শেষ হয়ে যায় অথবা কমে যায়। ফলে, বান্দা তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া থামিয়ে দিয়ে অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় কাজে মগ্ন হয়ে যায়। বান্দার জীবনে কেবল দুটিই অবস্থা। হয় তার আকীদা তাকে আল্লাহর রাস্তায় সামনে চালিয়ে নিয়ে যেতে থাকবে। নয়তো শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সে আল্লাহর থেকে দূরে সরে যাতে থাকবে। এর মাঝামাঝি কিছু নেই।

আকীদা কেবল কতগুলো মৌখিক দাবির সমষ্টি নয়। এগুলো কোনো ফাঁকা আড়ম্বরপূর্ণ বাণী নয় যে, কেবল ছন্দ-অলংকারবিদেরাই তা নিয়ে পড়ে থাকবে আর বাস্তবে এর কোনো প্রয়োগ থাকবে না। খালি মুখে স্বীকার করলে, বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দিলে আর খণ্ডের পর খণ্ড বই লিখে গেলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।

আকীদাকে হৃদয়ে এমনভাবে প্রোথিত করে নিতে হয় যাতে কথা ও কাজে এর স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। এই ব্যাপারে কুরআন এতই গুরুত্ব দিয়েছে যে, ঈমান ও নেক আমলের কথা বারবার একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, আমলকে আকীদার সঙ্গী বানিয়ে নিতে হবে। কারণ অন্তরের আকীদার প্রমাণ হলো বাহ্যিক কাজকর্ম। কাজে প্রতিফলিত না হলে ঈমানের মৌখিক দাবি গ্রহণযোগ্যতা হারাবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَـٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা হলো সৃষ্টির সেরা।"[৬৬]

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ

"আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, তার জন্য আছে উত্তম পুরস্কার।"[৬৭]

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

"যে-কেউ আল্লাহ ও আখিরাত-দিবসের প্রতি ঈমান আনবে আর সৎকাজ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই, চিন্তা নেই।"[৬৮]

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

"যারাই আল্লাহ ও শেষ-দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।"[৬৯]

فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

"যারা ঈমান আনে ও নিজেকে সংশোধন করে, তাদের নেই কোনো ভয়, নেই তাদের কোনো দুঃখ।"[৭০]

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾

"আর যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আর সৎপথে অটল থাকে, আমি তার জন্য অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল।"[৭১]

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾

"যারা তাওবা করবে, ঈমান আনবে আর সৎকাজ করবে, তারা বাদে। ফলে

[৬৬] সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, ৯৮ : ৭
[৬৭] সূরা আল-কাহফ, ১৮ : ৮৮
[৬৮] সূরা আল-মাইদাহ ৫:৬৯
[৬৯] সূরা আল-বাকারাহ ২:৬২
[৭০] সূরা আল-আনআম ৬:৪৮
[৭১] সূরা ত্বা-হা ২০:৮২

এরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, এদের প্রতি এতটুকুও অবিচার করা হবে না।"[৭২]

فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

"যে ব্যক্তি তার জীবনে তাওবা করেছিল আর ঈমান এনেছিল আর সৎকাজ করেছিল, আশা করা যায় সে সাফল্যমণ্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৭৩]

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿٣٧﴾

"না তোমাদের ধন-সম্পদ আর না তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করতে পারবে। তবে যে-কেউ ঈমান আনে আর সৎকাজ করে, তাদেরই জন্য আছে তাদের কাজের বহুগুণে প্রতিদান। তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।"[৭৪]

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত।"[৭৫]

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

"যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারাই জান্নাতবাসী। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।"[৭৬]

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

"আল্লাহর মসজিদের আবাদ তো তারাই করবে যারা আল্লাহ ও শেষ-দিবসের প্রতি ঈমান আনে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায় তারাই সঠিক পথপ্রাপ্তদের

[৭২] সূরা মারইয়াম ১৯:৬০
[৭৩] সূরা আল-কাসাস ২৮:৬৭
[৭৪] সূরা সাবা ৩৪:৩৭
[৭৫] সূরা আল-বাকারাহ ২:২৫
[৭৬] সূরা আল-বাকারাহ ২:৮২

অন্তর্ভুক্ত।”[৭৭]

مَّا يَفْعَلُ اللَّـهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّـهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

“তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো ও ঈমান আনো, তা হলে তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কী করবেন? আল্লাহ পুরস্কারদাতা, সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।”[৭৮]

এগুলো কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা। বারবার এগুলো ঘুরেফিরে এসেছে। খোলাচোখ ও খোলামনসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিই এগুলো অস্বীকার করতে পারে না।

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

“আসল ব্যাপার হচ্ছে, চোখ অন্ধ হয় না বরং হৃদয় অন্ধ হয়ে যায়, যা বুকের মধ্যে আছে।”[৭৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, সদাচরণ হলো ঈমানের অংশ। নবীজি ﷺ বলেন, “ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রয়েছে। এর সর্বোচ্চ শাখা হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ঘোষণা করা এবং সবচেয়ে নিচের শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।”[৮০]

“তোমাদের যে-কেউ কোনো অন্যায় সংঘটিত হতে দেখে, সে যেন তা হাত (কাজ) দিয়ে প্রতিরোধ করে। সে যদি তা করতে অসমর্থ্য হয়, তা হলে জিহ্বা (কথা) দিয়ে। যদি তা-ও করতে অসমর্থ্য হয়, তা হলে অন্তর দিয়ে। আর এটিই ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর।”[৮১]

“যে তাদের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে লড়াই করল, সে মুমিন। যে তাদের বিরুদ্ধে জিহ্বা দিয়ে লড়াই করল, সে মুমিন। আর যে তাদের বিরুদ্ধে অন্তর দিয়ে লড়াই করল, সেও মুমিন। এর পরে আর সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানেরও অস্তিত্ব নেই।”[৮২]

ঈমানের দাবিদার সকলেই ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী নয়। ঈমানের বাহ্যিক কোনো প্রমাণ না থাকলে সেই দাবি মিথ্যে হয়ে যাবে। ফাঁকা বুলি আর সত্য কথার মাঝে আকাশ-পাতাল ফারাক। চলুন উম্মাহর দুই যুগের দুটি প্রজন্মের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করি। একটি ইসলামের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম সাহাবিগণের, আরেকটি আমাদের বর্তমান সময়ের।

---

[৭৭] সূরা আত-তাওবা ৯:১৮
[৭৮] সূরা আন-নিসা ৪:১৪৭
[৭৯] সূরা আল-হাজ্জ ২২:৪৬
[৮০] বুখারি : ৯, মুসলিম : ১৬১
[৮১] মুসলিম : ১৮৬
[৮২] মুসলিম : ১৮৮

সাহাবিগণের যেই প্রজন্মটিকে আমরা বিশ্বাস ও কাজের দিক দিয়ে অনুকরণ করতে চাই, তাঁরা এমন এক প্রজন্ম যাঁদের আকীদা তাঁদের জাহিলিয়াতের থাবা ও শিরকের আবর্জনা থেকে মুক্ত করে সত্য ও তাওহীদের আলোর দিকে নিয়ে আসে।

আকীদা তথা বিশ্বাসই ছিল তাঁদের এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সবচেয়ে মৌলিক প্রভাবক। আমরা বিভিন্ন উদাহরণ থেকে বোঝার চেষ্টা করব যে, এই আকীদা কীভাবে তাঁদের বাহ্যিক কাজকর্মে প্রতিফলিত হয়েছিল। আসলে এরকম উদাহরণ এত অগণিত যে, এর মধ্য থেকে কয়েকটি বেছে বের করা কঠিন। মুহাজির ও আনসারগণের কথাই ধরুন। তাঁদের মধ্যে বয়স্ক, তরুণ, শিশু, নারী, পুরুষ সকলেই ছিলেন। প্রাচুর্য ও সংকট উভয় অবস্থায় তাঁরা দ্বীনের ওপর অবিচল থেকেছেন।

তাঁরা ছিলেন দিনের বেলার অশ্বারোহী আর রাতের বেলার সন্ন্যাসী। অর্থাৎ, দিন কাটত আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে আর রাত কাটত তাহাজ্জুদে চোখের পানি ফেলে। আল্লাহর কাছে তাঁরা নিজেদের জীবন ও সম্পদ বিক্রি করে দিয়েছিলেন জান্নাতের বিনিময়ে। তাঁরপরও তাঁরা প্রচুর তাওবা-ইস্তিগফার করে আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাইতেন।

তাঁদের প্রতিটি ঘটনায় সত্যিকার ঈমানের উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা ঠিকরে বেরিয়ে আসে। যারা তাঁদের দিকে তাকায়, তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তারা ভাবতে বসে, “কোন সে জিনিস, যা তাঁদের এত দ্রুত অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে গেল? কীসে তাঁদের শ্রেষ্ঠতম প্রজন্ম বানিয়ে দিল?”

এই তো বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু! মনিব উমাইয়্যাহ ইবনু খালাফকে অমান্য করে, পিঠের নিচের তপ্ত বালি আর বুকের ওপরের ভারি পাথরকে অগ্রাহ্য করে তিনি “আহাদ! আহাদ!” বলে চলেছেন। আর ওই যে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু! শরীরের প্রতিটি অংশে লোহিত রঙা তপ্ত লোহার খোঁচা খেয়েও আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে আছেন। আর ওই যে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা! খুন হয়ে গেছেন, হায় নিহত হয়ে গেছেন! তবুও ঈমান এক বিন্দু টলেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, “ধৈর্য ধরে থাকো, হে ইয়াসিরের পরিবার! জান্নাত তোমাদের অপেক্ষায়।”

ওই যে দেখুন মুহাজিরগণের কাফেলা! জীবনসঙ্গী, বাচ্চাকাচ্চা, জমিজমা ছেড়ে খালি হাতে ওই যে মরুর পথ ধরে চলেছেন মক্কা ছেড়ে মদীনার দিকে। চলেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর দিকে।

ওই দেখুন বদর যুদ্ধে নিজ পিতাকে জবাই করে দিলেন আবু‘উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু, নিজের ছেলেকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু হত্যা করে ফেললেন আপন ভাই উবাইদ বিন উমাইরকে।

আরেকটু পেছনে চলে যাই। দেখে আসি আল-আকাবায় রাসূল ﷺ-এর দিকে আনুগত্যের শপথের হাত বাড়িয়ে থাকা আনসারগণকে। তাঁরা জানতেন এই শপথের কারণে গোটা আরব তাঁদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হামলে পড়বে, মেরে ফেলবে তাঁদের শ্রেষ্ঠতম মানুষগুলোকে। তারপরও তাঁরা তাদের এই শপথকে লাভজনক বলে জানলেন। সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার ওয়াদা করলেন।

দেখুন কীভাবে তাঁরা মুহাজির ভাইদের সাথে ঘরবাড়ি, টাকাপয়সা, জমিজমা ভাগ করে নিচ্ছেন। আল্লাহ তাঁদের ব্যাপারে বলেন,

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝٩

> “যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে, তাদের তারা ভালোবাসে। মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে, তা পাওয়ার জন্য তারা নিজেদের অন্তরে কোনো কামনা রাখে না। আর নিজেরা যত অভাবগ্রস্তই হোক না কেন, তাদের (মুহাজিরদের) নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। মূলত যেসব লোককে তার মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম।”[৮৩]

ওই যে শুনুন বদর যুদ্ধের দিন তাঁরা নবীজি ﷺ-কে বলছেন, “আপনার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যান, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার সাথে আছি। সে সত্তার শপথ করে বলছি যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি সাগরও পাড়ি দিতে সিদ্ধান্ত নেন, আমরা আপনাকে অনুসরণ করব। আমাদের একজনও পেছনে পড়ে থাকবে না। আল্লাহর দয়ায় এগিয়ে চলুন।”

আর এই তো উহুদের দিন নবীজিকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে সাতজন শহীদ হয়ে গেলেন। আর ওই যে হুনাইনের দিন যখন ১২০০০ যোদ্ধা নবীজি ﷺ-এর আদেশ মানতে পারলেন না, তখন মাত্র আশিজন আনসার ছুটে এসে যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ নিলেন। হাওয়াযিন গোত্রকে পরাজিত করে গনীমাতের মাল নিয়ে আসলেন। নবীজি ﷺ আনসারদের ছাড়া অন্যদের মাঝে গনীমাত ভাগ করে দিলেন। সবার আগে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তি থেকে শুরু করে সবার শেষে ফেরত আসা ব্যক্তিদের পর্যন্ত দিলেন। তাদের অন্তর ইসলামের দিকে ঝুঁকে ছিল। আনসারগণ গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আমাদের অংশ কী, হে আল্লাহর রাসূল?” নবীজি ﷺ জবাব দিলেন, “অন্যেরা (গনীমাতের) উট-ভেড়া নিয়ে ফিরছে, আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে ফিরছ। এতে কি তোমরা সন্তুষ্ট নও?” তাঁরা কেঁদে বলে উঠলেন, “আমরা আল্লাহর রাসূলকে পেয়ে সন্তুষ্ট।”

---

[৮৩] সূরা আল-হাশর ৫৯:৯

চলুন আবার মদীনায় ফিরে যাই। দেখুন আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য তাঁর সব সম্পদ দান করে দিলেন। নিজের পরিবারের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ছাড়া আর কিছুই রাখলেন না। আর এই যে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সহায়-সম্বলের অর্ধেকটা দান করে দিলেন। আর ওই যে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পুরো সেনাবাহিনীকে নিজ খরচে সজ্জিত করে দিলেন।

চলুন পরিখা (খন্দকের) পেছনে দাঁড়াই। সেই দিনটিকে দেখি যেদিন সম্মিলিত বাহিনী (আহযাব) মদীনাকে ঘিরে ফেলে এক মাস অবরোধ দিয়ে রেখেছিল। আর মুসলিমদের "চক্ষু হয়েছিল বিস্ফোরিত আর প্রাণ হয়েছিল কণ্ঠাগত।"[৮৪] এমন সময় ঈমানদারগণ ঈমানি শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বলে উঠলেন,

وَعَدَنَا اللَّـهُ وَرَسُولُ

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তো এরই ওয়াদা করেছিলেন।"[৮৫]

মুগ্ধ নয়নে তাকান তাবুকের দিকে, দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলা মুসলিম বাহিনীর দিকে। নবীজি ﷺ-এর সাথে তাঁরা বের হয়েছিলেন দুর্যোগপূর্ণ এক বছরে। মাত্রই পাকতে শুরু করা ফলমূল আর ঘরের আরাম ছেড়ে অল্প কিছু শুকনো খেজুর আর পানিকে সম্বল করে মরুভূমি ধরে রাসূল ﷺ-এর সাথে খুশিমনে হেঁটে চলেছেন।

আসুন, আসুন! মদীনায় ফিরে গিয়ে ওই গরিব সাহাবিগণের সাথে বসে কাঁদি, যাদের কাছে জিহাদের জন্য দান করার মতো কোনো টাকা ছিল না। রাসূল ﷺ-এর কাছেও তাঁদের দেওয়ার মতো কোনো বাহন ছিল না।

تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾

"তখন তারা ফিরে গেল, আর সে-সময় তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছিল এই দুঃখে যে, ব্যয়বহন করার মতো কোনো কিছু তাদের ছিল না।"[৮৬]

শত্রুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে প্রস্তুত মুসলিম সেনাদের সারিগুলো ধরে হাঁটি, চলুন। দেখবেন তাঁদের মাঝে লুকিয়ে আছেন উমাইর ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। কারণ নবীজি ﷺ তাঁকে দেখে ফেললে তো অল্পবয়সী হওয়ার কারণে ফিরিয়ে দেবেন!

মদীনার রাস্তা ধরে হাঁটি, আসুন। দেখুন মদ হারামের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রাস্তাগুলো কীভাবে ভেসে যাচ্ছে ফেলে দেওয়া মদের বন্যায়!

---

[৮৪] সূরা আল-আহযাব ৩৩:১০

[৮৫] সূরা আল-আহযাব ৩৩:২২

[৮৬] সূরা আত-তাওবা ৯:৯২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি আর ভাগ্য নির্ধারক তির ঘৃণিত শয়তানী কাজ। তোমরা তা বর্জন করো যাতে তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারো। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। কাজেই তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে?"[৮৭]

খানসা রাদিয়াল্লাহু আনহা কী বলছেন শুনুন। কাদিসিয়ার যুদ্ধে নিজের চার চারজন পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি বলেছেন, "প্রশংসা আল্লাহর যিনি এই চারজনের মৃত্যুর মাধ্যমে আমাকে সম্মানিত করলেন।" ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, "আমার চারিপাশে এত মাতমকারী না থাকলে আমি নিজেকেই হত্যা করে ফেলতাম।"

এঁরাই তো সে-সকল সাহাবিয়াত, যারা কুরআনের হুকুম শুনে নিজেদের মুখ ঢেকে ফেলেছিলেন।

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

"তারা যেন 'জুয়ুবিহিন্না' (তাদের শরীর, ঘাড়, বুক ইত্যাদি) মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়।"[৮৮]

ওই তো দিনার গোত্রের সেই নারী, যাকে তাঁর স্বামী, ভাই ও পিতার শহীদ হওয়ার সংবাদ দিলে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, "আরে রাসূলুল্লাহ কেমন আছেন?" তাঁকে জানানো হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ভালো আছেন। রাসূলকে জীবিত দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, "আপনার ভালো থাকার তুলনায় আমার যে-কোনো বিপদ-আপদ তুচ্ছ হয়ে যায়।"

গামিদিয়্যাহকে দেখুন। তিনি গোপনে ব্যভিচার করেছিলেন, কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু তিনি এত অনুতপ্ত হন যে বারবার এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জোরাজুরি করতে থাকেন তাঁকে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে পবিত্র করার জন্য। পাথর নিক্ষেপে নিহত হয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে এমনভাবে কবুল হলেন যে, তাঁর তাওবা মদীনার সত্তরজন

[৮৭] সূরা আল-মাইদাহ ৫:৯০-৯১
[৮৮] সূরা আন-নূর ২৪:৩১

মানুষের মধ্যে ভাগ করে দিলে তা সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

মহান সাহাবি আবূ যর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাটিতে গাল ঠেকিয়ে পড়ে আছেন ওই দেখুন! বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বারবার বলছেন তাঁর গালে পাড়া দেওয়ার জন্য। কারণ তিনি বিলালকে একবার শুধু তুচ্ছার্থে "হে কালো নারীর সন্তান!" ডেকে বসেছিলেন।

সাহাবি-প্রজন্মের মুসলিমগণের এত এত দৃষ্টান্তের সামনে দাঁড়িয়ে কানে বাজে আল্লাহ তাআলার বাণী :

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর তার সাথে যারা আছে, তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর আর নিজেদের মধ্যে পরস্পর দয়ার্দ্র। তুমি তাদের আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির সন্ধানে রুকু-সেজদারত অবস্থায় দেখতে পাবে। তাদের চিহ্ন হলো তাদের চেহারায় সেজদার প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে আছে। তাওরাতে তাদের বর্ণনা এমনই। আর ইঞ্জিলে তাদের উপমা হলো একটি চারাগাছ তার কচিপাতা বের করে, তারপর তা শক্ত হয়, অতঃপর তা কাণ্ডের ওপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে যায় যা চাষিকে আনন্দিত করে। ফলে কাফিরদের অন্তর রাগে জ্বলে যায়। তাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"[৮৯]

এই তো গেল অতীত ইতিহাসের পাতা। পাতা উল্টে আজকের যুগের অধ্যায়ে আসলে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখতে হয়। নিতান্ত অনিচ্ছাবশত আমাদের এই অপ্রিয় বর্তমানের দিকে তাকানো লাগে। যেন চারিদিকে অন্ধকার, মানুষের ঈমান দুর্বল আর নড়বড়ে। একে নতুন করে বর্ণনা করার কিছু নেই। কারণ আমরা সশরীরে এই বাস্তবতার ভেতর বসবাস করছি। চরম দুঃখ নিয়ে আমরা দেখছি এই উম্মাহর ভাঙন আর বিভেদ, কখনো নরম (ইরজা) আবার কখনো চরমপন্থার (তাকফির) দিকে দুলতে থাকা আকীদা, ধর্মদ্রোহিতা, প্রবৃত্তির অনুসরণ আর কুসংস্কারে ভরা পরিবেশ। পাশ্চাত্যের কাফির বা প্রাচ্যের নাস্তিকদের সাথে আমাদের শাসকেরা খোলাখুলি জঘন্য মিত্রতায় লিপ্ত। এদের

[৮৯] সূরা আল-ফাতহ ৪৮:২৯

সব ভালোবাসা যেন ইহুদি-খ্রিষ্টানদের জন্য আর সকল ঘৃণা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি। তারা আল্লাহর দেওয়া শরীয়তের বিধানের বদলে মানবরচিত আইন প্রতিষ্ঠা করে, আবার নিজেদের মুসলিম বলেও দাবি করে। এদেরকে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে দুনিয়ালোভী আলেমরা যারা এসব শাসককে 'খলিফা', 'আমীরুল মুমিনীন' ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করে।

সাধারণ মুসলিম জনগণকে এসব শাসকের আনুগত্য করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এদের কুফরি আইনের কাছে বিচার চাইতে বাধ্য করা হচ্ছে। সেক্যুলারিজম হয়ে গেছে নতুন ধর্ম। গণমাধ্যম আর শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এটিকে প্রবীণ ও নবীন সমাজে প্রচার করা হচ্ছে। এই নতুন ধর্মের দাবি হলো রাজনীতি থেকে ধর্মের পৃথকীকরণ, শুধু মসজিদ নাকি আল্লাহর জন্য আর সংসদ শাসকের জন্য। পথভ্রষ্ট আলেমরা ইরজাগ্রস্ত আকীদা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। বলে বেড়াচ্ছে অন্তরে ঈমান থাকলে আর আমলের প্রয়োজন নেই, শাসকসহ সবাই-ই নাকি মুমিন। সুফিবাদ, বাহাই মতবাদ, কাদিয়ানি মতবাদ, নুসাইরি মতবাদসহ যতসব ভ্রান্তির লাগাম খুলে দেওয়া হয়েছে। মুসলিমদের সঠিক আকীদার ভেতর এগুলো বিনা বাধায় বিকৃতির বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এদের প্রতিক্রিয়ায় নতুন করে উগ্রখারিজি গোষ্ঠীর উদ্ভব হচ্ছে যারা জযবার চোটে গণহারে মুসলিমদের কাফির বলে আখ্যা দিচ্ছে।

এই সব ভ্রান্ত গোষ্ঠীগুলোকে তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমাদের সত্যনিষ্ঠ পূর্বসূরিদের আকীদা খুঁজে পাওয়া যায় না। মুষ্টিমেয় যেসব মানুষকে আল্লাহ দয়া করেছেন, তাদের ছাড়া আর কারো মধ্যেই ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে সালাফদের সঠিক আকীদা অবশিষ্ট নেই। সাহাবিগণের প্রজন্ম আলোচনা করার সময় ক্ষণিকের জন্য যে আলোকচ্ছটা আমরা দেখেছিলাম, বর্তমানের আলোচনায় তা নিকষ আঁধারে হারিয়ে যায়।

অতীত-বর্তমানের মাঝে এরকম আকাশ-পাতাল পার্থক্যের পরও উভয় পক্ষই নিজেদের সত্যিকারের মুমিন বলে দাবি করে। মুখের দাবি তো কেবল একটা পতাকার মতো যা তুলে ধরে কেবল নাড়ালেই হলো। কিন্তু এক পক্ষ এই পতাকা ধরেছিল নিষ্ঠার সাথে, কাজেকর্মে সেই দাবি বাস্তবায়ন করে। কিন্তু আরেক পক্ষ পতাকা ধরেছে কেবল ধরতে হয় বলে, পূর্বপুরুষদেরকে ধরতে দেখেছে বলে। কিন্তু কাজকর্মে সেটির কোনো প্রতিফলন নেই।

ইমাম শাফিঈ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) বলেছেন, "মানুষ যদি কেবল সূরা আল-আসর অধ্যয়ন করত, তা হলে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।" এই সূরাতে বলা হয়েছে,

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

"আল-আসর (সময়) এর শপথ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। শুধু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয় আর ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"[৯০]

আকীদা নিয়ে, তাওহীদ নিয়ে আমরা এত আলোচনা করি কেবল তাত্ত্বিক আলাপ বা দার্শনিক বিতর্কের উদ্দেশ্যে না। আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য হলো উম্মাহর সংশোধন, সব রকম ভ্রান্তি থেকে মুসলিমদের পরিশুদ্ধি। বারবার আলোচনার মাধ্যমে যেন এই বিষয়গুলো আমাদের অন্তরে গেঁথে যায়, তাওহীদ আমাদের কাছে যা কিছু দাবি করে তা যেন আমাদের কাজেকর্মে চলে আসে। আল্লাহর কাছে আমরা সব রকম ভ্রান্ত আকীদা থেকে নিজেদের দায়মুক্তি ঘোষণা করছি। সালাফগণের আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক কথা ও কাজ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইছি।

---

[৯০] সূরা আল-আসর ১০৩:১-৩

এই আমাদের আকীদা

- ঈমান হলো মুখ দ্বারা ঘোষণা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজ ও অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করার নাম। নেক আমল করলে ঈমান বাড়ে, বদ আমল করলে ঈমান কমে। একইভাবে মুমিনরাও বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে।

- গুনাহের কাজ করলে ঈমান কমে যায়, কিন্তু এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় না। পক্ষান্তরে বড় কুফর (কুফরুল আকবার) ঈমানকে পুরোপুরি বিলীন করে দেয়।

- কুফর দুই ধরনের : বড় (আকবার) ও ছোট (আসগার)। বড় কুফরের কারণে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এবং কাফির বলে সাব্যস্ত হয়। ছোট কুফরের কারণে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয় না। তবে এটি কঠোরভাবে তিরস্কারযোগ্য গুনাহ। বড়-ছোট'র এই প্রকারভেদ শিরক (অংশীবাদ), নিফাক (ভণ্ডামি), যুলুম (অবিচার) ও ফিসক (পাপাচার) এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

- কোনো মুসলিম যত গুনাহ-ই করুক না কেন, অন্তরে সেগুলোকে হারাম বলে মানলে সে কাফির হবে না। এমনকি তাওবা না করলেও না। যেই ফাসিক (পাপাচারী) তার গুনাহের কাজগুলোকে হারাম বলে স্বীকার করে, সে কাফির (অবিশ্বাসী) নয়। এমনকি সে তাওবা ছাড়াই আমৃত্যু এসব গুনাহ করলেও নয়। আখিরাতে তার বিচারের ভার আল্লাহর দায়িত্বে। আল্লাহ চাইলে তাকে মাফ করে দেবেন, চাইলে তাকে সাময়িকভাবে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়ার পর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

- ঈমান ও ইসলামের কথা একসঙ্গে উল্লেখ করা হলে, ঈমান দিয়ে বোঝানো হয় অন্তরের বিশ্বাসকে আর ইসলাম দিয়ে বোঝানো হয় বাহ্যিক আমলকে। আর যখন এর কোনো একটি উল্লেখ করা হয়, তখন এর দ্বারা সম্পূর্ণ দ্বীন ইসলামকে বোঝানো হয়।

- কেউ কুফরি কাজ করলেই আমরা তাকে কাফির বলে সাব্যস্ত করি না, যদি না তা করার জন্য সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনোরূপ ব্যাখ্যাও না থাকে। সে জেনেবুঝে ইচ্ছাকৃত ও স্বাধীনভাবে এই কাজ করেছে—এমনটা প্রমাণিত হলেই কেবল জ্ঞানসম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তিগণ তাকে কাফির ঘোষণা করবেন।

- আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ তাআলা হলেন স্রষ্টা, রিযিকদাতা; তিনিই জীবন দেন, তিনিই জীবন নেন; তিনিই সকল ভালো-মন্দের নিয়ন্ত্রক। তাঁর পাশাপাশি আমরা অন্য কোনো রব অনুসন্ধান করি না।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّـهِ أَبْغِي رَبًّا

"বলো, 'আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য রব তালাশ করব?'..."[৯১]

- আল্লাহ তাআলা কোনো সঙ্গী, সন্তান, অংশীদার ও প্রতিদ্বন্দ্বীর ঊর্ধ্বে।

قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّـهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

"বলো, 'আল্লাহ তিনি অদ্বিতীয়। আল্লাহ আস-সমাদ (যিনি অমুখাপেক্ষী; তাঁর কাউকে দরকার নেই, কিন্তু তাঁকে সবারই দরকার; তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণার ঊর্ধ্বে)। তিনি জন্ম দেন না ও জন্ম নেননি। তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য কিছু নেই'।"[৯২]

- আল্লাহই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। ভয়, আশা, স্মরণ, প্রার্থনা, ভালোবাসা, আত্মসমর্পণ, সাহায্য চাওয়া, নাজাত চাওয়া, নির্ভরতা, উৎসর্গ, শপথ ও অন্য সব রকমের উপাসনা শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করতে হবে।

- আমরা কোনো গাছ, পাথর বা কবরের কাছে দুআ করি না। আমরা শুধু আল্লাহর কাছেই দুআ করি। আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলির মাধ্যমে, আমাদের করা নেক আমলের মাধ্যমে অথবা কোনো জীবিত নেককার মানুষের মাধ্যমেই আমরা দুআ করি। আমরা কোনো কবর ঘিরে তাওয়াফ করি না, মৃতের কাছে দুআ করি না, জিন বা মৃত কোনো বুযুর্গের উদ্দেশ্যে কুরবানি করি না, আল্লাহ ছাড়া কারো নামে শপথ করি না। যারা এগুলোর কোনোটা করে, তারা নিশ্চিতভাবেই শিরকে লিপ্ত।

- আল্লাহকে ছাড়া আমরা যেমন অন্য কোনো রব গ্রহণ করি না, তেমনি তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে বিধানদাতা বলে মানি না। তাঁর দেওয়া বিধান ছাড়া অন্য কিছুকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করি না। সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। তিনি বিধান দেন, আদেশ করেন, নিষেধ করেন, বিচার-ফয়সালা দেন, বৈধ-অবৈধ নির্ধারণ করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সব বিষয়ে অবহিত।

- যে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোনো আইন প্রণয়ন করে এবং আল্লাহর আইনকে

---

[৯১] সূরা আল-আনআম ৬:১৬৪

[৯২] সূরা আল-ইখলাস ১১২:১-৪

অন্য কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করে, সে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে গিয়েছে। সে বিচারকার্যে নিজেকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে। এভাবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। সে যদি শাসক হয়ে থাকে, তা হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে অপসারণ করতে হবে।

◆ আল্লাহ তাঁর কিতাবে ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে নিজের যে-সকল নাম ও বৈশিষ্ট্যের কথা জানিয়েছেন, আমরা সেই সবগুলোতে বিশ্বাস করি। আমরা এগুলোর কোনোটিকে পরিবর্তন করি না, অবিশ্বাস করি না, অর্থ বিকৃত করি না, কোনো সৃষ্টির সাথে সেগুলোর সাদৃশ্য সাব্যস্ত করি না। তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহের ধরন-প্রকৃতি সম্পর্কে জানার দাবিও আমরা করি না। কারণ, "কোনোকিছুই তাঁর সদৃশ নয়; তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।"[৯৩]

◆ আল্লাহ নিজের যেসব বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে নিশ্চিত করেছেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে দিয়ে নিজের যেসব বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে নিশ্চিত করেছেন, সেই সবগুলোতে আমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করি। যেমন : জ্ঞান, সামর্থ্য, শ্রবণ, দৃষ্টি, চেহারা, হাত ইত্যাদি। এর কোনোটিই কোনো সৃষ্টির সদৃশ নয়।

◆ আমরা তা-ই বলি যা আল্লাহ জানিয়েছেন, "দয়াময় (আল্লাহ) আরশে সমুন্নত আছেন।"[৯৪] অতএব, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকূলের ঊর্ধ্বে আরশে সমুন্নত। তিনি যে আরশে সমুন্নত, তা জ্ঞাত, কিন্তু তিনি কীভাবে আরশে আছেন তা অজানা। এতে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। তিনি কীভাবে আরশে আছেন, তা জিজ্ঞেস করা বিদআত।

◆ আল্লাহ যখন যা যেভাবে করতে ইচ্ছা করেন, তখন তা সেভাবেই করেন। তিনি আনন্দিত হন, হাসেন, ভালোবাসেন, ঘৃণা করেন, সম্মতি দেন, রাগান্বিত হন—তাঁর শানের সাথে যেভাবে সামঞ্জস্যশীল, সেভাবেই হন—যেমনটা কুরআন ও হাদীসে আছে। তাঁর কোনো কাজই সৃষ্টিকূলের কারো কাজের মতো নয়। মরণশীলদের মাঝে কেউই এগুলোর ধরন-প্রকৃতি সম্পর্কে জানে না।

◆ কুরআন আল্লাহর সত্য ও অসৃষ্ট কথা, কোনোভাবেই তা মানুষের কথার প্রকৃতির সদৃশ নয়। এমনভাবে তিনি এ কথা বলেছেন, যা সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই।

◆ আমরা ফেরেশতা ও নবী-রাসূলে বিশ্বাস করি।

◆ আমরা রাসূলগণের ওপর নাযিল হওয়া সকল কিতাবে বিশ্বাস করি এবং রাসূলগণের

---

[৯৩] সূরা আশ-শুরা ৪২:১১

[৯৪] সূরা ত্বা-হা ২০:৫

মাঝে কোনো পার্থক্য করি না।

- আমরা বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি সমগ্র মানবজাতির সেরা ও নেতা। তিনি নবীগণের সীলমোহর এবং মুত্তাকিগণের নেতা।

- আমরা বিশ্বাস করি মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাতের বেলা জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে জেরুসালেমের মসজিদুল আকসায় নেওয়া হয়েছে এবং আসমানে যে উচ্চতায় আল্লাহ চেয়েছেন, সে উচ্চতায় তাঁকে নেওয়া হয়েছে।

- আমরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি যে, মাহদী (হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমাম বা নেতা) মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাহর মধ্য থেকে শেষ জামানায় আবির্ভূত হবেন।

- কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে কিয়ামাতের যেসব লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে, আমরা সেসবে বিশ্বাস করি। দাজ্জালের আগমন, আসমান থেকে ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়, ভূপৃষ্ঠ থেকে বিশেষ এক প্রাণীর আবির্ভাব ইত্যাদি এসব লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

- মুনকার এবং নাকীর নামক দুইজন ফেরেশতা কর্তৃক কবরের প্রশ্নোত্তরে আমরা বিশ্বাস করি। রব্ব, দ্বীন ও নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।

- আমরা কবরের আযাবে বিশ্বাস করি। যারা এর যোগ্য, তারা তা ভোগ করবে। আল্লাহ আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন। কবর হয় জান্নাতের একটি উদ্যান বা জাহান্নামের একটি গর্ত হবে। প্রত্যেক বান্দাই তার প্রাপ্য যথাযথভাবে পাবে।

- বিচার-দিবসে কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়ে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে আমরা বিশ্বাস করি। হিসাব-নিকাশ, আমলনামা পাঠ, মীযান স্থাপন, সিরাত পার হওয়া, শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস করি।

- আমরা বিশ্বাস করি নবীজি ﷺ উম্মাতের জন্য বিচার-দিবসে সুপারিশ করবেন।

- আমরা হাউযে কাউসার বিশ্বাস করি। এটি একটি জলাধার যা থেকে পানি পান করিয়ে উম্মাতের পিপাসা নিবারণ করার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে দান করবেন।

- আমরা বিশ্বাস করি জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই সত্য। এগুলো সৃষ্ট এবং কখনো বিলীন হবে না।

- আমরা বিশ্বাস করি যে, জান্নাতবাসীরা তাদের দৃষ্টি সর্বব্যাপী হওয়া ছাড়াই আল্লাহকে সরাসরি দেখবে এবং এই দেখার ধরন-প্রকৃতি অজানা। ঠিক যেভাবে আল্লাহ বলেছেন, সেভাবেই তা হবে : "কতক চেহারা সেদিন উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের

দিকে তাকিয়ে থাকবে।"[৯৫]

- আমরা তাকদীর ও এর ভালো-মন্দে বিশ্বাস করি। আর আল্লাহ যা বলেছেন, তা-ই বলি : "বলো, 'সবকিছুই আল্লাহর তরফ থেকে।'..."[৯৬] ভালো-মন্দ সবই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। বিশ্বজগতের সকল কিছু তাঁর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়।

- আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে কুফরি ও পাপকাজ করার আদেশ দেন না। বান্দা এগুলো করলে তাতে সন্তুষ্টও হন না। "তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরি পছন্দ করেন না।"[৯৭] আর তিনি যদি কাফিরের জন্য কুফরিকেই পূর্বনির্ধারিত করে থাকেন, তা হলে তার কারণ শুধু তিনিই জানেন। আল্লাহর ন্যায়বিচার, নিজের বিরুদ্ধে বান্দার যুলুম এবং বান্দার অতীত পাপের ফল হিসেবে। "তোমার কোনো কল্যাণ হলে তা হয় আল্লাহর তরফ থেকে এবং তোমার কোনো অকল্যাণ হলে তা হয় তোমার নিজের কারণে।"[৯৮] এ সবকিছুই ঘটে আল্লাহর ইচ্ছে অনুসারে। আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন, তা-ই হবে। আর তিনি যা চান না, তা হবে না। আর আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দার প্রতি অবিচার করেন না। "নিশ্চয় আল্লাহ অণু পরিমাণও অবিচার করেন না।"[৯৯]

- আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কর্ম সৃষ্টি করেছেন। "আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমরা যা তৈরি করো সেগুলোও।"[১০০] বান্দা তাদের নিজেদের কাজ বাস্তবেই সম্পন্ন করে, রূপকভাবে নয়।

- আমরা নবীজি ﷺ-এর সকল সাহাবিকে ভালোবাসি। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তাঁরা শ্রেষ্ঠতম প্রজন্ম। আমরা তাঁদের গুণাবলি স্মরণ করি, তাঁদের অত্যন্ত সম্মান করি ও তাঁদের প্রতি হৃদ্যতা প্রদর্শন করি। তাঁরা যা নিয়ে মতভেদ করেছেন, তা থেকে আমরা দূরে থাকি। তাঁদের ভালোবাসা ইসলামের অংশ, ঈমানের অংশ, ইহসানের অংশ। তাঁদের ঘৃণা করা কুফর ও নিফাক।

- আমরা সমগ্র উম্মাতের ওপর আবূ বকর আস-সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করি এবং তাঁর খিলাফতকে স্বীকার করি। একইভাবে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতকে স্বীকার করি। তাঁরা হলেন খুলাফায়ে

[৯৫] সূরা আল-কিয়ামাহ ৭৫:২২-২৩
[৯৬] সূরা আন-নিসা ৪:৭৮
[৯৭] সূরা আয-যুমার ৩৯:৭
[৯৮] সূরা আন-নিসা ৪:৭৯
[৯৯] সূরা আন-নিসা ৪:৪০
[১০০] সূরা আস-সফফাত ৩৭:৯৬

রাশেদীন ও ন্যায়পরায়ণ নেতা। এঁদের ব্যাপারে নবীজি ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আমার সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ মেনে চলো এবং তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো।"[১০১]

- আলেমগণের (এই উম্মাহর প্রথম তিন প্রজন্ম ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী) ব্যাপারে সম্মান সহকারে কথা বলতে হবে। যে ব্যক্তি তাঁদের নিন্দা করে, সে সঠিক পথে নেই।

এই হলো আমাদের আকীদা, যা আমাদের কাছে নিজেদের জীবনের চেয়েও বেশি দামি। চৌদ্দ শতক ধরে এগুলো অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত আছে। কাফিরদের আক্রমণ, মুনাফিকদের ছড়ানো সন্দেহ ও পথভ্রষ্টদের বানানো বিদআতের মোকাবিলায় এগুলো কিয়ামাত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে। অসংখ্য মুসলিমের অবহেলা ও অবজ্ঞা সত্ত্বেও এগুলো টিকে আছে।

আমাদের আকীদার টিকে থাকাই প্রমাণ করে যে, এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। সকল ভ্রান্ত আকীদা বিলুপ্ত হয়ে যায় আর অন্য সব ধর্ম বিকৃত হয়ে যায়। শুধু ইসলামের বিশুদ্ধ রূপ টিকে থাকে। কারণ এটিই একমাত্র সত্য। মিথ্যা ও সন্দেহ দ্বারা একে প্রভাবিত করা যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝٩

> "নিশ্চয় আমিই (কুরআন) নাযিল করেছে আর অবশ্যই আমি তার সংরক্ষক।"[১০২]

আমাদের এই বিশ্বাসমালা আমাদের দেয় শক্ত-মজবুত এক ভিত্তি, যার ওপর দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের দিকে যাত্রা করি। আল্লাহই একমাত্র সত্য ইলাহ এ ব্যাপারে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী। কারণ তিনিই সবকিছুর মালিক, যিনি তাঁর মালিকানাধীন সবকিছুকে কর্তৃত্ব সহকারে শাসন করেন। আর পরিপূর্ণতার বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁরই। তিনি ছাড়া আমাদের অন্য কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই। তিনিই সবচেয়ে মহান।

এই আকীদা আল্লাহর পূর্ণ কর্তৃত্বকে সত্যায়ন করে। তাঁর কর্তৃত্বের কাছে মাথানত করাকে ঈমানের শর্ত ও ইখলাসের চিহ্ন হিসেবে প্রমাণ করে।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

---

[১০১] তিরমিযি : ২৬৭৬, ইবনু মাজাহ : ৪২, আহমাদ : ১৭১৮৪

[১০২] সূরা আল-হিজর ১৫:৯

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোনো অধিকার রাখে না।"[১০৩]

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"কিন্তু না, তোমার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসার ভার তোমার অর্থাৎ (রাসূলের) ওপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদের পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।"[১০৪]

এই আকীদার দাবিই হলো সব ব্যাপার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ন্যস্ত করা, এমনকি মতভেদের সময়েও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলের অনুগত হও ও কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের; যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তা হলে সেই বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের (নির্দেশের) দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাত-দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাকো। এটাই উত্তম এবং সুন্দরতম মর্মকথা।"[১০৫]

এই আকীদা আমাদের মধ্যকার সমঝোতা ও ঐক্য রক্ষা করে এবং ঝগড়া-বিবাদের সম্ভাবনা মিটিয়ে দেয়। মুসলিমদের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পথ দেখিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এটি মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করে। দেশ-জাতি-বর্ণে পার্থক্য থাকার পরও সকল মুসলিম একই লক্ষ্যের দিকে ছোটে।

এই আকীদা ধারণকারী প্রতিটি ব্যক্তি নিজের কাজকর্মের ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকে। কারণ সে বিশ্বাস করে আখিরাতে তাকে বলা হবে,

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾

[১০৩] সূরা আল-আহযাব ৩৩:৩৬
[১০৪] সূরা আন-নিসা ৪:৬৫
[১০৫] সূরা আন-নিসা ৪:৫৯

> “পড়ো তোমার আমলনামা। আজ তোমার হিসেব গ্রহণের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।”[১০৬]

এর ফলে মুমিনের অন্তরে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অবাধ্যতার প্রতি ঘৃণা তৈরি হয়। কখনো যদি সে ভুল পথে চলেও যায়, তা হলে এই আকীদা তাকে সাথে সাথে সঠিক পথে ফিরে আসতে উদ্দীপ্ত করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় অবিরাম প্রচেষ্টা করে যাওয়ার শক্তি যোগায়।

অন্য সব মতাদর্শ ও দর্শনের সাথে আমাদের আকীদার পার্থক্যটা এখানেই। এর ফলেই আমরা তাদের চেয়ে উঁচু মর্যাদায় আসীন। ইসলাম এই আকীদাকে এমন উঁচু মর্যাদার আসন দিয়েছে যেই স্থানটির জন্য অন্য সব মতাদর্শ লালায়িত। তাদের মতাদর্শ আর আমাদের আকীদার বিরাট তফাতের কারণে তাদের কাছে সেই উঁচু মর্যাদার ধারেকাছে পৌঁছানোও অলীক স্বপ্ন।

ইসলামি আকীদা মুসলিমদের এই নিশ্চয়তা দেয় যে, আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে আছেন। তাদের তিনি দেখেন, শোনেন, তাদের অন্তরের গোপন খবর জানেন। আর তিনিই তাদের শেষ বিচারের দিনে পুনরুত্থিত করে পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন।

সা’সা বিন মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার নবীজি ﷺ-এর কাছে এসে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন : “অতএব কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে, সেও তা দেখবে।”[১০৭] নবীজি ﷺ বললেন, “এই আয়াত ক’টি শোনাই আমার জন্য যথেষ্ট।”[১০৮]

এই আকীদা আমাদের মিত্রতাকে শুধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ ও মুমিনদের জন্যই বরাদ্দ রাখে। এ ছাড়া বাকি সবাই আল্লাহ থেকে তাদের দূরত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন মাত্রায় শত্রুতা ও ঘৃণা পাওয়ার যোগ্য। এটি এমন এক আকীদা, যা এর অনুসারীদের দুনিয়ার জীবনের সংকীর্ণতা থেকে বের করে এনে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যায়। এই আকীদার মানুষদের জমিনে হাঁটতে দেখা গেলেও তাদের অন্তর পড়ে থাকে জান্নাতে। তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের জন্য সহায়-সম্বল প্রস্তুত রাখে। তারা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য মেহনত করে না। আল্লাহ ও আখিরাতের দিকে যাত্রায় পাথেয় হিসেবে এখান থেকে যতটুকু নেওয়া দরকার, ততটুকুই তারা কেবল নেয়।

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

---

[১০৬] সূরা আল-ইসরা ১৭:১৪

[১০৭] সূরা আয-যিলযাল ৯৯:৭-৮

[১০৮] মুস্তাদরাক আল-হাকিম : ৬৫৭১

"দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই না। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য পরকালের জীবনই অতি কল্যাণময়। তবুও কি তোমাদের বোধোদয় হবে না?"[১০৯]

وَاللَّـهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾

"আল্লাহই (পুরস্কার প্রদানে) শ্রেষ্ঠতর ও (শাস্তি প্রদানে) অধিকতর স্থায়ী।"[১১০]

এই আকীদা তার ধারক-বাহকদেরকে দেয় সম্মানজনক জীবন, যাতে অপমান-অপদস্থতার লেশমাত্র নেই। তাদের জীবনে প্রাচুর্যও আসে, সংকীর্ণতাও আসে; জয়ও আসে, পরাজয়ও আসে। কিন্তু কোনোকিছুই তাদের ঈমান থেকে ও জীবনের লক্ষ্য থেকে টলাতে পারে না। কারণ তারা সম্মান আশা করে কেবল মহান প্রতিপালকের কাছ থেকে, যিনি "উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান।"[১১১]

এবং

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾

"মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।"[১১২]

তারা সম্পদ বা প্রভাব-প্রতিপত্তিতে সম্মান খোঁজে না। পৃথিবীর কোনো ক্ষমতার কাছে ইজ্জত চায় না। তারা যেন এই আয়াতের মূর্ত প্রতিচ্ছবি,

وَلِلَّـهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

"কিন্তু সমস্ত মান-মর্যাদা তো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের ও মুমিনদের।"[১১৩]

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

"তোমরা হীনবল ও দুঃখিত হোয়ো না। বস্তুত তোমরাই জয়ী থাকবে, যদি তোমরা মুমিন হও।"[১১৪]

এই আকীদা তার অনুসারীদের দেয় দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতের কামিয়াবি। আল্লাহরই জন্য সকল কষ্ট সহ্য করে তাঁর সাক্ষাৎ লাভের আশায় তাদের রাখে অবিচল।

---

[১০৯] সূরা আল-আনআম ৬:৩২
[১১০] সূরা ত্বা-হা ২০:৭৩
[১১১] সূরা আল-বাকারাহ ২:২৫৫
[১১২] সূরা আস-সাফ ৬১:১
[১১৩] সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩:৮
[১১৪] সূরা আলে ইমরান ৩:১৩৯

যেভাবে বিশ্বাস করি

পরিপূর্ণ ইসলামকে আমরা সেইভাবেই বুঝতে চাই, যেভাবে নবীজি ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অনুসরণকারী নির্ভরযোগ্য আলেমগণ বুঝেছিলেন।

আমরা নিজেদের 'মুসলিম' পরিচয় দেওয়া যথেষ্ট মনে করি। এর অর্থ হলো, এই উম্মাতের সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ ও সালফে সালিহীন ইসলামকে যেভাবে বুঝেছিলেন, আমরাও ঠিক সেভাবেই ইসলামকে বুঝতে চাই। দুঃখের ব্যাপার হলো, 'মুসলিম' বলতে আমরা যা বোঝাতে চাই, আজকের যুগে এই শব্দটি আর সেই একই অর্থ প্রকাশ করছে না। এর ভিন্নরকম অর্থ প্রচলিত হয়ে গেছে। একজন মুসলিমকে ইসলাম সম্পর্কে কতটুকু জানা উচিত, ইসলাম কীভাবে মানা উচিত—এগুলোর ধারণাই পাল্টে দেওয়া হয়েছে। আজকাল 'সমাজতান্ত্রিক মুসলিম', 'উদারপন্থী মুসলিম', 'প্রগতিশীল মুসলিম', 'সেক্যুলার মুসলিম' নামে নতুন নতুন শব্দগুচ্ছ আবিষ্কার হচ্ছে। হুদুদ (ইসলামি পেনাল কোড), হিসবাহ (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ), জিহাদের মতো ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়গুলোই এরা সহ্য করতে পারে না, তারপরও পরিচয় দেয় 'মুসলিম'।

এ থেকেই বোঝা যায় যে নবীজি ﷺ-এর ওপর ইসলামের যেই বুঝ নাযিল হয়েছিল, আজকের মুসলিমরা আর ইসলামকে সেভাবে বোঝে না। নানা রকম কুফরি-ফাসেকি শক্তি কয়েক শতাব্দী ধরে পরিশ্রম করেছে শুধুমাত্র মুসলিমদের দ্বীনের বুঝকে বিকৃত করে দিতে। এরা চেয়েছে ইসলামের ব্যাপারে মুসলিমদের আত্মবিশ্বাস নড়বড়ে করে দিতে, দ্বীনের ব্যাপারে হীনম্মন্যতা তৈরি করতে, ঈমান থেকে বের করে পূর্ণ কুফরের দিকে নিতে না পারলেও অন্তত বড়সড় পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যেতে। ইসলামের বাস্তবতাকে বিকৃত করতে ও অসংখ্য মুসলিমের ধ্যান-ধারণা অস্পষ্ট করে দিতে তারা অনেকাংশে সফল।

চৌদ্দশ বছর ধরে ইসলামের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকা শত্রুরা ইতিহাস থেকে অনেক কিছু শিখেছে। মুসলিম তলোয়ারের আঘাতে রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন দেখে তারা শিক্ষা নিয়েছে। মঙ্গোলিয়ানদের ধ্বংসযজ্ঞ সিরিয়া, ইরাক, এশিয়া মাইনর পার করে

ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রায় শেষ সীমা মিশরের পূর্ব দিক পর্যন্ত চলে এসেছিল। এরপর মুসলিমরা কীভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের পাল্টা আঘাতে একেবারে পর্যুদস্ত করে দিল, সেটাও শত্রুরা দেখেছে। মিশর আর সিরিয়া ভূমিতে দুই শতক ধরে মুহুর্মুহু আছড়ে পড়া ক্রুসেডার জলোচ্ছ্বাসকে মুসলিমরা কীভাবে দমিয়ে দিয়েছে, সেটিও তাদের অজানা নয়। তারা দেখেছে যে, ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে প্রাচ্যের দিকে চীনদেশের অধিবাসীদের কাছ থেকে জিযিয়া নিতে শুরু করেছে, ওদিকে পশ্চিমে ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র স্পেন জয় করে ভিয়েনার ফটক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

শত্রুরা বুঝে গেছে যে ইসলামের পাক্কা অনুসারীরা যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন ইসলাম বিজয়ী হতেই থাকবে। এমন সব অনুসারী, যারা আরব-অনারব-সাদা-কালো নির্বিশেষে সকলেই ইসলামকে একমাত্র সঠিক জীবনব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করে।

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝٤ بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝٥

"সেদিন মুমিনরা আনন্দ করবে আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে। যাকে ইচ্ছে তিনি সাহায্য করেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী, বড়ই দয়ালু।"[১১৫]

প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালী আর অস্ত্রসজ্জিতই হোক, ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুসারীদের আল্লাহ বিজয় দিতেই থাকবেন এই বাস্তবতা আমাদের শত্রুদের সামনে প্রতিভাত হওয়ার পর তাদের মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম হয়। এজন্য তারা "রাগে নিজেদের আঙুলের মাথা কামড়াতে থাকে।"[১১৬] এবং নানা রকম চক্রান্ত করতে থাকে। "কিন্তু তাদের চক্রান্ত আল্লাহর নজরেই আছে, যদিও তাদের পরিকল্পনা পাহাড়ও টলিয়ে ফেলার মতো হয়।"[১১৭] আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে রক্ষা করলেন আর তাদের সব চক্রান্ত ভেস্তে দিলেন। "এটা আমাদের প্রতি ও সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল্লাহর রহমত।"[১১৮]

উপায় না দেখে শত্রুরা এবার চিন্তার ময়দানে নেমে পড়ে। মুসলিমদের মনে ইসলামের প্রতিচ্ছবিকে বিকৃত করতে তারা মরিয়া হয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ শুরু করে। এর শুরুটা হয়েছিল কুরাইশদের হাতেই। তারা নবীজি ﷺ-কে কবি, গণক, পাগল ইত্যাদি বলে অপপ্রচার চালাত। সেই জাহিলিয়াতের জের ধরেই ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সেই একই যুদ্ধ এখনো চালানো হচ্ছে। মুসলিমদের মনের মধ্যে ছুরিকাঘাত করে ইসলামের ব্যাপারে ধারণা পাল্টে দেওয়া হচ্ছে। অনেক মুসলিমই এভাবে তাদের শিকারে পরিণত হয়েছে। পরিস্থিতি আরো খারাপ হয় যখন আমাদেরই মধ্য থেকে কিছু মানুষ বের

[১১৫] সূরা আর-রূম ৩০:৪-৫
[১১৬] সূরা আলে ইমরান ৩:১১৯
[১১৭] সূরা ইবরাহীম ১৪:৪৬
[১১৮] সূরা ইউসুফ ১২:৩৮

হয়ে গিয়ে ইসলামের শত্রুদের দলে যোগ দেয়। তারা হয়ে ওঠে জাহান্নামের দরজার দিকে আহ্বানকারী, আমাদের শত্রুদের পণ্যের বিজ্ঞাপনদাতা আর তাদের হয়ে তীর নিক্ষেপকারী। শত্রুদের কাছে কোনোরকম কৃতজ্ঞতা বা পুরস্কারের আশা না করেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আমাদের দেশের সরকারগুলো তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে থাকে।

বিপুলসংখ্যক মুসলিমের মনে ভুল ধারণা গেড়ে বসার পরও তা হলে এই দ্বীনের প্রহরায় কারা এগিয়ে আসতে পারে? মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাই তো শত্রুদের মুখপাত্র আর ভ্রান্ত মতাদর্শের প্রচারক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শত্রুদের এজেন্টদের জন্য আমাদের সরকারগুলো নিরাপত্তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ করতেও দ্বিধা করছে না। অতি অল্পসংখ্যক মানুষ সত্যকে আঁকড়ে ধরে আছে। অন্তরে সত্য আঁকড়ে থাকা অনেক মানুষই আবার বাস্তবতার ময়দানে পথভ্রষ্টতার এই ঢেউয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে অপারগতা প্রকাশ করছে। ফলস্বরূপ, তারা ইসলামের এই বিকৃত রূপকে মৌখিক স্বীকৃতি দিয়ে পথভ্রষ্টদের মিছিলের তালে তালেই হাঁটা দিয়েছে।

এর প্রতিক্রিয়ায় ইসলামের কর্মীদের উচিত ছিল ঔষধ প্রয়োগ করা। কিন্তু তারাই উল্টো রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এদের কেউ ইসলামকে কিছু আচার-প্রথার সমষ্টি হসেবে মেনে নিয়েছে, সালাত ও দুআর বাইরে কোনো দাওয়াত প্রচারকেই গুরুত্বপূর্ণ ভাবছে না। যেন জিহাদ, হিসবাহ, শরিয়ার আইন দিয়ে শাসনের বিধানগুলো পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর মতো মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে। অনেকেই বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনী ও কুসংস্কার ছেড়ে আসার দাওয়াত দেয়। অথচ যেসব সেক্যুলার শাসক মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন করে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে টুঁ শব্দও করে না।

কেউ আবার ইসলামি জ্ঞান শেখা ও শেখানোকে গুরুত্ব দেয়, কিন্তু দাওয়াত ও জিহাদ-প্রসঙ্গ এলে আর কিছু বলে না। কেউ কেউ পানাহার, পোশাক-আশাক, বিবাহ-শাদির ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টায় থাকলেও জিহাদ, শাসন ও বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের কথা বলে না। অনেকে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে জিহাদের জন্য হাঁকডাক ছাড়তে থাকে, কিন্তু জিহাদ ও ইসলামি রাজ্যশাসন করার মতো আত্মিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল গড়ে তোলার দিকে নজর দেয় না। এভাবে খণ্ডিত দ্বীনের অনুসারী হয়ে কোনো অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয় না।

মুসলিমরা একের পর এক পরাজয়ের স্বীকার হচ্ছে। আমজনতা কেবল নির্বাক চেয়ে চেয়ে দেখছে। অল্প কিছু কর্মী অসহায়ভাবে হতবিহ্বল অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ইসলামকে পরাজয় থেকে বিজয়ের পানে নিয়ে যেতে হলে রোগের কারণ খুঁজে বের করে যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে, এখন তা যত তেতোই হোক না কেন।

وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

"কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ করো, তা হয়তো কল্যাণকর।"[১১৯]

আমাদের ইসলামের বুঝ কেমন হওয়া উচিত, সেই আলোচনায় যাবার আগে মুসলিমরা কোন জায়গায় ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত সেটা পরিষ্কার করে বলা দরকার। এই বিষাক্ত ভুলের পেছনে কারা আছে, কারা একে সমর্থন দিয়ে পরিপুষ্ট করছে, তাদের মুখোশ উন্মোচন করা উচিত। কোন জায়গা থেকে আমাদের লক্ষ্য করে তির মারা হচ্ছে, সেটা তা হলে বের হয়ে আসবে। আমাদের পূর্ববর্তীরা যে ভুল করেছে, তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সে ব্যবস্থা করা লাগবে। মুসলিমদের এই সুপরিকল্পিত বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সচেতন করতে হবে। আমাদের এই তুচ্ছ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য থাকবে সত্যনিষ্ঠ পূর্বসূরিদের অনুরূপ দ্বীনের বুঝসম্পন্ন একটি প্রজন্ম গড়ে দিয়ে যাওয়া। এক সুদূর পরাহত লক্ষ্যকে আবারো কাছে নিয়ে আসার জন্য এই প্রজন্ম কাজ করবে সালাফগণের বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী।

ইসলামের অর্থ হলো জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি বশ্যতা স্বীকার, আনুগত্য ও পূর্ণ আত্মসমর্পণ। নবীজি ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণও এর অন্তর্ভুক্ত। এতে রয়েছে আমাদের জীবন পরিচালনায় অপরিহার্য আদেশ-নিষেধ ও নিয়ম-কানুন। রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মানবজাতির সকল বিষয়াদির পূর্ণাঙ্গ সমাধান।

সংক্ষেপে এটিই হলো দ্বীন ইসলামের সেই বুঝ, যা নবীজি ﷺ-এর ওপর নাযিল হয়েছিল, যেভাবে সালফে সালিহীন একে বুঝেছিলেন, এবং যেমনটা আমরা এই উম্মাহর সত্যনিষ্ঠ আলেমগণের কাছ থেকে শিখেছি। আমাদের আকীদা একেই সত্যায়ন করে যে "আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা।"[১২০] তিনি সবকিছুর ব্যাপারে সম্যক অবগত। যা হয়েছে, যা হবে, আর যা হওয়ার নয়, তার সবই তিনি জানেন। "তিনি যাবতীয় অদৃশ্যের ব্যাপারে জ্ঞানী। আকাশ ও পৃথিবীতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুকণা বা তার চেয়ে ছোট-বড় কোনোকিছুই তাঁর থেকে লুক্কায়িত নেই। সবই সংরক্ষিত আছে এক সুস্পষ্ট কিতাবে।"[১২১] কথা, কাজ ও বিধানের ব্যাপারে তিনি সকল প্রজ্ঞার অধিকারী। বান্দার জন্য আজ কোনটা ভালো, কাল কোনটা ভালো এ ব্যাপারে তিনি পূর্ণ অবগত। মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়্যাত হলো ওহির ধারায় শেষ সীলমোহর। কিয়ামাত পর্যন্ত আগমনরত পুরো মানবজাতির ওপর এই দ্বীন প্রযোজ্য। সকল মানুষ এই দ্বীন মেনে চলার আদেশপ্রাপ্ত।

[১১৯] সূরা আল-বাকারাহ ২:২১৬
[১২০] সূরা আয-যুমার ৩৯:৬২
[১২১] সূরা সাবা ৩৪:৩

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

"বলুন (হে মুহাম্মাদ!), 'হে মানব-সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল!'"[১২২]

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

"আর যে-কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন সন্ধান করে, এটি তার কাছ থেকে কখনোই কবুল করা হবে না। আর আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[১২৩]

আল্লাহর এই বাণী থেকেই স্পষ্ট হয় যে, এই আসমানী জীবনব্যবস্থা সমগ্র মানবজাতির জন্য। মানুষের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। কোনটিতে মানুষের কল্যাণ, তা এই দ্বীনই বলে দেবে। আমাদের বিশ্বাস, আনুগত্য, নৈতিকতা, রাষ্ট্রীয় কর্মনীতি ও বিশ্বাস, সামাজিক নেতৃত্ব, বিবাদ মীমাংসা, বিচার-ফয়সালা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এই দ্বীনের ভিত্তিতে তৈরি হবে।

এভাবেই নবীজি ﷺ জীবন পরিচালনা করেছেন। তিনি ছিলেন রাসূল, দাঈ, শাসক, বিচারক, শিক্ষক, সেনাপতি, এবং সালাতের ইমাম। খুলাফায়ে রাশেদীনও ঠিক এই রীতি মেনে চলেছেন। আবু নাজীহ ইরবায রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ এমন খুতবা দিলেন যে আমাদের অন্তর ভীত হয়ে গেল, চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেল। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে যেন এটি শেষ খুতবা। তাই আমাদের কিছু উপদেশ দিয়ে যান।' রাসূল ﷺ বললেন, 'আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করার এবং কোনো দাসও যদি তোমাদের নেতা হয় তার অনুসরণ করার। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যারা (দীর্ঘদিন) বাঁচবে, তারা প্রচুর মতবিরোধ দেখতে পারবে। অতএব, তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে থাকবে। দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত বিষয় থেকে সাবধান। কারণ প্রতিটি নতুন বিষয়ই বিদআত, প্রতিটি বিদআতই পথভ্রষ্টতা এবং প্রতিটি পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।"[১২৪]

আমাদের নবীজি সকল শিক্ষা পেয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে। খুলাফায়ে রাশেদীন নবীজির দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কোনোকিছুই অনুসরণ করেননি। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, মানবজীবনের সকল ক্ষেত্র পরিচালনার জন্য নবীজির দেখানো পথ অনুসরণই যথেষ্ট।

[১২২] সূরা আল-আরাফ ৭:১৫৮

[১২৩] সূরা আলে ইমরান ৩:৮৫

[১২৪] আবু দাউদ : ৪৬০৭, তিরমিযি : ২৬৭৬; হাসান সহীহ

সালাফে সালেহীন এরকমই করে গেছেন।

আল্লাহ বলেছেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিলাম।"[১২৫]

এই আয়াতাংশ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ, বোধগম্য এবং জীবনের সকল সময়ের সকল স্থানে বাস্তবায়নযোগ্য, তার দলিল হিসেবে প্রতিটি অংশই আলাদা আলাদাভাবে যথেষ্ট।

'দ্বীনের পূর্ণাঙ্গতা' বলতে বোঝায়, ইসলামে কোনো ছোট-বড় বিষয়কেই অগ্রাহ্য করা হয়নি। সবকিছুই কোনো না কোনোভাবে আলোচিত হয়েছে। এ থেকে আরো বোঝা যায় যে আকীদা, অর্থনীতি, রাজনীতি, শান্তি, যুদ্ধ, সরকার—কোনো বিষয়েই, কোনো সময়েই, কেউই নতুন কিছু যোগ করে দাবি করতে পারবে না যে, সে ইসলামকে পূর্ণতা দিয়েছে।

'অনুগ্রহের পূর্ণতা'র অর্থ হলো ইসলামের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও শ্রেষ্ঠতর কিছুই নেই। কারণ এই দ্বীনে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই।

'দ্বীন হিসেবে ইসলামকে নির্ধারণ করা'র অংশ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য কোনো ত্রুটিপূর্ণ দ্বীন পছন্দ করেন না। মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি নাযিল হওয়ার সময় থেকে নিয়ে কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ ইসলামকে আমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে সন্তুষ্ট। কেউ যেন এমন না বলে যে, ইসলাম একটা যুগে পরিপূর্ণ ও সন্তোষজনক ছিল কিন্তু এখন আর তেমনটা নেই। এমনটা বলার অর্থ হলো যে, আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করে তাদের দেওয়ার মতো চিরস্থায়ী ও সর্বব্যাপী কোনো সমাধান খুঁজে পাননি, সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে এমন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে যা সম্পর্কে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান আল্লাহর কোনো ধারণাই ছিল না (নাউযুবিল্লাহ)।

سُبْحَانَكَ هَـٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

"আল্লাহ (এ অপবাদ থেকে) পবিত্র ও মহান! এটা তো এক গুরুতর অপবাদ।"[১২৬]

[১২৫] সূরা আল-মাইদাহ ৫:৩

[১২৬] সূরা আন-নূর ২৪:১৬

এটি এমন এক দ্বীন, যা মেনে চলার জন্য কিয়ামাত পর্যন্ত আসন্ন সকল মানুষকে হুকুম করা হয়েছে।

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো বিধানদাতা নেই।"[১২৭]

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

"আর তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ করো, তার মীমাংসা আল্লাহর ওপর সোপর্দ।"[১২৮]

তা হলে কীভাবে এসব নিকৃষ্ট দাবি করা যায় যে, ইসলাম দিয়ে সবকিছুর সমাধান সম্ভব না, প্রয়োজনে এর মৌলিক শিক্ষাগুলো থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে কাজ করতে হবে? বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া আর কেউই দাবি করতে পারে না যে সে অর্থনীতি, রাজনীতি, শান্তি, যুদ্ধ, বিশ্বাস ও উপাসনার ক্ষেত্রে ইসলামের চেয়ে ভালো ও পূর্ণাঙ্গ কোনো বিধান নিয়ে আসবে। এমনকি কেউ যদি এমন দাবি করেও বসে, তা হলেও কি আমরা কখনো ইসলাম ছেড়ে সেই পথভ্রষ্টের দিকে দৌড়ে যাব?

ব্যাপকতা, পূর্ণতা, মর্যাদা, পূর্ণাঙ্গতা, প্রজ্ঞা, ন্যায়বিচার, সূক্ষ্মতা, সহজতা ও ব্যবহারিক প্রয়োগযোগ্যতার দিক দিয়ে ইসলামের চেয়ে উত্তম কোনো বিধান না কখনো মানবজাতি জানত, আর না কখনো জানবে। এটাই রূঢ় বাস্তবতা। ইসলাম জীবনের সর্বব্যাপী। এ হলো কলম-তরাবারি, ইলম-আমল, আকীদা-শরিয়াহ, নীতি ও রাজনীতি, কাজ ও প্রতিদান, দুনিয়া ও আখিরাত।

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ

"কিতাবে আমি কোনোকিছুই বাদ দিইনি।"[১২৯]

ইসলামে রয়েছে আকীদা-বিষয়ক নির্দেশ :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

"আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক কোরো না।"[১৩০]

---

[১২৭] সূরা ইউসুফ ১২:৪০
[১২৮] সূরা আশ-শুরা ৪২:১০
[১২৯] সূরা আল-আনআম ৬:৩৮
[১৩০] সূরা আন-নিসা ৪:৩৬

রয়েছে ইবাদতের পদ্ধতি:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

"তোমরা (ফরয) সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের (আসর) প্রতি এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও।"[১৩১]

শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আদেশ :

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

"শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না।"[১৩২]

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

"তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখো না, যে আপন কামনা-বাসনাকে নিজের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে?"[১৩৩]

পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ :

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"আর পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো।"[১৩৪]

জ্ঞানার্জনের উৎসাহ :

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"আর বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।'"[১৩৫]

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"তাদের বলো (হে মুহাম্মাদ!), 'যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?'"[১৩৬]

---

[১৩১] সূরা আল-বাকারাহ ২:২৩৮

[১৩২] সূরা আল-বাকারাহ ২:১৬৮

[১৩৩] সূরা আল-ফুরকান ২৫:৪৩

[১৩৪] সূরা আন-নিসা ৪:৩৬

[১৩৫] সূরা ত্বা-হা ২০:১১৪

[১৩৬] সূরা আয-যুমার ৩৯:৯

সার্বিক সদাচরণের নির্দেশ :

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

"এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে।"[১৩৭]

আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন করার নির্দেশ :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

"অতএব, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী তুমি তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করো।"[১৩৮]

মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা এবং এই দ্বীনের প্রচার-প্রচারণা-তাবলীগের নির্দেশ :

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"তোমার প্রতিপালকের দিকে (মানুষকে) ডাকো জ্ঞান-বুদ্ধি ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়।"[১৩৯]

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করে। আর এরাই সফলকাম।"[১৪০]

আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার বিধান :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

"তোমাদের ওপর যুদ্ধ বাধ্যতামূলক করা হলো, যদিও তোমরা তা অপছন্দ

[১৩৭] সূরা আল-বাকারাহ ২:৮৩
[১৩৮] সূরা আল-মাইদাহ ৫:৪৯
[১৩৯] সূরা আন-নাহল ১৬:১২৫
[১৪০] সূরা আলে ইমরান ৩:১০৪

করো।"[১৪১]

সৎকাজে সৎ উদ্দেশ্যে সাহায্য-সহযোগিতা করার আদেশ :

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

"আর যে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন সৎকাজ করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক না করে।"[১৪২]

কর্ম ও এর প্রতিদানের বর্ণনা :

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

"অতএব, যে অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে সে তা দেখতে পাবে। আর যে অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করে, সেও তা দেখতে পাবে।"[১৪৩]

মুসলিম শাসকের আনুগত্য করার বিধান :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলের অনুগত হও ও তোমাদের মধ্যকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের।"[১৪৪]

দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার করার হুকুম :

إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন হকদারকে তার প্রাপ্য হক তাদের কাছে পৌঁছে দিতে। এবং তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে।"[১৪৫]

নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে স্বেচ্ছাচারিতা না করে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার হুকুম :

[১৪১] সূরা আল-বাকারাহ ২:২১৬

[১৪২] সূরা আল-কাহফ ১৮:১১০

[১৪৩] সূরা যিলযাল ৯৯:৭-৮

[১৪৪] সূরা আন-নিসা ৪:৫৯

[১৪৫] সূরা আন-নিসা ৪:৫৮

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"কাজকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো।"[১৪৬]

ইসলাম যেমন ব্যক্তির সাথে প্রতিবেশীর দায়িত্ব-অধিকার নিয়ে আলোচনা করে, তেমনি প্রতিবেশী অমুসলিম জাতিগুলোর সাথে মুসলিম জাতির আচরণবিধিও বর্ণনা করে। বিয়ে, (সন্তান) পরিচর্যা ও তালাকের মতো পারিবারিক বিষয় থেকে শুরু করে সামাজিক জীবনযাপনের ব্যাপারেও বিধিবিধান দেয়। শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্কের রূপরেখা ঠিক করে দেয়। অর্থের লেনদেন এবং আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দেয়। প্রত্যেককে তার নিজ কাজকর্মের পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত করে, কারণ আখিরাতে সকলেই এগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণাম সম্পর্কে সঠিক বুঝ অন্তরে পয়দা করে। কেউ সীমালঙ্ঘন করলে তার শাস্তি কতটুকু হবে, সেটাও নির্ধারণ করে দেয়। মোটকথা, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঠামোর মধ্যে থেকে ইসলাম মানবজাতির জীবনের সকল বিষয়ের সমাধান দেয়। এমন একটি জীবনব্যবস্থাকে কী করে অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে? আল্লাহ বলেন :

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানবেন না? তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী ও ওয়াকিবহাল।"[১৪৭]

ইসলামকে আংশিক বানিয়ে ফেলার যে-কোনো প্রচেষ্টাই অমার্জনীয় পাপ, কারণ এর মাধ্যমে পুরো ব্যবস্থাটিই ধসে পড়বে। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস বাদ দিয়ে ইসলামি কাজকর্ম করা যায় না, আবার ইসলামি কর্মকাণ্ড বাদ দিলে শুধু বিশ্বাসের কোনো কার্যকারিতা থাকে না। মানুষের পারস্পরিক আচার-আচরণের ইসলামি নীতি বাদ দিয়ে কেবল ইসলামি আচার-অনুষ্ঠান পালন করলেও সেটা আর ইসলাম থাকবে না। আমাদের মুসলিমদের কখনোই উচিত হবে না ইসলামের কিছু অংশ গ্রহণ করে অপর কিছু অংশ বাদ দিয়ে দেওয়া। এমনটা করলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّـهُ إِلَيْكَ

---

[১৪৬] সূরা আলে ইমরান ৩:১৫৯

[১৪৭] সূরা আল-মুলক ৬৭:১৪

> “আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী তুমি তাদের মাঝে বিচার-ফয়সালা করো। তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কোরো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাকো; যেন আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন, তার কোনো কিছু থেকে তারা তোমাকে ফিতনায় ফেলতে না পারে।”[১৪৮]

ইসলাম পরিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ দ্বীন বলেই এটি মানবজীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে সফল হয়। এর কোনো অংশ বাদ দিলে বা পরিবর্তন করলে তা আর সফল হতে পারে না। তার ওপর আধুনিক বিশ্ব এত এত চাহিদা নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে যে, ইসলামের সকল অংশকে গ্রহণ না করলে আমরা এগুলোর মোকাবিলা করতে পারব না।

আমাদের সঠিক আকীদা-সম্পন্ন হতে হবে, যেন আমাদের হৃদয় হয় আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ়চেতা। এর ফলে আমরা আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে সব বাধা অগ্রাহ্য করে আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারব। এমন আকীদার দিকেই আমরা মানুষকে ডাকি এবং এরই শিক্ষা দিই।

ফরয-নফল সকল রকম ইবাদতই আমাদের করতে হবে। কারণ পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে এগুলোই আমাদের সাথে যাবে। পাথেয় ছাড়া ভ্রমণ কী করে সম্ভব? এই ইবাদত তথা নেক আমলের ফলে আমাদের অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের বিরুদ্ধে এগুলো আমাদের হাতিয়ার। নিজেরা তা পালন করা ও অন্যদেরকে এর দিকে ডাকার জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করি।

আল্লাহ যেভাবে চান, সেভাবে তাঁর ইবাদত করার জন্য ইলম তথা ইসলামি জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সরল পথ থেকে যাতে বিচ্যুত না হয়ে যাই, তার জন্য জ্ঞান অপরিহার্য। নাহলে আমরা তাদের মতো হয়ে যাব “দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে আর তারা নিজেরা মনে করেছে যে তারা অনেক ভালো কাজ করছে।”[১৪৯] তাই আমাদের লক্ষ্য হলো নিজেরা জ্ঞান অর্জন করে অপরকেও শিক্ষা দেওয়া।

আমাদের আচার-আচরণ যেন সঠিক ও সুন্দর হয়, সেজন্য আমাদের উত্তম চরিত্র অর্জন করতে হবে। শরিয়ত যার সাথে যখন যেভাবে আচরণ করতে বলেছে, তার সাথে তখন সেভাবেই আচরণ করতে হবে। জাহিলি আচরণের কাদায় পিছলে পড়া যাবে না। আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা থাকতে হবে নিজের ও আমাদের আশপাশের মানুষদের চরিত্র পরিশুদ্ধ করার।

---

[১৪৮] সূরা আল-মাইদাহ ৫:৪৯
[১৪৯] সূরা আল-কাহফ ১৮:১০৪

ইসলামের এই বার্তাকে সমগ্র মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কাফিরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত, মুসলিমকে সঠিকভাবে নেক আমল করার দাওয়াত, গুনাহগারকে তাওবা করার দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। ইসলামের প্রচার-প্রসার না করা হলে এর বিশুদ্ধ বার্তা হারিয়ে যাবে। বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের প্রচারণা ইসলামের দাওয়াতকে ঢেকে দেবে। তাই মানুষের কাছে এই দ্বীনের তাবলীগ করতে হবে, জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্কতা জানাতে হবে।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে হবে। অন্যথায় ইসলামের দাওয়াত ধ্বংস হয়ে যাবে। যতরকম অসৎকাজ আমাদের চোখে পড়ে সেগুলো দূর করতে এবং যতরকম সৎকাজ থেকে আমরা বঞ্চিত সেগুলো অর্জন করতে কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে। এই প্রচেষ্টা হবে ইসলামি আইন ও আলেমগণের শিক্ষা অনুযায়ী।

আমাদের জিহাদ করতে হবে। কারণ জিহাদ ছাড়া কখনোই ইসলামের পতাকা উত্তোলন এবং কুফরি শক্তিগুলোর প্রভাব-প্রতিপত্তি খতম করা যাবে না। আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন করা শাসকদেরকে হটিয়ে পুনরায় খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করার জন্য জিহাদ অপরিহার্য। এ ছাড়া, আমাদের যেসব ভূখণ্ড কাফিররা দখল করে নিয়েছে, সেগুলো পুনরুদ্ধারের পথও জিহাদ। আমাদের নিজেদের জিহাদের প্রস্তুতি নিতে হবে এবং মুমিনদের এর জন্য উৎসাহিত করতে হবে। আমাদের ছোট-বড় সকল বিষয়ে নবীজি ﷺ-এর দেখানো পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। এর ফলে আমাদের অন্তরে নবীর প্রতি ও আল্লাহর দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। এটি আল্লাহকে ভালোবাসার একটি নিদর্শন :

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

> "(হে মুহাম্মাদ! মানবজাতিকে) বলো, তোমরা যদি (সত্যিই) আল্লহকে ভালোবেসে থাকো, তা হলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি মার্জনা করে দেবেন। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৫০]

আমাদের নবীজির পথ অনুসরণের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে ও অন্যদেরও এর দিকে ডাকতে হবে। আমাদের সকল বিষয়ে আল্লাহর আইনের শরণাপন্ন হওয়া অপরিহার্য। আমাদের দায়িত্ব হলো এর দিকে আহ্বান জানানো ও আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য জিহাদ করা।

---

[১৫০] সূরা আলে ইমরান ৩:৩১

এই সবকিছু এবং আরো যা কিছুর হুকুম ইসলাম আমাদের দেয়, সেই সবকিছুই আমাদের পালন করতে হবে। এর যে-কোনো একটি অংশ ছেড়ে দেওয়ার অর্থই হলো আমাদের আন্দোলনের ব্যর্থতা ও পরাজয়কে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা। কারণ আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-এর ওপর নাযিলকৃত এই দ্বীনকে বিজয়ী করার ওয়াদা করেছেন ঠিকই। কিন্তু এই বিজয় তিনি তাদেরই দেবেন, যারা এই দ্বীনকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে:

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّـهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

"আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রান্ত।"[১৫১]

উল্টোদিক থেকে বললে, অন্য সব নব-উদ্ভাবিত ও আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য মতাদর্শ কখনোই বিজয় বা গৌরবের অধিকারী হবে না। ইসলামের অপরিহার্য কোনো অংশকে বর্জন করলে সেটা আর ইসলাম থাকে না বরং অন্য মতাদর্শের মতোই হয়ে যায়। তা হলে আমাদের ইসলামকে কাটছাঁট করার সাহস কীভাবে হয়? আমাদের আর কী অজুহাত থাকতে পারে? যখন আমাদের প্রতিপালক বলেই দিয়েছেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিলাম।"[১৫২]

ইসলামের কোনো অংশকে আলাদা সরিয়ে রেখে সেটাকে ইসলাম-বহির্ভূত দাবি করার কোনো অধিকার বান্দার নেই। অথবা ইসলামের কোনো একটি অংশকে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বলে দাবি করারও কোনো অধিকার নেই। আল্লাহ খুব কড়া ভাষায় আমাদের এসব করতে নিষেধ করে দিয়েছেন:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّـهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করো? অতএব তোমাদের মধ্যে যে এমনটা করে, তাদের পার্থিব জগতে

[১৫১] সূরা আল-হাজ্জ ২২:৪০
[১৫২] সূরা আল-মাইদাহ ৫:৩

> লাঞ্ছনা-অবমাননা ছাড়া আর কী প্রতিদান হতে পারে? এবং কিয়ামাতের দিন তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। আর তারা যা করে, তা সম্পর্কে আল্লাহ অনবহিত বেখবর নন।"[১৫৩]

কত নাদান যে আজকাল আল্লাহর কিতাব, নবীজি ﷺ-এর সুন্নাহ ও সালাফগণের বুঝের ওপর নিজেদের ধ্যান-ধারণাকে স্থান দিতে শুরু করেছে তার ইয়ত্তা নেই। অনেকে আছে যারা ইসলামের প্রাথমিক যুগের জন্য প্রযোজ্য নিয়মগুলোই কেবল আঁকড়ে ধরে থাকে। কেউ কেউ 'মাক্কী যুগে'র অজুহাত দেয়, কেউ শুধু গোপনে ইসলাম প্রচারকে যথেষ্ট মনে করে, কেউ শুধু 'রক্ষণাত্মক জিহাদে'র বিধানকে স্বীকার করে। অনেককে দেখে তো আবার মনে হয় এখনো ওহি নাযিলই হয়নি! এরকম প্রতিটা মানুষই ইসলামের কোনো না কোনো অংশকে বাদ দিয়ে হিসেব করে। কেউ হিসবাহ অস্বীকার করে, কেউ জিহাদ এড়িয়ে চলে, কেউ দাওয়াত দেয় না, আর কেউ পুরো ইসলামকেই ত্যাগ করে বসেছে। এই সব লোক ও তাদের মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচন করা আমাদের দায়িত্ব। এদেরকে অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করার নসিহত করতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামে ফিরে আসার আহ্বান জানাতে হবে।

আল্লাহর কসম! এরা ইসলামের একেক অংশ অস্বীকার করে কেবল নিজেদের ভীরুতা ও অলসতার কারণেই। ইসলামের যেসব অংশকে তাদের খেয়াল-খুশির বিরুদ্ধে মনে হয় না, সেগুলোকেই কেবল তারা নির্দ্বিধায় মানে। তারা যদি ইসলামকে কাটছাঁট না করে নিজেদের ভীরুতা ও অলসতার কথা স্বীকার করে নিত, তা হলে সেটাই তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। কিন্তু না! তারা ইসলামকে কাটছাঁট করে নিজেদের ভীরুতা ও অলসতার সাথে মানিয়ে নিয়েছে।

এখানেই শেষ না। তারা এই দাবি করারও সাহস পায় যে, তাদের এই কর্মপদ্ধতিই নাকি বেশি প্রজ্ঞাপূর্ণ। নেতা-বুদ্ধিজীবী-দার্শনিক-তাত্ত্বিক হিসেবে তাদের পদগুলো যতদিন টিকে আছে, ততদিন আল্লাহর দ্বীন বিকৃত হলো কি হলো না এ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

এই লোকগুলোর মুখোশ উন্মোচন করা জরুরি। কারণ তারা ইসলামকে রক্ষা করার মৌখিক দাবি করছে, অথচ ইসলামের ভিত্তিকে নিজেরাই গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। এরা ইসলামকে ভাঙচুর করে, অথচ দাবি করে একে নির্মাণ করার। এরা ইসলামকে প্যারালাইজড করে দেয়, নিরস্ত্র করে ফেলে, পঙ্গু করে দেয়, তারপর দোর্দণ্ড জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়ে দেয়। এরপর তাদের এই বিকলাঙ্গ ইসলাম যখন পরাজিত হয়, তখন মানুষ ভাবে যে আল্লাহর দ্বীন ইসলাম পরাজিত হয়ে গেছে।

---

[১৫৩] সূরা আল-বাকারাহ ২:৮৫

একটা প্রশ্ন জাগে। ইসলাম কি এতই অসহায় যে, কিছু লোক 'বুদ্ধিবৃত্তিক খবরদারি' না করলে এর চলেই না? অথচ এসকল বুদ্ধিজীবীরাই তো কুরআন-সুন্নাহ-ইজমাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইসলামের কিছু অংশ মুছে ফেলার ও পরিবর্তন করার 'মহান' দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে।

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾

> "তিনি (আল্লাহ) পবিত্র ও অতি উচ্চ, তারা যা বলে তা থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।"[১৫৪]

নিশ্চয় আল্লাহ ভালো করেই জানেন ইসলামকে কীভাবে সাজাতে হবে, কীভাবে এর অনুসারীদের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে, কীভাবে শিক্ষা দিতে হবে, এবং গুরুত্বের ভিত্তিতে কাজের ক্রম কীভাবে নির্ধারণ করতে হবে। আল্লাহ ভালো করেই জানিয়ে দিয়েছেন জাহিলিয়াতকে কখন আক্রমণ করতে হয়, কখন আক্রমণ না করে সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়। এই উম্মাতের সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এই সব বিষয় ধরে ধরে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। আর সব যুগেই এমন আলেম থাকবেন যারা এই বিশুদ্ধ বার্তা মানুষের কানে পৌঁছে দেবেন। আর যারা ভ্রান্ত মত-পথ আর নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, ইসলাম তাদের ছাড়াই চলতে পারবে। তাদের 'অভিভাবকগিরি' আর তত্ত্ব-দর্শনের কোনো প্রয়োজনীয়তা ইসলামের নেই। দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে এরা মূল্যহীন। ইসলাম চায় একনিষ্ঠ অনুসারী, যারা এতে কোনো পরিবর্তন, সংকোচন বা পরিবর্ধন সাধন করবে না।

যারা ইসলামের ওপর 'অভিভাবকগিরি' করতে চায়, তাদেরই বরং উচিত ইসলামকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যের চিকিৎসা করা। নিজেদের বুদ্ধিহীনতার কারণেই তারা ইসলামের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জ্ঞানকে আয়ত্ত করতে পারেনি। এজন্যই তারা ইসলামকে নিজেদের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে চায়।

ইসলামের শিক্ষা এবং মুসলিম আলেমগণের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে, জিহাদ করার সামর্থ্য না থাকলে তখন আর জিহাদ করা ফরয থাকে না। কিন্তু তখন জিহাদের সামর্থ্য অর্জন করাটাই ফরয হয়ে যায়। কোনো অসৎকাজের নিষেধ করতে গেলে যদি ফলস্বরূপ এর চেয়েও অসৎ কোনো কাজ শুরু হয়ে যায়, তা হলে ওই ক্ষেত্রে অসৎকাজের নিষেধ স্থগিত রাখতে হয়। অসৎকাজের নিষেধ করাটাই তখন নিষেধ। কিন্তু এগুলো হলো বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ বিধান। তাই বলে দুর্বলতার অজুহাত দিয়ে হিসবাহ কিংবা জিহাদকে একেবারে চিরতরে ত্যাগ করা, নতুন

---

[১৫৪] সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৪৩

বিধান আবিষ্কার করা বা ইসলামের মানসুখ (রহিত) বিধানগুলো পুনরায় চর্চা করতে শুরু করা—এ সবই অমার্জনীয় অপরাধ। এমন অবস্থান গ্রহণের অর্থ হলো নিজেদের দুর্বল অবস্থাকে চিরস্থায়ী করার চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তাআলা যখন দ্বীনকে পূর্ণ করেই দিয়েছেন, তখন এর বিধিবিধানগুলো আমাদের ওপর চিরতরে আবশ্যক হয়ে গেছে। কোনো একটা সময়ে এসে যদি আমরা নিজেদের দুর্বল অবস্থায় আবিষ্কার করি, তা হলে দুর্বলতা কাটিয়ে সবল অবস্থায় ফেরার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তা না করে দুর্বল অবস্থায়ই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকলে চিরস্থায়ী গ্লানি ও অপমানের বোঝা বইতে হবে।

যারা এই দুর্বল অবস্থাকে স্থায়ী করার জন্য নতুন নতুন বিধান আবিষ্কার করে, তারা একসময় এই অপমানজনক অবস্থা মাথায় নিয়েই মারা যাবে। সেই সাথে তাদের বিকৃত কর্মপদ্ধতিও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর নয়তো তারা তাওবা করে সঠিক ইসলামে ফিরে আসবে। এদের দুর্বল দলিল ও যুক্তিগুলো শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সত্যনিষ্ঠ পূর্বসূরিগণের কেউই কখনোই এসব কথাবার্তা বলেননি। বোঝায় যায় যে এসব যুক্তিতর্কের দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো ইসলামের বিধিবিধানকেই ছুড়ে ফেলা। যারা 'মাক্কী যুগে'র দোহাই দেয়, তারা কি মাক্কী যুগের মতোই জেরুজালেমের মসজিদুল আকসার দিকে ফিরে সালাত আদায় করবে? মদপানকে হালাল ঘোষণা করবে? তাহাজ্জুদ সালাতকে ফরয বলে মেনে নেবে? নাকি 'মাক্কী যুগে'র অজুহাত কেবল জিহাদ, হিসবাহ আর তাদের অপছন্দের সব বিধানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য?

ইসলামকে সঠিকভাবে বোঝার মানদণ্ড হলো যেভাবে এই উম্মাহর সত্যনিষ্ঠ পূর্বসূরিগণ বুঝেছেন। তাঁরা হলেন সাহাবি, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবিঈ, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবি-তাবিঈনগণ এবং তাঁদের সকলের পদাঙ্ক অনুসরণকারী অন্য সবাই। এঁরা এই দ্বীনে নতুন কিছু যোগ করেননি, কিছু পরিবর্তন করেননি, কোনো অংশ বাদ দিয়ে দেননি। তাঁরা নবীজির এই কথার বাস্তব প্রতিচ্ছবি, "অবশ্যই আমার সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ মেনে চলো এবং তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো।" (তিরমিযি)

এঁরাই হলেন আমাদের পথ চলার আলো। এঁদের ধরে ধরে আমরা সেই ইসলামের কাছে পৌঁছাব, যা নাযিল হয়েছিল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর। এই আমানত বহনের জন্য আল্লাহ প্রতিটি প্রজন্ম থেকেই সৎ আলেমগণকে বেছে নিয়েছেন। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে লিপ্ত, তাদের অবশ্যই এসকল আলেমগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে।

আওযাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "ধৈর্য ধরে সুন্নাহর অনুসরণ করতে থাকো। তাঁরা (সাহাবিগণ) যে অবস্থান নিয়েছেন, সে অবস্থান ধরে রাখো। তাঁরা যা বলেছেন, তা-ই বলো। তাঁরা যা এড়িয়ে গেছেন, তা এড়িয়ে চলো। এবং সালফে সালিহীনের পদাঙ্ক

অনুসরণ করো।"[১৫৫]

নবীজির ওপর নাযিল হওয়া ইসলামকে যারা মানতে চায়, তাদের জন্য কয়েকজন আদর্শ হলেন আবূ বকর, উমর ইবনুল খাত্তাব, 'উসমান বিন আফফান, আলী ইবনু আবি তালিব, যায়দ বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আল-আস, সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব, খারিজাহ ইবনু যায়দ, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, সুলাইমান বিন ইয়াসার, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ উতবাহ, আবূ বকর ইবনু আব্দুর রহমান, সামিল ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমর, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ, বুখারি, মুসলিম, ইবনু মাঈন, ইবনুল মাদীনী, ইবনু তাইমিয়্যাহ, যাহাবী, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনু রজব-সহ আরো অনেকে।

আর যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে সন্তুষ্ট, তারা "সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছে।"[১৫৬] তারা সত্যকে ছেড়ে মিথ্যা বেছে নিয়েছে। "অতএব, সত্যের পর পথভ্রষ্টতা ব্যতীত আর কীই-বা থাকতে পারে?"[১৫৭]

সত্যনিষ্ঠ পূর্বসূরিগণের বুঝেরই অনুসরণ করতে হবে। কারণ তাঁদের ছিল ইজতিহাদ করার মানসিক সক্ষমতা। প্রতি শতাব্দীতে আল্লাহ তাঁদের মতো প্রাজ্ঞ মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন, যারা উম্মাতের জন্য এই দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করেন। বিশ্বব্যাপী মুসলিমরা তাঁদের জ্ঞান, দ্বীনদারি, প্রজ্ঞা ও সৎপথে চলার কথা স্বীকার করে। তাঁরা আল্লাহকে ভয় করেন, দুনিয়াবি লোভ বা শাসকের ভয়ে সত্য গোপন করা থেকে বিরত থাকেন। যে-কোনো কথা বলার আগে তাঁরা যেন চোখের সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখতে পান। তাঁরা এই আয়াতের ওপর আমল করেন :

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّـهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّـهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِيبًا

> "তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করত আর তাঁকে ভয় করত। আল্লাহ ছাড়া কাউকে তারা ভয় করত না। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"[১৫৮]

তাঁরা কখনোই কুরআন-সুন্নাহর ওপর নিজেদের যুক্তিতর্ককে স্থান দেননি। নিজেদের মতামতকে তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর দলিল দ্বারা প্রমাণ করতেন। তাঁদের কোনো কথা যদি অনিচ্ছাবশত নবীজির সুন্নাহর বিরুদ্ধে চলে গিয়েও থাকে, তা প্রকাশ হওয়ার সাথে

---

[১৫৫] উসুলু ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, ১/৩০৭
[১৫৬] সূরা আল-মাইদাহ ৫:১২
[১৫৭] সূরা ইউনুস ১০:৩২
[১৫৮] সূরা আল-আহযাব ৩৩:৩৯

সাথে সেই কথা ছুড়ে ফেলার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। নিজেদের যে-কোনো ভুলত্রুটি থেকে আল্লাহর দ্বীনের সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে গেছেন। নবীজি ﷺ-এর বিরুদ্ধে গিয়ে অন্য কোনো আলেমের অন্ধ অনুসরণ করাকে তাঁরা নিষেধ করে গেছেন। তাঁরা বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির পথ পরিহার করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন।

তাঁরা ইখলাস সহকারে আল্লাহর আনুগত্য করতেন, সুন্নাহ অনুসরণ করতেন ও এই সত্য দ্বীন মেনে চলতেন। তাই আল্লাহ তাঁদের কোনো ভুল মতের ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। তাঁদের বানিয়েছেন হক পথের মাইলফলক, যাদের দেখে দেখে পথিক বুঝতে পারে যে সত্যের পথেই আছে। আল্লাহ বলেন :

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

> "যে ব্যক্তি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সে পথেই ফিরাব যে পথে সে ফিরে যায়। আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব। কত মন্দই-না সে আবাস!"[১৫৯]

সালফে সালিহীনের পথ অনুসরণ করা হলো ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে আমাদের গ্যারান্টি। এটি হলো মুমিনদের সেই 'বিজয়ী দলে'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চাবিকাঠি, যেই দলের ব্যাপারে নবীজি ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মাহর একটি দল সত্যের ওপর থেকে যুদ্ধ করতে থাকবে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে।" (বুখারি) এই পথ ছেড়ে অন্য পথের অনুসারী হয়েও নিজেকে ইসলামের অনুসারী দাবি করাটা মিথ্যে দাবি। এমন মিথ্যে দাবিতে আমাদের চারপাশ আজ ভরপুর।

---

[১৫৯] সূরা আন-নিসা ৪:১১৫

আমাদের লক্ষ্য

১. মানবজাতিকে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে আসা।

২. নবীজি ﷺ-এর কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করা।

মোটকথা, আল্লাহর এই হুকুম বাস্তবায়ন করা :

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ

"তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করো।"[১৬০]

আমাদের লক্ষ্য হলো, প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে, প্রতি ইঞ্চি ভূখণ্ডে, প্রতিটি ঘরে, প্রতিষ্ঠানে ও সমাজে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। এ কাজে সফল হওয়ার জন্য আমাদের দুটি কাজ অবশ্যই করতে হবে।

১. মানুষকে তাদের রবের দাসত্বের দিকে ফিরিয়ে আনা, এবং

২. নবীজির গড়ে যাওয়া ভিত্তির ওপর খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করা।

দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর দেওয়া হুকুম বাস্তবায়নের জন্য এই দুটি লক্ষ্যকে আমরা বাস্তবায়নের চেষ্টা করি।

আগেও বলা হয়েছে যে, মানুষ হলো আল্লাহর দাস এবং এই পৃথিবী আল্লাহরই মালিকানাধীন। অতএব, প্রতিটি ব্যক্তিকে ইসলামে প্রবেশ করতে বলা হবে এবং প্রতিটি ভূখণ্ড ইসলাম অনুযায়ী শাসিত হবে। যেসব মানুষ জীবনের আসল উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে দিগ্‌বিদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের হুঁশ ফিরিয়ে এনে সরল পথে ডেকে আনতে হবে। 'মানুষকে তাদের রবের ইবাদতের দিকে ফিরিয়ে আনা' বলতে এটিই বোঝানো হয়েছে। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই তা করতে হবে—বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, আচরণ, লেনদেন, চরিত্র ও বিচার-আচার সবখানেই। এর অর্থ হলো সরকারব্যবস্থাও ইসলামি হতে হবে। ইসলামি আইনসমূহ প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করতে হবে। ইসলাম নিয়ন্ত্রিত একটি ব্যবস্থাই পারে মানুষের দ্বীনকে সুরক্ষা দিতে। যে-সকল জিন ও মানুষ শয়তান তাদের

---

[১৬০] সূরা আশ-শুরা ৪২:১৩

দ্বীনের বাইরে নিয়ে যেতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে।

অনৈসলামিব্যবস্থার অধীনে বসবাস করার অর্থ হলো, বিবাদ মীমাংসার জন্য বিচারক হিসেবে ইসলামকে না মেনে নেওয়া তথা পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম কায়েম না করা। ইসলামকে তার এই ন্যায্য অবস্থান থেকে সরানো মানেই হলো, সেই জায়গায় জাহিলি শক্তিকে আসন গেড়ে বসতে দেওয়া—যা মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের বাইরে নিয়ে যাবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার একটি ভিত্তিই হলো জনগণকে শাসন করা ও পথ দেখানোর জন্য একটি রাজনৈতিকব্যবস্থা গড়ে তোলা। এমন একটি ব্যবস্থা ছাড়া দ্বীন কখনোই পূর্ণ হবে না।

ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "জেনে রাখুন যে, শাসন ও সরকারব্যবস্থা পরিচালনা করা ইসলামের সবচেয়ে বড় হুকুমগুলোর একটি। এটি ছাড়া কখনোই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।"[১৬১]

অতএব, নবীওয়ালা তরিকায় খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করা আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা ইসলামের শেখানো মাধ্যমগুলোই ব্যবহার করব। যেমন : দাওয়াত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের পথে এই প্রতিটি মাধ্যমেরই নিজ নিজ ভূমিকা রয়েছে। প্রতিটিরই নিজ নিজ প্রয়োগক্ষেত্র এবং নিয়মাবলি রয়েছে। এর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে 'আমাদের পথ' অধ্যায়ে।

১. মানুষকে তাদের রবের দাসত্বের দিকে আনা

আসমান-জমিন, ফেরেশতা-মানুষ, দিন-রাত, সিরাত-মীযান, জান্নাত-জাহান্নাম সবকিছু সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর ইবাদত সংঘটিত হওয়া।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿١٦﴾

"আসমান ও জমিন এবং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী কোনোকিছু আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।"[১৬২]

মানবজাতিকেও বেহুদা সৃষ্টি করা হয়নি।

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

[১৬১] আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ, ১/২১৭
[১৬২] সূরা আল-আম্বিয়া ২১:১৬

"তোমরা কি ভেবেছিলে যে, আমি তোমাদের তামাশাচ্ছলে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না? সুউচ্চ মহান আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, সম্মানিত আরশের অধিপতি।"[১৬৩]

মানুষ ও জিন জাতিকে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করা হয়নি।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝٥٦

"আমি জিন ও মানবজাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।"[১৬৪]

তাই আমাদের এই পুরো অস্তিত্বের একমাত্র কারণ হলো আল্লাহর ইবাদত করা। আমরা সৃষ্টিই হয়েছি আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পালন করার জন্য। এই দায়িত্ব নবীজি ﷺ-এর হাদীসে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তিনবার ডেকে বললেন, "তুমি কি জানো বান্দার ওপর আল্লাহর অধিকার কী?" মুআয জবাব দিলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" নবীজি বলেন, "বান্দার ওপর আল্লাহর অধিকার এই যে, বান্দা শুধু আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।"[১৬৫]

এই সেই দায়িত্ব, যা পালন করতে বান্দা বাধ্য। আল্লাহর দাসত্ব করা; পূর্ণ বিনয়, ভালোবাসা, আস্থা, সচ্চরিত্র ও ভয় নিয়ে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা। এজন্যই আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদতের দিকে ডাকার উদ্দেশ্যে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝٢٣

"আর নিশ্চয় নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি (তাঁকে) ভয় করবে?'"[১৬৬]

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١٦

[১৬৩] সূরা আল-মুমিনূন ২৩:১১৫-১১৬
[১৬৪] সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫৬
[১৬৫] বুখারি : ৬২৬৭; মুসলিম : ১৫২
[১৬৬] সূরা আল-মুমিনূন ২৩:২৩

"স্মরণ করো, যখন ইব্রাহীম তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে!'"[১৬৭]

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّـهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ

"এবং আদ জাতির প্রতি (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই হূদকে। সে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।'"[১৬৮]

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّـهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ

"আর সামূদ জাতির প্রতি (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই সালিহকে। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।'"[১৬৯]

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّـهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ

"আর মাদইয়ানের লোকদের নিকট (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই শুআইবকে। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।'"[১৭০]

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"এবং নিশ্চয় আমি প্রত্যেক উম্মাহর মাঝে রাসূল পাঠিয়েছি (যাতে তারা প্রচার করে), 'আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগূতকে (মিথ্যা উপাস্য) প্রত্যাখ্যান করো।"[১৭১]

কুরআনে আরো উল্লেখ আছে বানী ইসরাঈলের প্রতি মারইয়ামপুত্র ঈসার আহ্বান :

وَإِنَّ اللَّـهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَـٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। কাজেই তাঁরই ইবাদত করো, এটিই সঠিক পথ।"[১৭২]

---

[১৬৭] সূরা আল-আনকাবূত ২৯:১৬
[১৬৮] সূরা হূদ ১১:৫০
[১৬৯] সূরা হূদ ১১:৬১
[১৭০] সূরা হূদ ১১:৮৪
[১৭১] সূরা আন-নাহল ১৬:৩৬
[১৭২] সূরা মারইয়াম ১৯:৩৬

নবীজি ﷺ-এর আগমনের কারণও এটিই— "যাতে শুধুই আল্লাহর ইবাদত করা হয়, কোনো শরিক ছাড়া।"[১৭৩]

সাহাবিগণও রাসূলুল্লাহ-র কাছ থেক এই লক্ষ্যের কথাই বুঝেছিলেন। পারস্যের সেনাপতি রুস্তম যখন মুসলিমদের আগমনের কারণ জানতে চান, তখন রিবিঈ বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দেন, "আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে বের করে সর্বশক্তিমান এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে আসার জন্য।" মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই কারো না কারো দাস হয়ে থাকতে বাধ্য। এটি মানুষের অন্তর্নিহিত এক বৈশিষ্ট্য। এটি দূর করার কোনো ক্ষমতাই তার নেই। সে অবশ্যই আনুগত্য, ভালোবাসা, ভয় ও আশা সহকারে কারো না কারো দাস হয়ে থাকে। মানুষ যদি তার এই দাস প্রবৃত্তিকে সত্যিকারের উপাস্য আল্লাহর জন্য নির্ধারিত না রাখে, তা হলে অবশ্যই সে মিথ্যা উপাস্যদের দাসত্ব করতে শুরু করবে যারা "কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। আর নিজেদের ক্ষতি বা উপকার করার কোনো ক্ষমতাও তাদের নেই। আর তারা জীবন, মৃত্যু বা পুনরুত্থানকে নিয়ন্ত্রণ করে না।"[১৭৪]

এই বাস্তবতা আমাদের মানতেই হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে দিলে মিথ্যা উপাস্যদের দাসত্ব করাই লাগে। বিশ্বজগতে আল্লাহ যেসব অলঙ্ঘনীয় নিয়ম গেঁথে দিয়েছেন, এটি তার মধ্যে একটি।

খ্রিষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালাম-কে উপাসনা করে। ইহুদিরা বাছুরের উপাসনা করেছে। আরব মুশরিকরা খেজুর পিষে মূর্তি বানিয়ে সেগুলোর পূজা করত। ক্ষুধা লাগলে আবার সেগুলোকেই খেয়ে ফেলত। কয়েক মিনিট আগেই তারা যাকে সেজদা করে খাদ্য-পানীয় চাইছিল, তাকেই তারা খেয়ে ফেলত। আজো এমন মানুষ আছে—যারা আগুন, গাভি, গাছ, চাঁদ, সূর্য ইত্যাদির পূজা করে। এ ছাড়া অন্যরা হলো নিজেদের খেয়াল-খুশির গোলাম।

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّـهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّـهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

"তুমি কি তাকে দেখোনি যে আপন কামনা-বাসনাকে নিজের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয়? আল্লাহ জেনেশুনেই তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন আর তার কানে ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন আর তার চোখের ওপর টেনে দিয়েছেন পর্দা। অতঃপর আল্লাহর পর আর কে (আছে যে) তাকে সঠিক পথ দেখাবে?

[১৭৩] মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবাহ : ১৯৭৪৭

[১৭৪] সূরা আল-ফুরকান ২৫:৩

এরপরও কি তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করবে না?”[১৭৫]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “মানুষের কামনা-বাসনাও আল্লাহর পাশাপাশি পূজিত হওয়া একটি মিথ্যা উপাস্য।”[১৭৬] বলা হয়, “মানুষ তার যেসব খেয়াল-খুশির দাস, আল্লাহর দৃষ্টিতে সেগুলোর চেয়ে নিকৃষ্ট আর কিছুই নেই।”

যারা নিজেদের খাহেশাত ও কামনা-বাসনার গোলাম, তাদের ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “তারা এই মিথ্যা উপাস্যকে ভালোবাসা, ভয়, আশা, স্তুতি ও বিনয় সহকারে পূজা করে। তাদের সব ভালোবাসা, ঘৃণা, দান করা, দান করা থেকে বিরত থাকা—এ সবই হয়ে থাকে নিজের খাহেশাতকে খুশি করার জন্য। আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে নফসের সন্তুষ্টিই তাদের কাছে বেশি প্রিয়। খাহেশাত তার নেতা, কামনা-বাসনা তার পথপ্রদর্শক, অজ্ঞতা তার পরিচালক, অবহেলা তার বাহন।”[১৭৭]

কেউ কেউ এতই অহংকারী যে, আল্লাহর দাস হতে তারা লজ্জা পায়। তাই নিজেদের সম্পদের দাস হয়ে থাকে। নবীজি ﷺ বলেন, “দিনার, দিরহাম ও দামি রেশমি কাপড়ের দাসেরা ধ্বংস হোক! তাকে যদি এসব দেওয়া হয়, তা হলে সে খুশি হয়। আর দেওয়া না হলে অসন্তুষ্ট দুঃখিত হয়। সে কাঁটাবিদ্ধ হলে তা আর বের করে আনা যায় না।”[১৭৮]

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “দিনারের দাস মানে হলো সম্পদলোভী। সে এগুলোর প্রতি এতই আগ্রহী, যেন সে এগুলোর বান্দা।”[১৭৯]

আবার অনেকে আল্লাহর দাস হতে লজ্জা পেয়ে মানবরচিত আইন দিয়ে শাসনকারী শাসকদের দাস হয়ে থাকে। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আলেমরাও আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধান পাল্টে ফেলত। তাদের কথা মেনে চলা সাধারণ মানুষ ছিল তাদের বান্দা।

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّـهِ

“আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের আলেম ও পাদ্রিদের রব বানিয়ে নিয়েছে।”[১৮০]

আদী ইবনু হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি ﷺ-কে বলেন, “কিন্তু তারা তো তাদের উপাসনা করে না, হে রাসূলুল্লাহ!” নবীজি ﷺ জবাব দিলেন, “তারা হালালকে হারাম বানাত আর হারামকে হালাল বানাত। আর মানুষ তাদের অনুসরণ করত। এভাবেই তারা

---

[১৭৫] সূরা আল-জাসিয়াহ ৪৫:২৩
[১৭৬] তাফসির আল-কুরতুবি, ১৩/৩৫
[১৭৭] ইগাসাতুল লাহফান, ১/৯
[১৭৮] বুখারি: ২৮৮৭
[১৭৯] ফাতহুল বারী, ২৫/৪০৪
[১৮০] সূরা আত-তাওবা ৯:৩১

তাদের উপাসনা করত।"[১৮১]

আমাদের দায়িত্ব হলো মানুষকে ঝাড়া দিয়ে ঘুম থেকে তুলে বাস্তবতা দেখানো আর জিজ্ঞেস করা :

مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّـهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾

"ভিন্ন ভিন্ন রব ভালো, নাকি মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ?"[১৮২]

তাদের ঝাঁকুনি দিয়ে বলতে হবে :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّـهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

"হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে। অতএব, মনোযোগ দিয়ে শোনো। নিশ্চয় আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ডাকো, তারা সকলে মিলে একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না। এমনকি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিলে তারা তা উদ্ধার করতে পারে না। উপাসক ও উপাস্য উভয়ই দুর্বল। তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় না। আল্লাহ নিশ্চিতই ক্ষমতাশালী, মহাপরাক্রান্ত।"[১৮৩]

তাদের ঝাড়া দিয়ে বলতে হবে :

ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا

"আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। এক ব্যক্তি, যার পরস্পরবিরোধী অনেক মনিব। আরেক ব্যক্তি, যার সম্পূর্ণ মালিকানা একজনের (ওপর ন্যস্ত)। তুলনায় এ দুজন কি সমান?"[১৮৪]

আমরা তাদের ঝাঁকুনি দিয়ে বলি—হয় এক আল্লাহর দাসত্ব করো, আর নয়তো পরস্পরবিরোধী অসংখ্য মালিকের টানাহেঁচড়ার মধ্যে পড়ে যাও। এরা না কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে, না রিযিক দিতে পারে, না সৃষ্টি করতে পারে, না সম্মান বা অপমান দিতে পারে, না জীবন বা মৃত্যু দিতে পারে।

[১৮১] তিরমিযি : ৩০৯৫, বাইহাকি : ২০৮৪৭

[১৮২] সূরা ইউসুফ ১২:৩৯

[১৮৩] সূরা আল-হাজ্জ ২২:৭৩-৭৪

[১৮৪] সূরা আয-যুমার ৩৯:২৯

"তারা আল্লাহর পরিতবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে এই আশায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। ওইসব ইলাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়। বরং (উল্টো) এ লোকেরাই সদা প্রস্তুত সেনাবাহিনীর মতো হাজির হয়ে আছে (ওইসব ইলাহকে সাহায্য করার জন্য)।"[১৮৫] [আয়াতের শেষ অংশের আরেকটা অর্থ হয় '(কিয়ামাতের দিন একে অপরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য) তাদের বাহিনীর মতো হাজির করা হবে।']

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّـهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা তাদের জন্য পৃষ্ঠপোষক হয়। কক্ষনো না! তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে আর তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।"[১৮৬]

এইসকল মিথ্যা উপাস্য আখিরাতে তাদের ত্যাগ করবে। কী অদ্ভুত এক বাস্তবতা! আল্লাহর উপাসনা ছেড়ে মানুষ এইসব মিথ্যা উপাস্যগুলোকে কত মনপ্রাণ দিয়ে যে উপাসনা করে। কীসের আশায়, কী কারণে—তা বোঝাটাই দায়! এসকল মিথ্যা ইলাহ তাদের কোনো উপকার তো করবেই না, বরং শেষ বিচারের দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে।

لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّـهِ إِلَـٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٢﴾

"আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ সাব্যস্ত কোরো না। করলে তিরস্কৃত হতভাগ্য হয়ে পড়ে থাকবে।"[১৮৭]

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّـهِ إِلَـٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾

"আর আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য স্থির কোরো না। করলে তুমি নিন্দিত ও যাবতীয় কল্যাণ বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।"[১৮৮]

উবুদিয়্যাহ (ইবাদত/দাসত্ব) কাকে বলে? এটা কি শুধু সালাত, দুআ আর যিকিরেই সীমাবদ্ধ? এর উত্তর হলো—এগুলোও দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত, তবে এগুলোই সব নয়। দুনিয়ায় মানবজীবনের প্রতিটি কাজ ও সকল পরিস্থিতিই 'উবুদিয়্যাহ বা দাসত্বের' অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ আমাদের কাছে যে ধরনের ইবাদত চান, তা হলো কথা ও কাজ

[১৮৫] সূরা ইয়াসীন ৩৬:৭৪-৭৫
[১৮৬] সূরা মারইয়াম ১৯:৮১-৮২
[১৮৭] সূরা আল-ইসরা ১৭:২২
[১৮৮] সূরা আল-ইসরা ১৭:৩৯

উভয়ের মাধ্যমেই আদম আলাইহিস সালাম-এর এই সাক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করা :

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾

"সারা জগতের রব আল্লাহর কাছে আমি আত্মসমর্পণ করলাম।"[১৮৯]

নবী-রাসূলসহ সকল প্রকৃত বান্দাই কথা ও কাজের মাধ্যমে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা নবীজি ﷺ-কে আদেশ দেন :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

"বলো, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ (সবকিছুই) সারা জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমাকে এরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী।'"[১৯০]

আল্লাহ আমাদের যেই দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সেটা হলো আমাদের পুরো জীবনই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। আমাদের দিন-রাত, চিন্তা-ভাবনা, কথা-কাজ, জীবন-মরণ সবই আল্লাহকে খুশি করার জন্য হতে হবে।

ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ ইবাদতের সংজ্ঞায় বলেন, "প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যে-কোনো কথা ও কাজ, যা আল্লাহ ভালোবাসেন ও অনুমোদন দেন, তার সবই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, সত্য বলা, আমানত রক্ষা করা, পিতামাতার প্রতি সদাচরণ, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ, কাফির-মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ, প্রতিবেশী-ইয়াতীম-মিসকীন-মুসাফিরের প্রতি সদাচরণ, মালিকানাধীন দাসদাসী ও পশুপাখির প্রতি সদাচরণ, দুআ, যিকির, কুরআন তিলাওয়াতসহ সবকিছুই ইবাদতের সংজ্ঞার আওতায় পড়ে। অনুরূপভাবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা, আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর নিকট তাওবা করা, ইখলাস, আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ, তাঁর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় করা, আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা, তাওয়াক্কুল করা, আল্লাহর দয়া আশা করা, তাঁর শাস্তিকে ভয় করা ইত্যাদি সবই ইবাদতের উদাহরণ।"[১৯১]

এজন্যই আমাদের লক্ষ্য হলো মানুষকে জীবনের সকল ব্যাপারে এক আল্লাহর দাসত্বের

[১৮৯] সূরা আল-বাকারাহ ২:১৩১

[১৯০] সূরা আল-আনআম ৬:১৬২-১৬৩

[১৯১] আল-উবুদিয়্যাহ, ইবনু তাইমিয়্যাহ, পৃ. ৩৮

দিকে নিয়ে আসা। নিজের ও নিজের জীবনের সবকিছুর ব্যাপারেই বান্দা আল্লাহর প্রতি ঋণী। তাঁর ইবাদত করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই। সে যদি আল্লাহর আনুগত্য না করে, তা হলে সে হবে একজন ফেরারি আসামি, আর ওই "ব্যক্তির রয়েছে পরস্পর বিরোধী অনেক মালিক।"[১৯২]

অপরদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে জীবনের ছোট-বড় সকল ক্ষেত্রেই, তার "মালিক মাত্র একজন।"[১৯৩] এটি সেই ইবাদত/দাসত্ব, যার ব্যাপারে আজকের অধিকাংশ ব্যক্তি ও সমাজের কোনো ধারণাই নেই। প্রচুর ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সরকারের ব্যর্থতা ও দুর্দশার এটিই কারণ। একটু থেমে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, মানবজাতি আজ কেন ধুঁকছে? সরল উত্তর হলো, আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে, অন্যদের দাসত্ব করছে বলে।

মাত্র একজন নিয়ন্ত্রণকারী ছাড়া আসমান-জমিন ঠিকভাবে চলতেই পারবে না :

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّـهُ لَفَسَدَتَا

> "(আসমান ও জমিনে) যদি আল্লাহ ছাড়াও আরো কোনো ইলাহ থাকত, তা হলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।"[১৯৪]

হাজারো উপাস্যের কথামতো চলতে গিয়েই আজ মানবজাতির পার্থিব জীবন দুঃখ-কষ্টে ভরপুর হয়ে গেছে। কেউ আল্লাহর পাশাপাশি অন্য ইলাহকে মানছে, কেউ আল্লাহকে একেবারেই বাদ দিয়ে অন্য ইলাহর শরণাপন্ন হচ্ছে।

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ছাড়াও আরো কোনো ইলাহ থাকলে যেমন আসমান-জমিন ধ্বংস হয়ে যেত, একই ব্যাপার অন্তরের ক্ষেত্রেও ঘটে। একই অন্তর যদি আল্লাহকেও খুশি রাখতে চায় আবার অন্য মিথ্যা উপাস্যকেও খুশি রাখতে চায়, তা হলে অন্তর জটিলভাবে রোগাক্রান্ত ও দূষিত হয়ে যাবে। সেই রোগ ভালো করার একমাত্র উপায় হলো হৃদয় থেকে সব মিথ্যা উপাস্যকে বের করে দিয়ে এক আল্লাহর প্রতি সব ভালোবাসা, ভয়, আশা, আস্থা ও তাওবা বরাদ্দ রাখা।"[১৯৫]

বড়ই সত্যি কথা। মানুষ তার অবস্থা উন্নয়নের জন্য কত চেষ্টাই না করে! কিন্তু মানবতাকে আগে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে না আনলে সবই দিনশেষে পণ্ডশ্রম। সংস্কার ও প্রগতির নামে যত ফাঁকা স্লোগান আজকের যুগে প্রচলিত, সেগুলো দেখে বিভ্রান্ত না হওয়ার মতো অন্তর্দৃষ্টি মুসলিম হিসেবে আমাদের থাকা উচিত। সম্পদের অভাব,

[১৯২] সূরা আয-যুমার ৩৯:২৯
[১৯৩] সূরা আয-যুমার ৩৯: ২৯
[১৯৪] সূরা আল-আম্বিয়া ২১:২২
[১৯৫] ইগাসাতুল লাহফান, ৩০ পৃ.

জুলুমের প্রসার, বিধ্বংসী যুদ্ধ, সম্পদের অসম বণ্টন, গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি—এগুলো কোনোটাই মানবজাতির মূল সমস্যা নয়। সব সমস্যার শিকড় হলো আল্লাহর দাস হতে অস্বীকার করা, অথবা আল্লাহর দাসত্ব যে করতে হয় এটাই না জানা।

যেখান থেকে কাজ শুরু করতে হবে, তা হলো নিরবচ্ছিন্নভাবে, গুরুত্ব সহকারে, বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে মানুষকে তাদের রবের দাসত্বের দিকে আনতে থাকা। অন্য যে-কোনো প্রচেষ্টাই নিঃসন্দেহে সময় ও শ্রমের অপচয়। মুসলিমদের একমাত্র সমস্যা হলো আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে দেওয়া এবং জীবনের সব বিষয়ে পথভ্রষ্ট জাতিগুলোর অনুসরণ করা। এসকল পথভ্রষ্ট মুসলিম ও অমুসলিম জাতিগুলোকে সিরাতুল মুস্তাকিমে ফিরিয়ে আনতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। আর এজন্য দরকার আমাদের পক্ষ থেকে সত্যের দিকে নিরলস দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া। যারা সত্য দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে, তারা আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। আর যারা গোঁয়ারের মতো প্রত্যাখ্যান করবে, তাদের প্রতিরোধ করার জন্য হিসবাহ অথবা জিহাদ করা হবে, যে ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য। মানুষের সামনে পথ মাত্র দুটি। হয় তাদের আসল রব্ব আল্লাহর পথে ফিরে আসা; আর নয়তো নিজেদের মিথ্যে বিশ্বাস নিয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়ানো, আল্লাহর অনুগত বান্দাদের হাতে শাসিত হওয়ার জন্য কর্তৃত্বের আসন ছেড়ে দেওয়া। আল্লাহর জমিনে শিরকের পাপ চালিয়ে যাওয়া এবং শিরকি আইন দিয়ে জমিন শাসন করার কোনো অধিকার তাদের নেই।

২. নবীওয়ালা তরিকায় খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করা

মুসলিমদের অবহেলা ও অজ্ঞতার কারণে খিলাফাত প্রতিষ্ঠার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আজ বিস্মৃতপ্রায়। মুসলিমদের বিরাট একটা অংশ জানেই না যে, খিলাফাত প্রতিষ্ঠা নামে একটি ইবাদত আছে। তারা ভাবে, এটা মুসলিমদের প্রথম দিককার ইতিহাসের একটি অধ্যায়, যা এখন হারিয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও কখনো আর ফিরে আসবে না। পক্ষান্তরে যারা প্রকৃতই ইসলামের জন্য কাজ করে, তারা খিলাফাত পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই দায়িত্বকে অবহেলা করে না।

ইসলামের হুকুম মানার জন্যই আমরা খিলাফাত পুনরুজ্জীবিত করতে আগ্রহী। এর গৌরবময় অতীত ইতিহাস আমাদের স্পৃহা আরো বৃদ্ধি করে। আমরা ইসলামি রাষ্ট্র ফিরিয়ে আনতে চাই, যা পূর্বে চীন থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত এবং উত্তরে মধ্য ইউরোপ থেকে দক্ষিণে মধ্য আফ্রিকা পর্যন্ত তের শতক ধরে ন্যায়বিচার কায়েম করে গেছে। ইসলাম আমাদের খিলাফাত প্রতিষ্ঠা ও খলিফা নির্বাচনের হুকুম দেয়। মুসলিম উম্মাহর ব্যবস্থাপনার জন্য যে একজন খলিফা নিয়োগ করতে হবে, এ

ব্যাপারে শিয়া-সুন্নি-মুরজিয়াসহ সকলেই একমত।

এই লক্ষ্যে কাজ করতে শুরু করলেই মুনাফিক ও রোগাক্রান্ত অন্তরধারীদের আমরা বলতে শুনি :

غَرَّ هَٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ

“এই লোকগুলোকে তাদের দ্বীন ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।”[১৯৬]

কিন্তু আমরা তাদের জবাবে বলি :

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

“কেউ যদি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তা হলে আল্লাহ তো প্রবল পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।”[১৯৭]

আমরা এই মহান লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাই। আমাদের জানা আছে যে, আমাদের আত্মত্যাগের অনুপাতেই আসবে বিজয়ের সুবাস।

আমরা শুধু এমন খিলাফাতই মেনে নেব যা রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যা আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন করে। অতএব, আমাদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ যেন সেই পর্যায়েরই হয়। জমিনের যত ইঞ্চি আমরা খিলাফাতের অধীনে আনতে চাই, তার পুরোটাই যেন আমাদের রক্তে সিঞ্চিত হয়। আমাদের আত্মত্যাগ হোক উম্মাহর প্রথম জামানার মুসলিমদের অনুরূপ, যারা খিলাফাত প্রতিষ্ঠায় চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেননি। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ন্যায়পরায়ণ খিলাফাতর অধীনে এসেছিল সে-সময়কার বেশিরভাগ জনসংখ্যা। এর রাজধানী আবর্তিত হয়েছে মদীনা থেকে কুফা, দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো আর ইস্তাম্বুলে।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুসলিমদের অবহেলা, শাসকদের সীমালঙ্ঘন এবং ভেতর ও বাইরের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কারণে খিলাফাত অনেকসময় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ সবকিছুর পরও এটি ছিল ইসলাম, মুসলিম জনগণ ও মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর সংরক্ষক। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে একে টিকে থাকতে হয়েছে। ইসলামের ভ্রূণাবস্থার মদীনা রাষ্ট্রে কুরাইশদের আক্রমণের মাধ্যমে এই ধারা শুরু হয়। তারপর পশ্চিমে ক্রুসেডার আর পূর্বে মঙ্গোলিয়ানদের সাথে তুমুল সংঘর্ষ হয়। সবশেষে এসে এটি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে কামাল আতাতুর্কের মতো মুরতাদ সেক্যুলারিস্টদের সম্মিলিত

---

[১৯৬] সূরা আল-আনফাল ৮:৪৯

[১৯৭] সূরা আল-আনফাল ৮:৪৯

শয়তানি জোটের আক্রমণের শিকার হয়। ১৩৪০ বছরের প্রচেষ্টার পর অবশেষে ঈসায়ী ১৯২৪ সনে শয়তান তার সর্বশক্তি দিয়ে সফল আঘাত হানতে সমর্থ হয়। বিলুপ্তি ঘটে খিলাফাতের।

খিলাফাত পতনের সাথে সাথে স্রোতের মতো শত্রুদের প্রবেশের দুয়ার খুলে যায়। ১৩৪০ বছরের চাপা আক্রোশ বুকে নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। উম্মাহর ভূমিগুলো তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা শুরু করে। আমাদের বেশিরভাগ ভূমি ও জনগণের শাসনক্ষমতা পেয়ে বসে তারা। সামরিক আক্রমণের সাথে হাতে হাত ধরে চলেছে ভয়ংকর মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণ। মুসলিমদের হৃদয় ও অন্তরগুলোকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিটা ধর্ম ও গোষ্ঠীর নেকড়েমানবদের থাবা। এই সাংস্কৃতিক আক্রমণের সফল শিকারে পরিণত হয় পরবর্তী মুসলিম প্রজন্মগুলো। তাদের আকীদা বিকৃত করে দেওয়া হয়, তাদের ঈমান নড়বড়ে করে ফেলা হয়। কেউ পুরোপুরি ইসলাম ত্যাগ করে। নামমাত্র মুসলিম থাকা অনেকেই হয়ে পড়ে অন্তঃসারশূন্য খোলস মাত্র।

এই বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে সব রকম তাত্ত্বিক ও দার্শনিক অস্ত্র ব্যবহার করে সেক্যুলারিজম, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মতো ভ্রান্ত আদর্শগুলোর দিকে মুসলিমদেরকে আহ্বান করা শুরু হয়। কথিত উদারপন্থা ও স্বাধীনতার বুলি প্রচার করে মুসলিম তরুণ সমাজকে ইসলামি শালীনতা ও ভাবগাম্ভীর্য থেকে বের করে আনা হয়। তাদের বানানো হয় পার্থিব কামনা-বাসনা ও খেয়াল-খুশির গোলাম। গণমাধ্যম ও শিক্ষাব্যবস্থা হলো এই আক্রমণের প্রধান দুটি অস্ত্র। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান-সংগঠন নিয়ে গড়ে ওঠে সেনাবাহিনী। এদেরকে পূর্ণ রসদ যোগায় দালাল সরকার ও তাদের পেটোয়া বাহিনী।

কুফরি শক্তির সামরিক বিভাগের কাজ ছিল খিলাফাতকে ধ্বংস করা। কারণ এটি ছিল মুসলিমদের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা। তারা তাদের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। অপরদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক বিভাগের কাজ হলো ইসলামের অনুসারীদের মনে সন্দেহ-সংশয় ও হীনমন্যতা তৈরি করা, ইসলামের অর্থ বিকৃত করে দেওয়া। তারা তাদের কাজে অনেকাংশেই সফল।

আমাদের শত্রুরা ভালো করেই বুঝতে পেরেছে যে, খিলাফাত ধ্বংস করলেই ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে না। সেটার জন্য আরো কাজ করা লাগবে। তারা দেখল যে, ইসলাম যতদিন তার পূর্ণাঙ্গ ও সর্বব্যাপী রূপ নিয়ে মুসলিমদের মনে প্রোথিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এর অনুসারীরা হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাবে। ইতিহাসে এমনটা অনেকবার ঘটেছে এবং শত্রুরা এগুলো দেখে শিক্ষা নিয়েছে। ঐতিহাসিক প্রমাণ এই যে, খিলাফাতের দায়িত্ব পালনে একেকবার একেক ভূমি নেতৃত্ব দিয়েছে। প্রথমে

হিজায, তারপর শাম, ইরাক, মিশর হয়ে তুরস্ক পর্যন্ত এর ডানা বিস্তৃত হয়েছে। তাই সামগ্রিকভাবে মুসলিমদের মন থেকে যদি ইসলামের সঠিক ধারণা দূর করা যায়, তা হলে এই খিলাফাতের আবার মাথা তুলে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

ঠিক এ কারণেই মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলারিজমকে এত জোরেশোরে একটি নতুন ধর্মের মতো প্রচার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল এটি যেন ইসলামকে সরিয়ে নতুন একটি সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। আরব বিশ্বের অনেক প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্র এর ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে। সেক্যুলারিজমের প্রচারকরা ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের ডাক দিয়ে ইসলামকে শাসনতন্ত্র, রাজনীতি ও সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায়। এই নতুন ধর্মের মত হলো, ইসলামকে শুধু মসজিদে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে আর ধর্মীয় পালা-পার্বণগুলো পালন করা যাবে। ইসলামকে নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের আসনগুলোর কাছেও ভিড়তে দেওয়া হবে না, কারণ এগুলো সেক্যুলারিস্টদের একচ্ছত্র মালিকানায়। ইসলামকে এই নতুন ধর্মটি মসজিদের মিম্বর ছাড়া সমাজের অন্য কোনো আসন ব্যবহার করতে দেয় না। রাষ্ট্রকে নিজের এবং মসজিদকে ইসলামের সম্পত্তি বলে ঘোষণা দেয়। কেউ কারো সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করবে না।

অনেক মুসলিমই এই আকীদা গ্রহণ করে নিয়েছে এবং অনেক রাষ্ট্র এই মতবাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বিশ্বাস, ব্যবস্থা ও আদর্শ হিসেবে সেক্যুলারিজমকে মেনে নিয়ে আমরা ও আমাদের সরকারগুলো দীর্ঘসময় অতিবাহিত করেছে। মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে এই নতুন ধর্মটি জীবনের সকল পর্যায়ে আসন গেড়ে বসেছে। সরকার, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, শিক্ষা ও গণমাধ্যম সবখানে। আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে শয়তানের আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা জাহিল রেজিমগুলো আমাদেরও এই তন্ত্রে মগজধোলাই করতে চাচ্ছে। এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব রকম জাহিলিয়াতের প্রতি আনুগত্য দেখাচ্ছে। অথচ আল্লাহ বলেন :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

"তোমাদের (সত্যিকার) বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ।"[১৯৮]

হককে বাদ দিয়ে তারা লিবারেলিজম আর সোশ্যালিজমের দিকে ডাকে। অথচ আল্লাহর হুকুম হলো :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

[১৯৮] সূরা আল-মাইদাহ ৫:৫৫

"আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী তাদের মাঝে বিচার-ফয়সালা করো। আর তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কোরো না।"[১৯৯]

তারা জাতীয়তাকে ঐক্য ও ভেদাভেদের ভিত্তি হিসেবে বিশ্বাস করে। অথচ আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই।"[২০০]

তারা আমাদের ভূমি ও সম্মানকে শত্রুদের জন্য ছেড়ে দেয়। অথচ আল্লাহ বলেন :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّـهِ

"আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতদিন না ফিতনা (শিরক ও কুফর) দূরীভূত হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।"[২০১]

ইসলামকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে তারা নিজেদের মতো আইন রচনা করে; ইসলামের দিকে আহ্বানকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, এর অনুসারীদের হত্যা করে; ইসলামের নির্ধারিত সীমাগুলোর তোয়াক্কা করে না, হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম বানায়, মানুষের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই ধ্বংস করে দেয়।

এসব রেজিম বা সরকারের ব্যাপারে ইসলামের স্পষ্ট বিধান হলো যে, এরা কাফির, জাহিল ও অবৈধ। এদের টিকে থাকার কোনো অধিকারই নেই। এদের অপসারণ করতে হবে। মুসলিমদের মর্যাদা ও ভূমি পুনরুদ্ধার এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরক্ষার জন্য খিলাফাত ফিরিয়ে আনতে হবে।

এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আমাদের কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিতে হবে—এই যে আমরা আবারো চলে এসেছি! আমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাত। খিলাফাত পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমাদের লক্ষ্য। নবীজির হিজরতের সময় থেকে নিয়ে উসমানী শাসনামল পর্যন্ত আমাদের শত্রুরা নিরলস যুদ্ধ করেছে। ইসলামি রাষ্ট্র পুনরুদ্ধারে আমাদের জিহাদ-সংগ্রামও নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকবে। আমাদের শত্রুরা যেভাবে কষ্ট ভোগ ও আত্মত্যাগ করেছে, আমরাও সেভাবে কষ্ট ও আত্মত্যাগ করব। কিন্তু তারা আর আমরা সমান নই। আমরা আল্লাহর কাছে পুরস্কার ও শাহাদাত

[১৯৯] সূরা আল-মাইদাহ ৫:৪৯
[২০০] সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১০
[২০১] সূরা আল-আনফাল ৮:৩৯

কামনা করি, তারা সেটা করে না। আমাদের শহীদগণ আছেন জান্নাতে, আর তাদের মৃতরা আছে জাহান্নামে।

যেই খিলাফাতের কথা আমরা বলি, তা ইতিহাসের কোনো মানবরচিত সরকারব্যবস্থার মতো নয়। আমাদের রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি হলো, আল্লাহ হলেন বিধানদাতা এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির কাছে বার্তাবাহক।

আইন-বিধান প্রণয়নের অধিকার না খলিফার, না মজলিসে শুরার উপদেষ্টাদের, না সংসদের, না কোনো দলের, না কারো। এটি কেবলই আল্লাহর অধিকার। তবে হ্যাঁ, ইজতিহাদকে বিধানপ্রণয়ন বলে না। আল্লাহ যেসব পন্থার অনুমোদন দিয়েছেন, নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেগুলো ব্যবহার করে সেই নতুন বিষয়ে আল্লাহর ফয়সালা খুঁজে বের করাকে ইজতিহাদ বলে। এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাদের জানান :

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

"যদি তারা তা রাসূল কিংবা তাদের দায়িত্বশীলদের কাছে ন্যস্ত কর, তা হলে যারা জ্ঞাণ অন্বেষণ করে তারা প্রকৃত বিষয়টি জেনে নিতে পারত।"[২০২]

এভাবে নতুন উদ্ভূত বিষয়ে আল্লাহর ফয়সালা খুঁজে বের করার দায়িত্ব কেবল এ কাজের যোগ্য আলেমগণের হাতে ন্যস্ত। ইজতিহাদ করার মাধ্যমে তাঁরা উম্মাহর জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করেন না। বরং ইসলামি আইনের মূলনীতিগুলো মেনেই তাঁরা নতুন সিদ্ধান্তে আসেন।

আমাদের খিলাফাত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর ওপর কোনোকিছুকেই স্থান দিতে পারবে না। হোক তা কথা, কাজ, আদেশ, নিষেধ যে-কোনো বিষয়।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

"তোমরা যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য করো, তার মীমাংসা আল্লাহর ওপর সোপর্দ।"[২০৩]

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটে, তা হলে সেই বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (নির্দেশের) দিকে ফিরিয়ে দাও।"[২০৪]

[২০২] সূরা আন-নিসা ৪:৮৩
[২০৩] সূরা আশ-শুরা ৪২:১০
[২০৪] সূরা আন-নিসা ৪:৫৯

আমাদের খিলাফাত তার শাসিত মানুষ ও ভূমির ওপর পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলাম কায়েম করতে বাধ্য। শান্তি, যুদ্ধ, সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বাকি বিশ্বের সাথে কখন কেমন আচরণ করতে হবে—সেগুলোও ইসলামি বিধানের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

খলিফার কাজ হলো কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর হুকুমগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা। তাঁর আসল দায়িত্ব দ্বীনের সুরক্ষা, এর প্রচার-প্রসার এবং জাগতিক সকল ব্যাপারে এর নিয়মাবলির বাস্তবায়ন। ইমাম আল-মাওয়ারদি বলেন, "ইমামতের দায়িত্ব হলো নবুওয়্যাতের প্রতিনিধিত্ব করা, দ্বীনের প্রতিরক্ষা বিধান, আর মুসলিমদের জীবনের বিষয়াবলির প্রশাসন।"[২০৫]

আপসে সলা-পরামর্শ করা মুসলিম খলিফার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

"যারা তাদের প্রতিপালকের (নির্দেশ পালনের মাধ্যমে তাঁর) প্রতি সাড়া দেয়, নিয়মিত সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের কার্যাদি পরিচালনা করে।"[২০৬]

তার শাসনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হতে হবে ন্যায়বিচার :

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"এবং যখন মানুষের মাঝে বিচার করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে।"[২০৭]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যা নির্দেশ দিয়েছেন, সেটাই ন্যায়বিচার। খলিফার যে-কোনো বিচারের রায় হয় সরাসরি কুরআন-হাদীসের বিধানের বাস্তবায়ন, আর নয়তো ইজতিহাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআন-হাদীসের মূলনীতিসমূহের বাস্তবায়ন। আলেমগণ শর্ত দিয়েছেন যে, খলিফাকে নতুন উদ্ভূত বিষয়াদিতে ইজতিহাদ করতে পারার মতো যথেষ্ট ইলমসম্পন্ন হতে হবে।

খলিফা নিযুক্ত করার তিনটি পদ্ধতি :

১. আল-ইস্তিখলাফ : এক্ষেত্রে খলিফা নিজেই তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে একজনকে নির্ধারণ করে যান। অথবা একদল মানুষের একটি পরিষদ গঠন করে দিয়ে যান, যারা

[২০৫] আল-খুলাসাতু ফি আহকামি আহলিয যিম্মাহ, ১/৪৭২

[২০৬] সূরা আশ-শুরা ৪২:৩৮

[২০৭] সূরা আন-নিসা ৪:৫৮

পরে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে খলিফা নির্বাচন করেন।

২. বাইয়াহ : এর অর্থ আনুগত্যের শপথ। খলিফা হওয়ার শর্ত পূরণ করা কোনো ব্যক্তিকে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ বা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ আনুগত্যের অঙ্গীকার দেন।

৩. আল-ইস্তীলা : এটি ইমারাতুল মুতাগাল্লিব নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে জোর করে নতুন একজন খলিফার আসন গ্রহণ করেন।

এই সবগুলোর বিস্তারিত বিধিবিধান ফিকহ ও সিয়াসাতের কিতাবসমূহে পাওয়া যাবে। আর খলিফা হওয়ার জন্য যেসব শর্ত পূরণ করতে হয়, সে ব্যাপারে আল-মাওয়ারদি সাতটি বিষয়ের উল্লেখ করেন :

১. ন্যায়পরায়ণতার সকল বিস্তারিত শর্তাদি পূরণ করা।

২. নতুন উদ্ভূত বিষয়াদিতে ইজতিহাদ করতে পারার মতো জ্ঞান।

৩. সুস্থ শ্রবণক্ষমতা, দৃষ্টিশক্তি ও বাক্শক্তি।

৪. শারিরীকভাবে বিকলাঙ্গ না হওয়া।

৫. প্রজাদের বিষয়াদি ও অন্যান্য বিষয় পরিচালনা করতে পারার মতো সুস্থ মতামত ও বিচারক্ষমতা।

৬. মুসলিম জনগণ ও মুসলিমদের ভূখণ্ডগুলোর প্রতিরক্ষার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারার মতো সাহস ও তৎপরতা।

৭. কুরাইশ বংশের হওয়া। এ ব্যাপারে হাদীস থেকে দলিল এবং উম্মাহর আলেমগণের ইজমা আছে।

খলিফার প্রতি আনুগত্য ফরয এবং এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করার অংশ। তাঁর সকল নির্দেশ মানা আবশ্যক। তবে যদি তিনি আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোনো হুকুম দিয়ে থাকেন, তা হলে সেই হুকুম মানা যাবে না। তিনি যদি ফিসক বা জুলুম করেন, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। তবে যদি এমন হয় যে এসকল অন্যায় তিনি বারবার করছেন এবং তাঁকে অপসারণ না করার ক্ষতির চেয়ে অপসারণ করার ক্ষতি কম, তা হলে তাঁকে অপসারণ করতে হবে। তবে এই বিষয়টি নিয়ে উম্মাহর আলেমগণের মাঝে ভালো রকমের মতভেদ রয়েছে।

আল্লাহ না করুন, খলিফা যদি কাফির হয়ে যায়, তা হলে প্রয়োজনে সশস্ত্র পদক্ষেপ নিয়ে হলেও তাকে অপসারণ করে একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম খলিফা নিয়োগ করা ফরয। ন্যায্য খলিফা আমৃত্যু ক্ষমতায় থাকতে পারেন, অথবা স্বেচ্ছা পদত্যাগ করতে পারেন,

অথবা (বয়স, রোগ ইত্যাদি কারণে) সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকতে পারেন।

খিলাফাত রাষ্ট্রই হলো ইসলামের সঠিক প্রয়োগ। একমাত্র এরকম রাজনৈতিক কাঠামোতেই ইসলাম পূর্ণরূপে বিকশিত হয় এবং আল্লাহর আইন কার্যকর করা সম্ভব হয়।

দ্বীন ও দুনিয়ার সুরক্ষাকল্পে খিলাফাত প্রতিষ্ঠার হুকুম ইসলামই দিয়েছে। এবং ইসলামই এর উদ্দেশ্য, আদর্শ ও নিয়মাবলি বলে দিয়েছে। কারোই ক্ষমতা নেই এই হুকুমকে পাল্টে দেওয়ার, সে যে-ই হোক না কেন। এই হুকুম লঙ্ঘন করলে জাহিলি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যাকে অপসারণ করা আবশ্যক। মুসলিমরা আজকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন, ইসলামি খিলাফাতই হলো সেগুলোর সমাধান। যে অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণে আমরা আজ নাস্তিক্যবাদী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গোলাম হয়ে আছি, সেটার চিকিৎসা খিলাফাত। কথিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে পশ্চাৎপদতার সমাধান খিলাফাত। আমাদের ভূমি ও তীর্থস্থানগুলোর সুরক্ষা দিতে পারার মতো সামরিক অক্ষমতা-দুর্বলতার সমাধানও খিলাফাত। এটিই সমাধা করবে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া জুলুম-অবিচারের। মুসলিমদের নৈতিক পদস্খলন, হীনম্মন্যতা ও পরাজিত মানসিকতারও এটিই সমাধান।

ইসলামি খিলাফাত এভাবেই আমাদের জন্য সর্বরোগের ঔষধের মতো কাজ করবে। ইতিহাসের দিকে তাকালেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। খিলাফাতের দুর্বল অবস্থার সময়গুলোতেই কেবল মুসলিমরা এসব সমস্যায় পড়েছে। আর যখন স্বয়ং খিলাফাতেরই পতন ঘটল, তখন এসব সমস্যা পর্বতসম হয়ে দেখা দিল। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে আল্লাহ রহম করুন। তিনি বলেছেন, "ফিতনা শুরু হয়, যখন মুসলিমদের বিষয়াদি সামলানোর জন্য কোনো ইমাম (খলিফা) থাকে না।"

আজকের দিনে মানবতা যেসব সমস্যার সম্মুখীন, সেগুলোর সমাধান রয়েছে খিলাফাতব্যবস্থার মধ্যেই। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ মানুষ নিজ স্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য বাকি সবাইকে দাস বানিয়ে রেখেছে। কথিত 'উন্নত' ও 'সভ্য' রাষ্ট্রগুলোর বানানো মতাদর্শ আর সরকারব্যবস্থার কল্যাণে ধনী হয়েছে আরো ধনী, গরিব হয়েছে আরো গরিব।

এমনকি সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রগুলোতেও এইসব শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা। তারা এমন কোনো আদর্শবাদী, বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি, যা গুটিকয়েক মানুষের স্বার্থের বদলে বিশ্বমানবতার কল্যাণের কথা ভাবে। এদিকে আজকের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো গরিবদেরকে চুষে নিজেরা ধনী হয়, আর ওদিকে

অতীতের খিলাফাত প্রায় অর্ধ-পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত থেকেও কারো প্রতি এমন জুলুম করেনি।

বিশ্বজগতের নিয়ম-কানুন স্বাভাবিক গতি লাভ করে ইসলামের শাসনাধীনে থাকতে পারলে। এ ছাড়া অন্য যে-কোনো আকীদা-মতবাদের কবলে পড়লে তা ব্যাহত হয়। মানবরচিত বিধিবিধান কখনো আল্লাহর সৃষ্টিজগতে সাফল্য পায় না। বরং আল্লাহর বিধান দিয়ে আল্লাহর সৃষ্টিজগতকে শাসন করলেই সবকিছু ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। অতএব, খিলাফাতই হলো একমাত্র রাজনৈতিকব্যবস্থা যা সারা পৃথিবীর সকল সমাজের উন্নতি, ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। আজ থেকে প্রায় এক শতক আগে যেই খিলাফাতের পতন হয়েছে, তা পুনরুদ্ধার করা আমাদের লক্ষ্য। মানুষকে এক আল্লাহর উপাসনার দিকে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করলেই আল্লাহর হুকুম "দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো" এর বাস্তবায়ন হয়।

আমরা যখন বলি যে খিলাফাত অবশ্যই ফিরে আসবে এবং পৃথিবী শাসন করবে, তখন অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না। তারা বলে এটা নাকি অবাস্তব কথাবার্তা, অলীক স্বপ্ন। কিন্তু এসকল নৈরাশ্যবাদীরা আমাদের হতাশ করতে পারে না। কারণ রাসূল ﷺ ওয়াদা করেছেন, "আল্লাহ আমার জন্য পৃথিবীর শেষ সীমানাগুলো কাছে এনে দেখিয়েছেন এবং আমি পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত দেখেছি। যে সীমানাগুলো আমাকে কাছে এনে দেখানো হয়েছে, সেই সীমাগুলো পর্যন্ত আমার উম্মাতের শাসন বিস্তার লাভ করবে।"[২০৮]

নবীজি ﷺ আরো বলেছেন, "নবুওয়্যাত তোমাদের মাঝে থাকবে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। তারপর তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, তখন তা তুলে নেবেন। তারপর আসবে নবুওয়্যাতের আদলে খিলাফাত। আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করবেন, ততদিন তা থাকবে। তারপর যখন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, তখন তা তুলে নেবেন। তারপর আসবে জালিম শাসকেরা। আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করবেন, ততদিন তা থাকবে। তারপর যখন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, তখন তা তুলে নেবেন। তারপর আসবে জোর করে চেপে বসা শাসকেরা। আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করবেন, ততদিন তা থাকবে। তারপর আল্লাহ যখন ইচ্ছা করবেন, তখন তা তুলে নেবেন। তারপর আবার ফিরে আসবে নবুওয়্যাতের আদলে খিলাফাত।"[২০৯]

---

[২০৮] মুসলিম : ৭৪৪০

[২০৯] আহমাদ : ১৮৪৩০

আমাদের পথ

১. দাওয়াত ও তাবলীগ

২. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ (হিসবাহ)

৩. জামাতের অধীনে থেকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এই জামাতের কাজকর্ম পরিচালিত হবে ইসলামি শরীয়ত অনুযায়ী। এটি কাফিরদের মন রক্ষা করার জন্য তাদের সাথে কোনো সমঝোতায় যাবে না এবং অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

'যেভাবে বিশ্বাস করি' অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি যে আমাদের দ্বীনের বুঝ হতে হবে এই উম্মাতের সত্যনিষ্ঠ আলেমগণের বুঝের অনুরূপ। আরো বলা হয়েছে যে, কোনোরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়া পূর্ণ ইসলাম পালনের গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হলো ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে বোঝা। খণ্ডিত বুঝ লাভ করে ইসলামি আন্দোলন শুরু করলে হয় কাটছাঁট করে সীমিত ইসলাম পালন করা হবে, আর নয়তো সীমালঙ্ঘন করে চরমপন্থার বিকাশ ঘটবে। অতএব, বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির বিরুদ্ধে সুরক্ষিত থাকার উপায় হলো ইসলামের পরিপূর্ণ বুঝ হাসিল করা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামি আন্দোলনের পন্থা জানার পর আমরা এমন মানুষদের দেখা পাব, যারা আকীদা, ইসলামের বুঝ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আমাদের সাথে একমত। এ ধরনের লোকদের প্রতি আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাদের সাথে মিলেমিশে জামাতবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। সেই সাথে এমনো অনেক মানুষ খুঁজে পাব যারা অজ্ঞতা বা অবহেলার কারণে ইসলামের ভুল বুঝ অর্জন করেছে। এ ধরনের লোকদের কাছে সঠিক দাওয়াত পৌঁছানোর চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করা যাবে না। এমনো মানুষ পাওয়া যাবে যারা অসৎকাজ করে, সৎকাজ করে না। এক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা। আবার কিছু মানুষ পাওয়া যাবে এমন যারা গোঁয়ারের মতো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবে। এদের সাথে আচরণের পদ্ধতি হলো জিহাদ।

নানান মতের নানান রকম মানুষ থাকলেও তাদের সকলেই কোনো না কোনোভাবে উপর্যুক্ত কোনো একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে। এজন্যই আমরা আমাদের চলার পথের

নকশা এভাবে দেখিয়েছি :

১. দাওয়াত ও তাবলীগ

২. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ (হিসবাহ)

৩. জামাত এর অধীনে থেকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এই জামাতের কাজকর্ম পরিচালিত হবে ইসলামি শরীয়ত অনুযায়ী। এটি কাফিরদের মন রক্ষা করার জন্য তাদের সাথে কোনো সমঝোতায় যাবে না এবং অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

যে-কোনো স্থানে যে-কোনো জায়গায় বাস্তবতার সকল চাহিদা, চ্যালেঞ্জ ও জটিলতাকে যারা ইসলামের দেওয়া ফর্মুলা অনুযায়ী মোকাবিলা করতে চায়, তারা সকলেই এই তিন বিষয়ের ওপর আমল করে : দাওয়াত, হিসবাহ ও জিহাদ। এই প্রতিটি ইবাদতেরই নিজস্ব বিধিবিধান, সীমা-পরিসীমা ও প্রায়োগিক ক্ষেত্র রয়েছে। যথাস্থানে তা আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে ইন-শা-আল্লাহ। আমাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য যে জামাতবদ্ধভাবে কাজ করা দরকার, তার ওপরও আলোকপাত করা হবে। ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী এবং জামাতবদ্ধ হয়ে আন্দোলন পরিচালনা করা কেন জরুরি, সেটিও ইসলাম ও বাস্তবতার আলোকে দেখানো হবে। জামাতবদ্ধভাবে কাজ করার পূর্বশর্ত ও কারণসমূহও আলোচিত হবে। তবে মূল আলোচনায় ঢোকার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা জরুরি।

প্রথমত, ইসলাম একটি ব্যাপকবিস্তৃত জীবনব্যবস্থা। এর কর্মপদ্ধতির মধ্যেও তাই বৈচিত্র্য আছে। পৃথিবীতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি পরিবর্তন আনার জন্য বেশ কয়েকটি মাধ্যম ধাপে ধাপে ব্যবহৃত হয়। প্রথম ধাপ হলো নম্রভাবে দাওয়াত প্রদান। এসময় প্রতিপক্ষের থেকে আসা অপমানকে ভালো আচরণ দিয়ে প্রতিহত করা হয়। আর সর্বশেষ ধাপ হলো তলোয়ার দিয়ে শত্রুপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেওয়া। এই দুই প্রান্তের মাঝামাঝি আরো অনেক ধাপ রয়েছে। তবে এই সকল ধাপই মোটা দাগে দাওয়াত, হিসবাহ ও জিহাদ—এই তিন শিরোনামের অধীনে পড়ে। ইসলাম যে একটি বাস্তবসম্মত দ্বীন, এরই একটি প্রমাণ হলো এর কর্মপদ্ধতির বৈচিত্র্য। বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন, গোষ্ঠী বা সরকার ইসলামের সাথে কীরকম আচরণ করে, তার ভিত্তিতে কাজ করার জন্য ইসলামের বাস্তবসম্মত পদ্ধতি রয়েছে। কাজেই ইসলামের হুকুম-আহকাম মেনেই এই সব রকম পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব।

মানুষের মনে যেসব ভুল ধারণা আছে, সেগুলো দূর করার মাধ্যম হলো দাওয়াত। প্রজ্ঞা সহকারে উপদেশ ও উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করে মানুষকে ইসলামের ব্যাপারে সঠিক বিষয়গুলো জানাতে হবে। ফলে তারা অবিশ্বাস, অজ্ঞতা, ভ্রান্তি ও পাপের আঁধার ছেড়ে ঈমান, ইলম, সুন্নাহ ও নেকির আলোর দিকে আসতে পারবে।

যাদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়, তাদের সাদরে স্বাগত জানানো হয়। আর যারা প্রত্যাখ্যান করে, তাদের প্রত্যাখ্যানের মাত্রা বিভিন্নরকম হয়ে থাকে। কেউ ব্যক্তিজীবনে ইসলামের আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে। এখান থেকে হিসবাহ'র বিভিন্ন ধাপ শুরু হয়। হিসবাহ হলো সেই হাতিয়ার, যার মাধ্যমে পাপীকে পুণ্যের পথে ফিরিয়ে আনা হয়। আর যদি ফিরিয়ে আনা সম্ভব না-ও হয়, অন্তত তার অনিষ্ট থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করা হয়।

আবার এমনো মানুষ আছে যারা নিজেরা তো আল্লাহর দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করেই, তার ওপর অন্যদের কাছেও দাওয়াত পৌঁছাতে বাধা দেয়। তারা নিজেদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি খাটিয়ে দাওয়াতকে বাধা দেয়। ফিরআউনের যোগ্য উত্তরাধিকারীর মতো করে নিজেদের বানানো বিধি-বিধান চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ফিরআউন বলেছিল :

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي

"হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য আছে বলে আমি জানি না।"[২১০]

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾

"আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।"[২১১]

এদেরকে শায়েস্তা করার একমাত্র পথ হলো তরবারি। জিহাদ হলো এদের সাথে আচরণের একমাত্র পথ। কারণ এদের ধ্যান-ধারণা-বিশ্বাস পরিবর্তনের জন্য দাওয়াত যথেষ্ট নয়। এদের অনিষ্ট প্রতিরোধ করার জন্য হিসবাহ যথেষ্ট নয়। তাই একটাই পথ খোলা থাকে। তা হলো সশস্ত্র মুজাহিদ বাহিনীকে এদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা তাঁর রাস্তায় এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।"[২১২]

দাওয়াত, হিসবাহ ও জিহাদের ক্ষেত্রগুলো গুলিয়ে ফেললে হবে না। এগুলোর প্রতিটিরই আলাদা আলাদা কাজ, বিধান ও পরিস্থিতি রয়েছে। দুঃখের ব্যাপার হলো, ইসলামের জন্য কাজ করা অনেক ব্যক্তি এবং দলই এগুলোর পার্থক্য বোঝে না। তাই যেখানে

[২১০] সূরা আল-কাসাস ২৮:৩৮
[২১১] সূরা আন-নাযিআত ৭৯:২৪
[২১২] সূরা আস-সফ ৬১:৪

কোমলতা দরকার, সেখানে তারা কঠোরতা দেখিয়ে বসে। আবার যেখানে কঠোরতা দরকার, সেখানে কোমল হয়ে যায়। কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে কোমল কথা বলতে থাকে, আবার কেউ অজায়গায় নির্বিচারে অস্ত্র চালাতে শুরু করে। এগুলোর কারণ হয় অজ্ঞতা, নয়তো নফসকে খুশি করা। অজ্ঞতা হলে তো বিপদ, আর নফসকে খুশি করার জন্য হলে মহাবিপদ।

দ্বিতীয়ত, ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের নিয়েও আলোচনা দরকার। পৃথিবীতে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। দাওয়াতর জন্য তাদের থাকতে হবে যথেষ্ট জ্ঞান, প্রজ্ঞা, স্পষ্ট যুক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং মানবপ্রকৃতির খেয়াল-খুশি সম্পর্কে ধারণা। হিসবাহ'র জন্য তাদের থাকতে হবে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, ধৈর্য, সহ্যশক্তি, দৃঢ়তা ও সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর সাহস। জিহাদের জন্যও থাকতে হবে প্রয়োজনীয় শক্তি, নিরাপত্তাব্যবস্থা, সাহস, আত্মত্যাগ, প্রশিক্ষণ, প্রস্তুতি ও দক্ষতা।

ইসলামি আন্দোলনের কর্মীরা যদি এই ব্যাপক শিক্ষাক্রমের কিছু কিছু অংশ শিখে বাকি অংশগুলোকে অবহেলা করে, তা হলে তারা কখনোই জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে পারবে না। আমাদের এমন কোনো দা'ওয়াতি সংগঠন হলে চলবে না যারা শুধু দা'ওয়াত ও তাবলীগেই দক্ষ, অথচ কিছু লোককে যে শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া পাপকাজ থেকে ফেরানো যাবে না এবং কিছু সরকার ও গোষ্ঠীকে যে অস্ত্র ছাড়া মোকাবিলা করা যাবে না—তা ভুলে যায় অথবা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে। আবার সবাই মিলে এমন সেনাবাহিনী হয়ে গেলে চলবে না, যারা কথায় কথায় অস্ত্র চালায়, সঠিকভাবে দাওয়াত দিতে জানে না, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করতে জানে না। যেখানে নসিহত প্রয়োজন সেখানে অস্ত্রধারণ, আর যেখানে অস্ত্রধারণ প্রয়োজন সেখানে ওয়াজ-নসিহত কখনো কাম্য নয়। শান্তি বর্ষিত হোক নবীজি ﷺ ওপর যিনি সকল পরিস্থিতিতে সঠিক কাজটি করে গেছেন। আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾

"হে নবী! আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীস্বরূপ এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর পথে আহ্বানকারী ও আলোকপ্রদ প্রদীপরূপে।"[২১৩]

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ

[২১৩] সূরা আল-আহযাব ৩৩:৪৫-৪৬

"সে তাদের সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজ করতে নিষেধ করে।"[২১৪]

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ

"অতএব, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো।"[২১৫]

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّـهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّـهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ-দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[২১৬]

তৃতীয়ত, বিশ্বে ইসলামি পরিবর্তন আনার মাধ্যম হিসেবে দাওয়াত, হিসবাহ ও জিহাদকে ব্যবহারের অর্থ হলো বাকি যেসব পন্থা ব্যবহারের অনুমতি আল্লাহ দেননি, সেগুলোকে বর্জন করা। ইসলাম-বহির্ভূত এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি আনয়নকারী সকল বিদআতি পদ্ধতিকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তন্ত্রের মাধ্যমে জাহিলিয়াতের আইন-কানুন মেনে তৈরি করা কর্মপদ্ধতিগুলো আমরা প্রত্যাখ্যান করি। বিদায় হাজ্জের ভাষণে নবীজি ﷺ বলেছেন, "জাহিলিয়াতের সকল কিছু আমার পায়ের তলায়।"[২১৭]

আল্লাহর রাসূল ﷺ যেগুলোকে পদদলিত করে গেছেন, সেগুলো তুলে নিয়ে কী করে আমরা হিদায়াতের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি? মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানরা আমাদের সেসব জাহিলি পদ্ধতির শরণাপন্ন হওয়ার লোভ দেখাবে। তারা দেখাতে চাইবে যে, এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করলে আল্লাহ বিজয় দান করবেন আর জমিনে কর্তৃত্ব দেবেন। ইবলিসের ওপর আল্লাহর লা'নত। সে-ই তো আদম আলাইহিস সালাম-এর সামনে তাঁর পাপকে শোভনীয় করে উপস্থাপন করে তাঁকে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা করেছিল।

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ﴿١٢٠﴾

"কিন্তু শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে জানিয়ে দেব চিরস্থায়ী জীবনদায়ী গাছের কথা আর এমন রাজ্যের কথা যা

[২১৪] সূরা আল-আরাফ ৭:১৫৭
[২১৫] সূরা আন-নিসা ৪:৮৪
[২১৬] সূরা আল-আহযাব ৩৩:২১
[২১৭] মুসলিম : ৩০০৯, আবু দাউদ : ১৯০৭, নাসাঈ : ৪০০১, বাইহাকি : ৮৬০৯, দারিমি : ১৮৫০

কোনোদিন ক্ষয় হবে না?"[২১৮]

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ

"হে আদম-সন্তান! শয়তান যেন তোমাদের কিছুতেই ফিতনায় ফেলতে না পারে, যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল।"[২১৯]

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

"আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[২২০]

কাজেই আমাদের দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর দ্বীনই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এর বাইরের সকল পদ্ধতি হলো ভ্রান্তি ও মরীচিকা। অতীতের জাহিলিয়াতও তার নিজস্ব বিকল্পগুলোর প্রস্তাব দিয়ে নবীজিকে সরলপথ থেকে সরানোর চেষ্টা করেছিল। কুরাইশ নেতারা তাঁকে সম্পদ, ক্ষমতা ও রাজত্বের লোভ দেখিয়েছিল। কেউ কেউ তো এক বছর দেব-দেবীর উপাসনা ও আরেক বছর আল্লাহর ইবাদত করা নিয়েও সমঝোতায় আসতে চেয়েছিল।

وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

"আমি তোমার প্রতি যে ওহি করেছি, তা থেকে তোমাকে পদস্খলিত করার জন্য তারা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে তার (অর্থাৎ নাযিলকৃত ওহির) বিপরীতে মিথ্যা রচনা করো, তা হলে তারা তোমাকে অবশ্যই বন্ধু বানিয়ে নিতো। আমি তোমাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না রাখলে তুমি তাদের দিকে কিছু না কিছু ঝুঁকেই পড়তে। তুমি তা করলে আমি তোমাকে এ দুনিয়ায় দ্বিগুণ আর পরকালেও দ্বিগুণ আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতাম। সে অবস্থায় তুমি তোমার জন্য আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী পেতে না।"[২২১]

[২১৮] সূরা ত্বা-হা ২০:১২০
[২১৯] সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৭
[২২০] সূরা আল-বাকারাহ ২:১৬৮
[২২১] সূরা আল-ইসরা ১৭:৭৩-৭৫

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾

"তারা চায় যে, তুমি যদি নমনীয় হও, তা হলে তারাও নমনীয় হবে।"[২২২]

কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলকে জাহিলিয়াতের পথ অনুসরণ করা থেকে রক্ষা করেছেন। ইসলামের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়া কর্মীদের পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে যে জাহিলিয়াতের পথ ও পন্থা ছাড়াই এই দ্বীন বিজয়ী হবে :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"এই দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিলাম।"[২২৩]

ইসলামের বিশ্বাস, বিধানাবলি ও আচার-অনুষ্ঠান স্বয়ংসম্পূর্ণ। এর অনুসারীরা একে বিজয়ী করার জন্য কোন পথে হাঁটবে, সেটি এখানে স্পষ্ট করে বলা আছে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কোন কোন মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে, সেটিও বলে দেওয়া হয়েছে। তাই আমাদের কখনোই উচিত না জাহিলি পদ্ধতি ব্যবহার করে নিজেদের ইসলামের খাদেম দাবি করা। বরং এরকম করার মাধ্যমে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা জাহিলিয়াতের খাদেমেই পরিণত হব।

ইসলামের পথ ও মাধ্যমগুলো ইসলামের হুকুম-আহকাম দিয়েই নিয়ন্ত্রিত। এখানে নতুন নতুন আবিষ্কারের জায়গা নেই। মনগড়া পথে ইসলামের বিজয় আনাটা বরং একটি মায়াজালের মতো, যা কখনো ধরা দেয় না। ইসলামের বিশ্বাস ও কাজের রূপরেখা পাল্টে দিয়ে ইসলামকে বিজয়ী করা অসম্ভব। ইসলাম জাহিলিয়াতের বিশ্বাস ও কাজকর্ম প্রত্যাখ্যান করার পাশাপাশি এর মাধ্যম ও কর্মপদ্ধতিগুলোকেও প্রত্যাখ্যান করে। আচার-আচরণে জাহিলিয়াতের ধারেকাছে যাওয়াকেই ইসলাম নিষেধ করে।

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

"তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, তা হলে আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে। আর আল্লাহ ছাড়া কেউ তোমাদের অভিভাবক হওয়ার নেই; নেই তোমাদের সাহায্যকারী কেউ।"[২২৪]

---

[২২২] সূরা আল-ক্বলাম ৬৮:৯

[২২৩] সূরা আল-মাইদাহ ৫:৩

[২২৪] সূরা হুদ ১১:১১৩

ইসলামের কাজের ধারা এবং পুঁজিবাদ-সমাজবাদ ইত্যাদি জাহিলি মতাদর্শের মধ্যে বিস্তারিত তুলনা দেখানো এই পরিসরে সম্ভব নয়। বরং মানবরচিত মতবাদের সাথে তুলনা হওয়াটা ইসলামের মর্যাদার সাথেও যায় না।

وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾

"অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়। সমান নয় অন্ধকার ও আলো, কিংবা ছায়া ও রোদ।"[২২৫]

১. দাওয়াত

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে দাওয়াত ও তাবলীগের নির্দেশ দিয়ে বলেন :

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾

"ওহে বস্ত্রাবৃত! ওঠো, সতর্ক করো।"[২২৬]

নবীজি এই নির্দেশ মেনে মানুষকে গোপনে আল্লাহর দিকে ডাকতে শুরু করেন। তিন বছর এভাবেই কাটে। তারপর আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন :

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

"কাজেই তোমাকে যে বিষয়ের আদেশ করা হয়েছে, তা জোরেশোরে প্রচার করো। আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।"[২২৭]

এরপরই নবীজি আস-সাফা পাহাড়ে উঠে দাঁড়ান এবং কুরাইশের গোত্রগুলোকে জড়ো করে বলেন, "আমি তোমাদের এক ভয়াবহ শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি।"[২২৮]

সেই থেকে নিয়ে আমৃত্যু নবীজির কাজ ও পেশা হয়ে যায় দাওয়াত। মক্কার ছেলে-বুড়ো, মুক্ত ও দাস, সকলকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করতে থাকেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। হাজ্জ ও ব্যবসায়িক কাজে মক্কায় আসা বিদেশীদের প্রতিও তাঁর দাওয়াত কার্যক্রম প্রসারিত হয়। সাকিফ গোত্রকে দাওয়াত প্রদানের জন্য তিনি তাইফে যান। আল-আকাবার বাইয়াতের পর তিনি মুসআব বিন উমাইরকে মদীনায় পাঠিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের কাছে দাওয়াত পৌঁছান। পরে তিনি নিজেই মদীনায় হিজরত করে সেখানে

[২২৫] সূরা ফাতির ৩৫:১৯-২১
[২২৬] সূরা আল-মুদ্দাসসির ৭৪:১-২
[২২৭] সূরা আল-হিজর ১৫:৯৪
[২২৮] বুখারি : ৪৭৭০, মুসলিম : ৫২৯

মসজিদ স্থাপন করেন। নবগঠিত জনগোষ্ঠীর কাছে ইসলামের প্রচার করতে থাকেন "সাক্ষীস্বরূপ এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর পথে আহ্বানকারী ও আলোকপ্রদ প্রদীপরূপে।"[২২৯]

আনসার সাহাবিগণের বিভিন্ন দল শিক্ষক ও প্রচারক হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরিত হতে থাকেন। পুরো আরব উপদ্বীপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে নবীজি ﷺ-এর প্রতিনিধিদের নেটওয়ার্ক। মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ইয়েমেনের আহলে কিতাবদেরকে ইসলামের দিকে ডাকতে পাঠানো হয়। উরওয়াহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর নিজের গোত্র সাকিফের কাছে পাঠানো হয়। আলা' বিন হাদরামি রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে পাঠানো হয় বাহরাইনে। এমনকি নবীজি ﷺ নিজেও মক্কা বিজয়ের পর কা'বার ফটকে দাঁড়িয়ে মক্কাবাসীদের ইসলামের দিকে ডাকেন। তিনি মদীনায় ফেরার পর আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধিদল ছুটে আসতে থাকে তাঁর কাছে ইসলাম শেখার জন্য। সেই বছরটিকে বলা হয় 'আমুল উফুদ'—প্রতিনিধিদলের বছর। তারা সেখানে দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করে নিজ নিজ জাতির কাছে ফিরে গিয়ে দাওয়াতি কার্যক্রম চালাতে থাকে।

পুরো আরব ভূখণ্ড ইসলামের পতাকাতলে চলে আসার পর নবীজি ﷺ তাঁর প্রতিনিধিদের আরব উপদ্বীপের আশপাশের রাজা-বাদশাহদের কাছে ইসলামের বার্তাসহ প্রেরণ করতে থাকেন।

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমানদের সম্রাট হেরাক্লিয়াসের প্রতি। শান্তি বর্ষিত হোক তাদের ওপর যারা সঠিক পথের অনুসরণ করে। পর সমাচার এই যে, আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, তা হলে আপনি নিরাপদ হয়ে যাবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, তা হলে আল্লাহ আপনাকে দেবেন দ্বিগুণ পুরস্কার। আর আপনি যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তা হলে আপনার প্রজাদের পাপের ভারও আপনাকে বইতে হবে।"[২৩০]

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

"বলুন, হে আহলে কিতাব! এমন এক কথার দিকে এসো যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একই। তা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা

[২২৯] সূরা আল-আহযাব ৩৩:৪৫-৪৬

[২৩০] বুখারি : ৪৫৫৩, মুসলিম : ৪৭০৭

করব না এবং কোনোকিছুকে তাঁর শরিক করব না এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের মধ্যে কাউকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করব না। তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম।""[২৩১]

বিদায় হাজ্জের সময় হাজার হাজার মুসলিম নবীজি ﷺ-এর এই আহ্বান শুনেছে :

"নিশ্চয় জাহিলিয়াতের সাথে সম্পর্কিত সবকিছু আমার পায়ের তলায়... আমি তোমাদের কাছে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব।"[২৩২]

জীবনের অন্তিম সময়ে নবীজি মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থায় মাসজিদে প্রবেশ করে মিম্বরে বসে বলেন, "...আল্লাহর কসম! আমার এই দুশ্চিন্তা নেই যে আমার মৃত্যুর পর তোমরা শিরকে ফিরে যাবে। আমি ভয় করি তোমাদের দুনিয়াপ্রীতি ও এ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে।"[২৩৩]

এগারো হিজরি সনের বারোই রবিউল আউয়াল সাহাবিগণ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইমামতিতে সালাত পড়ছিলেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কামরার দরজার পর্দা তুলে রাসূল ﷺ শেষবারের মতো চোখ জুড়িয়ে নিলেন তাঁর দাওয়াতের ফলাফল দেখে। তারপর মৃত্যুশয্যায় ফিরে গিয়ে চলে গেলেন মহান মনিবের সান্নিধ্যে।

নবীজি ﷺ-এর জীবন শেষ হয়েছে উম্মাহর কাছে সঠিকভাবে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার পর। আমাদের পূর্বাপর কোটি কোটি মানুষের সাথে সাথে আমরাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। এখন যে দায়িত্ব আমাদের কাঁধে রয়েছে, তা হলো মুসলিম উম্মাহর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর হয়ে আমাদের হাতে আসা এই আমানতের যথাযথ সুরক্ষা। নবীজি যেভাবে জীবনযাপন করেছেন ও মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছেছেন, আমরাও ঠিক সে রকমটাই করতে বাধ্য। আমাদের আসা-যাওয়া, সকাল-সাঁঝ, কথা-কাজ যেন দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্যই হয়। নবীজি ﷺ-এর মতো করেই যেন আমরা মানুষের তিরস্কার-নির্যাতন-শত্রুতা উপেক্ষা করে আল্লাহর পথে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালিয়ে যাই।

---

[২৩১] সূরা আলে ইমরান ৩:৬৪
[২৩২] মুসলিম : ৩০০৯, আবু দাউদ : ১৯০৭, নাসাঈ : ৪০০১, বাইহাকি : ৮৬০৯, দারিমি : ১৮৫০
[২৩৩] বুখারি : ৪০৪২, মুসলিম : ৬১১৭

দাওয়াতি কাজের তৎপরতা হলো এক মহা সম্মানের কাজ :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

"তার কথার চেয়ে কার কথা উত্তম যে (মানুষকে) আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎকাজ করে এবং বলে, 'আমি মুসলিমদের একজন'?"[২৩৪]

এমনটা করার মাধ্যমে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদাঙ্কই অনুসরণ করছি, যিনি বলেছেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সতেজ রাখুন যে আমার কোনো কথা শুনে তা অন্তরে সংরক্ষণ করে এবং বিশ্বস্ততার সাথে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়।"[২৩৫]

"আল্লাহর কসম! আল্লাহ যদি একজনকেও তোমার মাধ্যমে (ইসলামের দিকে) পথ দেখান, তা হলে তা তোমার জন্য দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সুখ ভোগ করার চেয়েও উত্তম।"[২৩৬]

উমর ইবনুল খাত্তাবের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন, যিনি বলেছেন, "সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রাসূল আগমনের ধারা শেষ হওয়ার পর জ্ঞানবানদের (আহলুল ইলম) একটি অংশকে রেখে দেওয়ার মাধ্যমে মানুষকে রহম করেছেন। তাঁরা পথভ্রষ্টদেরকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করেন, তাদের দেওয়া কষ্টগুলো সহ্য করে নেন, (অন্তর) অন্ধ হয়ে যাওয়া লোকগুলোকে আল্লাহর কিতাব দেখান। ইবলিসের কত শিকারকে যে তাঁরা উদ্ধার করেছেন আর কত পথভ্রষ্টকে যে তাঁরা পথ দেখিয়েছেন! তাঁরা নিজেদের জানমাল কুরবানি করে (আল্লাহর) বান্দাদের ধ্বংস হওয়া রোধ করেছেন। অতএব, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ভুলো না। কারণ তাঁরা অতি উচ্চ মর্যাদার আসনে আছেন।"[২৩৭]

দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্বে অবহেলা করার অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবমাননা করা, তাঁদের গড়ে তোলা দাঈগণকে অবমাননা করা। এসকল আহ্বানকারী এই দায়িত্ব পালনে নিজেদের রক্ত আর সম্পদ বিলিয়ে দিলেন। উম্মাতের অতীত-বর্তমানের আলেমগণ স্পষ্ট করে বলে গেলেন যে দাওয়াতের দায়িত্ব ফরযে কিফায়া। কথা বলা, প্রচার করা, সুসংবাদ শোনানো ও সতর্ক করা এবং দলিলের মাধ্যমে সংশয়-নিরসন করার সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা এই দায়িত্ব পালন করলে সকলে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর কেউই এ দায়িত্ব পালন না করলে সামর্থ্যবান সকলে গুনাহগার হবে। অতীতের যে-কোনো সময়ের তুলনায় দাওয়াতের গুরুত্ব এখন আরো বেশি। আল্লাহর দ্বীন থেকে মানুষকে বিমুখ করতে যত ভ্রান্ত মত-পথের উদ্ভব হচ্ছে, দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব ততই বেড়ে চলেছে।

[২৩৪] সূরা ফুসসিলাত ৪১:৩৩

[২৩৫] আহমাদ : ১৬৭৫৪, হাকিম : ২৯৪

[২৩৬] বুখারি : ৩০০৯, মুসলিম : ৬৩৭৬

[২৩৭] তাফসির ইবনুল কাইয়্যিম, ২/১২০

আমাদের চারপাশে জাহিলিয়াত সফলভাবে তাদের মূলনীতি, তত্ত্ব, আদর্শ, নিয়মকানুন, স্লোগান আর সংস্কৃতি তৈরি করে নিয়েছে। পৃথিবীতে ব্যবহারিকভাবে এগুলো প্রয়োগ করতেও তারা সফল হয়েছে। ইসলামি ভূখণ্ডগুলোতেও নিজেদের লাইফস্টাইল আর মূল্যবোধ প্রচার করে সেগুলোকে তারা তাদের বলয়ে আবর্তিত হতে বাধ্য করেছে। এই দেশগুলোও হয়ে গেছে তাদের বুলি আওড়ানো তোতাপাখি। বাসা-বাড়ি, বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট, কর্মস্থল, সংসদ, কোর্ট-কাছারি, পত্রিকা-গণমাধ্যম যে দিকেই তাকান, তাদের জাহিলি ডাক আপনাকে অনুসরণ করে চলেছে। মানুষকে ফিতরাত (স্বভাবধর্ম) থেকে সরিয়ে দিয়ে এটি সফলভাবে তাদের নিয়ে গেছে কুফর, নিফাক, ইলহাদ ও ফিসকের দিকে। আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত অল্পকিছু মানুষ কেবল এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে বেঁচে থাকতে পেরেছে। তাই সময় এসেছে যে ইসলামি দাওয়াতের মাধ্যমে এই জাহিলিয়াতের সাথে সম্মুখ-সমরে লিপ্ত হওয়ার। মানুষকে নতুন করে ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার, যা হলো "সু-প্রতিষ্ঠিত দ্বীন, একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"[২৩৮]

দাঈ-র দায়িত্ব হলো এ সকল মিথ্যে আহ্বানের অসারতা তুলে ধরা, মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া যে জাহিলিয়াতের এসব আহ্বান হলো, বানের জলে ভেসে আসা ক্ষণস্থায়ী আবর্জনা। সময়ের আবর্তনে এগুলো ধুয়েমুছে যাবে। রয়ে যাবে শুধু সত্য :

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

"ফেনা তো খড়কুটোর মতো উড়ে যায়। আর যা মানুষের জন্য উপকারী, তা জমিনে স্থিতিশীল হয়।"[২৩৯]

দাঈ-র দায়িত্ব মানুষকে এই দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ রূপ চিনিয়ে দেওয়া। একবারে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য থেকে শুরু করে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা পর্যন্ত।

অজ্ঞদের শেখানো, অবহেলাকারীদের সতর্ক করা, ঘুমন্তকে জাগানো, অহংকারীকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের উপদেশ দান, অবিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাসের দিকে ধাবিত করা, বহুত্ববাদীদের একত্ববাদের দিকে আনা, বিদআতিকে সুন্নাহর কাছে আনা ও অবাধ্যকে বাধ্য করা—সবই এই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের সামনে প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে "যাতে তোমার প্রতিপালকের সামনে (দায়িত্ব পালন না করার) অভিযোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং যাতে তারা আল্লাহকে ভয় করে।"[২৪০]

[২৩৮] সূরা আল-আনআম ৬:১৬২

[২৩৯] সূরা আর-রা'দ ১৩:১৭

[২৪০] সূরা আল-আরাফ ৭:১৬৪

বাতিলের বন্যার সামনে রুখে দাঁড়ানো হকের দায়িত্ব। কারা নেবে এই দায়িত্ব? এক বিলিয়ন খ্রিস্টান ও ইহুদীদেরকে কারা ডাকবে এক আল্লাহকে বিশ্বাস করার দিকে? কারা যাবে দুই বিলিয়ন মুশরিক ও নাস্তিকের কাছে এক আল্লাহর উপাসনার দাওয়াত নিয়ে? এক বিলিয়ন গাফেল মুসলিমকে কারা ফিরিয়ে আনবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দিকে? ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকা যুবসমাজকে দুনিয়ায় সংযম ও আখিরাতের ভোগ-বিলাসের পথ দেখাবে কারা? কারা হাত বাড়িয়ে দেবে সেসব বৃদ্ধদের দিকে, যারা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসেও তাওবা করছে না? বন্দির কব্জিতে বাঁধা শেকলের মতো আমাদের ওপর চেপে বসা বাতিলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে কারা প্রস্তুত আছে?

নিঃসন্দেহে এগুলো আমাদেরই দায়িত্ব। ছন্নছাড়া ও বিক্ষিপ্ত কিছু প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই দায়িত্ব সম্পূর্ণ আদায় করা সম্ভব নয়। এই দায়িত্ব যদি কেউই আদায় না করে, কুরআনের একটা আয়াতও যদি পৌঁছে না দেয়, তা হলে সবাই গুনাহগার হবে, সবাই!

বাতিল তো তার আদর্শের বিজ্ঞাপন প্রচার করতে সংকোচ বোধ করেনি, ইতস্তত করেনি, লজ্জা পায়নি। বরং এতই অহংকারের সাথে এরা নিজেদের প্রচার-প্রোপাগান্ডা করেছে যে, ইসলাম ও মুসলিমদের দিকেও তারা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সাহস পেয়েছে। তারা চায় আমরা যেন আমাদের দ্বীন নিয়ে লজ্জিত হই, অস্বস্তি বোধ করি। এরা চায় আমরা যেন আমাদের দাওয়াতকে সলজ্জ ভঙ্গিতে লুকিয়ে রাখি, আমাদের ভালো-মন্দের মানদণ্ড বদলে ফেলি।

কিন্তু আমরা কখনোই এসব কথার মারপ্যাঁচে দিশেহারা হয়ে তাদের সাথে স্থান বিনিময় করব না। নিজেদের মর্যাদার আসনকে তাদের হাতে সঁপে দিয়ে নিজেরা গিয়ে অসম্মানের আসনে বসব না। আমরাই সত্যের ওপর আছি। আমাদের কণ্ঠ তাদের কণ্ঠের ওপর উঁচু থাকবে। আমরাই দাঁড়াব মাথা উঁচু করে। আমাদের যারা চেনে ও যারা চেনে না, সবাই আমাদের দেখবে। আমাদের বলতে শুনবে, "এই যে আমরা, দাওয়াতের কর্মীরা! এই আমাদের দ্বীন যা আমরা সমগ্র মানবজাতির কাছে পেশ করছি।" ইসলামের গৌরব-সম্মান প্রচারিত হবে দাঈর নম্রতার মাধ্যমে। ইসলামি আদর্শ ও জীবনব্যবস্থা যে-কোনো মিথ্যে আদর্শের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইসলাম মানুষের প্রতি দয়ালু; এমনকি যারা গুনাহগার, তাদের প্রতিও। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমরা এখানে একে অপরকে তাদের সমস্যা মোকাবিলা করতে উৎসাহ দিই।

ইসলামের দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে ইসলামের আহ্বানকারীর নম্রতার কোনো বিরোধ নেই। ইসলামের গৌরব-প্রতিপত্তি আমাদের মনে হীনম্মন্যতা ও পরাজিত মানসিকতা তৈরি হতে বাধা দেয়।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

"তোমরা হীনবল হোয়ো না, দুঃখিত হোয়ো না। তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।"[২৪১]

ইসলামের শক্তিমত্তা আমাদের উৎসাহ যোগায় কোনো রাখঢাক না রেখে নির্ভয়ে খোলাখুলি পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দাওয়াত দিতে। বাতিল কখনো আমাদের গলা টিপে ধরতে পারে না। আমরা বাতিলের সাথে ইসলামকে মিশ্রিত করে খিচুড়ি পাকাই না। আমরা তাদের মতো হতে চাই যারা "আল্লাহর বাণী প্রচার করত আর তাঁকে ভয় করত। আল্লাহ ছাড়া কাউকে তারা ভয় করত না।"[২৪২]

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ইসলামের এই শক্তিমত্তার ছাপ আজ অনেক দাঈর ভেতরেই দেখা যায় না। মিথ্যের কাছে পরাজয় মেনে নিয়ে এখন তারা তাদের কাছে থাকা সত্যের ব্যাপারে লজ্জিত। তারা সত্যকে নরম করতে করতে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, এখন তারা মিথ্যের কাছে সন্তুষ্টি ভিক্ষা করে। যেন বলছে, "হে মনিব! দয়া করে আপনার সাথে আমাকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে দিন। আমার মধ্যে এমনকিছু নেই যা আপনাকে দুশ্চিন্তায় ফেলবে। আমি আপনার মতোই। মানুষকে কল্যাণ, জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের দিকে ডাকি।"

কী দুর্ভাগ্য আমাদের! দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা একে বাতিল শক্তির 'প্রগতিশীলতা' ও খেয়াল-খুশির সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে! বড় দুঃখ হয় যখন দেখা যায় সত্যকে টুকরো টুকরো করে তারা একে নতুন করে গড়ে তুলতে চাচ্ছে, যাতে শিরক-কুফর-ফিসকের আহ্বানকারীরা খুশি হয়।

আরো দুঃখের ব্যাপার হলো, অনেকে ইসলামকে শাসকদের স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। ইসলামকে শাসকের প্রাসাদের চাকর বানিয়ে সমাজতন্ত্র বা পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগাচ্ছে। নিজেদের এবং অন্যদের নফসকে সন্তুষ্ট করতে আজ সত্যের আহ্বানকারীরা জেনেশুনে সত্য গোপন করছে।

আমরা এই আহ্বানকারীদের জেগে ওঠার আহ্বান জানাই। তাদের এই বাস্তবতা স্বীকার করতে হবে যে, উম্মাহর দুর্দশার জন্য দায়ী আজকের এসকল সমাজ ও শাসনব্যবস্থা হলো যুগ যুগ ধরে আমাদের মাঝে প্রচারিত হওয়া বাতিল আদর্শেরই ফলাফল। এই বাতিলের সাথে সমঝোতায় পৌঁছানো আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য হলো সত্য দিয়ে আঘাত করে বাতিলের মস্তক চূর্ণ করা :

---

[২৪১] সূরা আলে ইমরান ৩:১৩৯
[২৪২] সূরা আল-আহযাব ৩৩:৩৯

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

"ফেনা তো খড়কুটোর মতো উড়ে যায়। আর যা মানুষের জন্য উপকারী, তা জমিনে স্থিতিশীল হয়।"[২৪৩]

আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত স্পষ্টভাবে, পূর্ণাঙ্গরূপে ও দৃঢ়তার সাথে পৌঁছে দেওয়া। এভাবে দাওয়াত দিলেই মানুষ ভ্রান্ত মতাদর্শগুলোর সাথে ইসলামের তুলনাটা সঠিকভাবে করতে পারবে। আলো-আঁধার, চক্ষুষ্মান-অন্ধ, জীবিত-মৃতের পার্থক্য ধরতে পারবে। তাদের জোরসে ঝাঁকুনি দিয়ে সম্বিৎ ফিরিয়ে এনে বলতে হবে :

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم

"তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও।"[২৪৪]

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ

"দৌড়াও আল্লাহর দিকে।"[২৪৫]

আমাদের দায়িত্ব মানুষকে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে সরিয়ে এনে আল্লাহর দাসত্বে লিপ্ত করা। সত্য দ্বীন আর মিথ্যের মাঝে বন্ধুত্ব স্থাপন করা আমাদের লক্ষ্য নয়। এমনটা করলে তা হবে আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি মহাবিশ্বাসঘাতকতা। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ও সমাজ ইসলামের ব্যাপারে অবহেলাকারী এবং বাতিল মতাদর্শ দিয়ে প্রভাবিত—এটা বাতিলের সাথে সমঝোতা করার কোনো অজুহাত হতে পারে না। বরং এই পরিস্থিতি আমাদের আরো স্পষ্টভাবে খোলাখুলি দাওয়াত প্রচার করার উৎসাহ যোগায় :

فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

"যার ইচ্ছে ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছে প্রত্যাখ্যান করুক।"[২৪৬]

انَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ

"যে ধ্বংস হওয়ার, সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ (দেখা)র পরই ধ্বংস হয়; এবং যে

---

[২৪৩] সূরা আর-র'দ ১৩:১৭

[২৪৪] সূরা আশ-শুরা ৪২:৪৭

[২৪৫] সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫০

[২৪৬] সূরা আল-কাহফ ১৮:২৯

টিকে থাকার, সেও যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ (দেখা)র পরই টিকে থাকে।"[২৪৭]

আমাদের শত্রুরা বহু আগেই বুঝতে পেরেছে যে, ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা অসম্ভব। এজন্যই তারা একে বিকৃত করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে যেন তা তাদের ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয় এবং মুসলিমদেরকে তাদের দলে ভিড়ানো যায়।

তারাও তাদের নিজ নিজ মতাদর্শের দাওয়াত ও তাবলীগে লিপ্ত। মুসলিমদের এই প্রজন্মকে তারা ভুলভাবে ও ভুল উদ্দেশ্যে ইসলামকে জানার দিকে আহ্বান জানায়। তারা এমন এক মুসলিম প্রজন্ম গড়ে তুলতে যায়, যারা বাতিলের প্রতি কোনো হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না। অতএব, এই ঘৃণ্য চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে তাদের সহযোগী হওয়াটা নিশ্চয় অন্যায়। যারা ইসলামের দাওয়াত কাজে নিয়োজিত, তাদের জন্য এটি আরো বড় গুনাহ। সত্যকে যারা মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে, তারাও গুনাহগার:

وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

"আমি তোমার প্রতি যে ওহি নাযিল করেছি তা থেকে তোমাকে পদস্খলিত করার জন্য তারা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি, যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে তার (নাযিলকৃত বিধানের) বিপরীতে মিথ্যা রচনা করো। তা হলে তারা তোমাকে অবশ্যই বন্ধু বানিয়ে নিত। আমি তোমাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না রাখলে তুমি তাদের দিকে কিছু না কিছু ঝুঁকেই পড়তে। তুমি তা করলে আমি তোমাকে এ দুনিয়ায় দ্বিগুণ আর পরকালেও দ্বিগুণ আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতাম। সে অবস্থায় তুমি তোমার জন্য আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী পেতে না। তারা তোমাকে জমিন থেকে উৎখাত করতে চেয়েছিল যাতে তারা তোমাকে তা থেকে বের করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা এখানে তোমার পরে অল্পকালই টিকে থাকত। তোমার পূর্বে আমি আমার যেসব রাসূল পাঠিয়েছিলাম, তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আমার নিয়ম। আর তুমি আমার নিয়মের কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না।"[২৪৮]

---

[২৪৭] সূরা আল-আনফাল ৪:৪২

[২৪৮] সূরা আল-ইসরা ১৭:৭৩-৭৭

এখানে তাই আত্মত্যাগ প্রয়োজন। ইসলামের দিকে আহ্বানকারীরা হয় আল্লাহর কাছে নিজেদের জীবন বিক্রি করবে, আর নয়তো শত্রুদের কাছে দ্বীনকে বিক্রি করবে। এখন যে যার রাস্তা বেছে নিক।

দাওয়াত হলো হিদায়াতের পথে প্রবেশের দরজা। জাহিলিয়াত কখনোই এ দরজা বন্ধ করতে পারবে না। ইসলামের সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় মুহুর্মুহু আক্রমণ করেও জাহিলিয়াত সফল হয়নি। চৌদ্দ শতাব্দীজুড়ে অসংখ্য আক্রমণের পরও দাওয়াত জারি আছে। দ্বীনের প্রতিরক্ষায় নবী-রাসূল ও তাঁদের প্রকৃত অনুসারীরা যেভাবে কুরবানি করেছেন, প্রতিটি দাঈকেই তার জীবন ও সম্পদ কোনো না কোনোভাবে কুরবানি করা লাগবেই লাগবে।

শত্রুদের তৈরি করা সন্দেহ-সংশয় দূর করা ও তাদের কুযুক্তি খণ্ডন করার জন্য দাওয়াত হলো একমাত্র হাতিয়ার। তাদের কোমলমতি সন্তান-সন্ততিকেও তারা যেসব ভ্রান্ত শিক্ষা দিয়ে বড় করছে, সেগুলো থেকেও তাদের উদ্ধার করার পথ এই দাওয়াত। এভাবেই তাদের নিয়ে আসতে হবে অন্ধকার থেকে আলোতে। বানাতে হবে উমর ইবনুল খাত্তাব, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ, আমর ইবনিল আস ও ইকরিমা বিন আবু জাহল রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর উত্তরসূরি। এঁরা সকলেই এমন সাহাবা, যাদের বাপ কিংবা দাদা ছিল অমুসলিম।

দাওয়াত-সংক্রান্ত আলোচনা শেষে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, দ্বীনের দাঈ ও মুবাল্লিগগণ নবীজি ﷺ-এর পদাঙ্কই অনুসরণ করছে। নবীজির জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছর কেটেছে এই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে, মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার কাজে। নবুওয়্যাত প্রদানের আগে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে সর্বোত্তম উপায়ে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছেন। আমাদেরও দাওয়াতের এই দায়িত্ব কাঁধে নিতে হলে নবীজি ﷺ-এর মতো সুন্দর চরিত্র অর্জন করতে হবে। হাদীস ও সীরাতের কিতাবাদিতে নবীজি ﷺ-এর চরিত্র-আচার-ব্যবহারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এসেছে। কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤

"নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।"[২৪৯]

তেইশ বছরের নবুওয়্যাতি মিশন চলাকালে রাসূল ﷺ কার সাথে কীভাবে আচরণ করেছেন, তা আমাদের জানা থাকতে হবে। কিছু মুসলিম দাওয়াতের কাজে জড়িয়ে পড়ে, অথচ এর পূর্বশর্ত হিসেবে যথাযথ জ্ঞান ও চারিত্রিক মাধুর্য অর্জন করে নেয় না। এর ফলে তাদের দাওয়াতি কাজ ব্যর্থ হয়। মানুষ তাদের ওপর বিরক্ত হয়ে সত্য

[২৪৯] সূরা আল-কলাম ৬৮:৪

দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এরকম দাঈর কথা ও কাজে কোনো মিল পাওয়া যায় না। ছোট থেকে বড় সকল ক্ষেত্রেই নববী আচার-আচরণের অনুসরণ করা দাঈর জন্য আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদেরকে দাওয়াত দিতেন, তাদের প্রতি নম্র-ভদ্র আচরণ করতেন। ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে জীবনেও কারো ওপর প্রতিশোধ নেননি। তাঁর জীবনযাপন ছিল অনাড়ম্বর। ভালো-মন্দের মাঝামাঝি সন্দেহপূর্ণ বিষয়গুলো তিনি এড়িয়ে চলতেন। সত্যকে তুলে ধরার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সাহসী ও আপসহীন। লজ্জাশীলতা, ধৈর্য ও দানশীলতায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দাওয়াতের কাজে তিনি ছিলেন সদা অবিচল। হতাশা কখনো তাঁকে গ্রাস করেনি।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

"তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য একজন রাসূল এসেছে। তোমাদের যা কিছু কষ্ট দেয়, তা তার নিকটও খুবই কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি করুণাসিক্ত, বড়ই দয়ালু।"[২৫০]

২. হিসবাহ (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ

"মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী সব একরকম। তারা অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় আর সৎকাজ করতে নিষেধ করে।"[২৫১]

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"মুমিন পুরুষ আর মুমিন নারী পরস্পরের আওলিয়া (সহায়ক, বন্ধু, সমর্থক)। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে।"[২৫২]

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা হলো মুমিন ও মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য। তিনি

[২৫০] সূরা আত-তাওবা ৯:১২৮
[২৫১] সূরা আত-তাওবা ৯:৬৭
[২৫২] সূরা আত-তাওবা ৯:৭১

স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, মন্দ কাজে নিষেধ করা ও ভালো কাজের আদেশ করা কেবল মুমিনেরই গুণ। এই বৈশিষ্ট্য দিয়েই আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন। এটি আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি বৈশিষ্ট্য, যা কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ

"তিনি তাদের ভালো কাজের আদেশ দেন ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করেন।"[২৫৩]

এটি এই উম্মাহরও একটি গুণ এবং তাদের দ্বীনদারি ও সাফল্যের পূর্বশর্ত।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ

"তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ, যাদেরকে মানবজাতির জন্য উত্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো।"[২৫৪]

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাত হতে হলে এই আয়াতে উল্লেখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে।"

আল-কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যদি তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করো তবেই তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত।"

এ দুটি কাজ যদি আমরা না করি, তা হলে আমরা এই সম্মানের অধিকারী হতে পারব না। সেক্ষেত্রে আমরা হব তিরস্কৃত ও শাস্তিযোগ্য।

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "জেনে রাখতে হবে যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার এই গুণটিকে দীর্ঘদিন যাবত অবহেলা করা হয়েছে। আমাদের কাছে যা অবশিষ্ট রয়েছে তা হলো এই কাজের অল্পকিছু নাম-নিশানা। অথচ এটি সকল কাজের মধ্যমণির মতোই গুরুত্বপূর্ণ।"[২৫৫]

অতএব, যারা আখিরাতে কামিয়াবি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করতে চায়, তাদের এই বিস্মৃত দায়িত্ব পালন করতেই হবে। এ কাজের জন্য নিয়্যতকে পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে এবং এ কাজের বিরোধিতাকারীদের ভয় করা চলবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

[২৫৩] সূরা আল-আরাফ ৭:১৫৭

[২৫৪] সূরা আলে ইমরান ৩:১১০

[২৫৫] শারহুন নববী, ৯/১৮৭

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّـهُ مَن يَنصُرُهُ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন যারা তাঁকে সাহায্য করে।"[২৫৬]

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বহুবিধ কারণ রয়েছে। আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশা এবং তাঁর শাস্তির ভয়, আল্লাহর নির্ধারণ করা সীমা লঙ্ঘিত হতে দেখে রাগান্বিত হওয়া, মুমিনদেরকে আল্লাহর নির্দেশ মানানোর মাধ্যমে তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন, আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি। আল্লাহর মর্যাদা সমুন্নত রাখার তুলনায় দুনিয়াবি সম্পদ ও আরাম-আয়েশ নিতান্ত তুচ্ছ। সালফে সালিহীনের একজন বলেছেন, "আমার ইচ্ছা হয় আমার শরীরের মাংস কেঁচি দিয়ে কেটে যাওয়ার বিনিময়ে যদি সকলেই আল্লাহর অনুগত হয়ে যেত!" এই বাস্তবতাকে যে উপলব্ধি করে, তার জন্য আল্লাহর রাস্তায় যে-কোনো কষ্ট ভোগ করা সহজ হয়ে যাবে। উমর বিন আব্দুল আযীযকে রাহিমাহুল্লাহ তাঁর ছেলে আব্দুল মালিককে বলেন, "আমার ইচ্ছা হয় আল্লাহর রাস্তায় কাজ করতে গিয়ে যদি আমি ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে নির্যাতিত হতাম!"

আলেমগণ হিসবাহ এর সংজ্ঞায় বলেছেন, "এটি হলো স্পষ্টভাবে পরিত্যক্ত ভালো কাজের আদেশ করা এবং প্রকাশ্যে চর্চিত মন্দ কাজের নিষেধ করা।" ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা থেকে প্রমাণিত যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ একটি (ইসলামি) বাধ্যবাধকতা।"[২৫৭]

হিসবাহ করার নির্দেশ কুরআনে অনেক সময় খুব স্পষ্টভাবে এসেছে। যেমন :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করে।"[২৫৮]

নবীজি ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো অসৎকর্ম (সংঘটিত হতে) দেখে, সে যেন অবশ্যই তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। যদি তা না পারে, তা হলে মুখ দিয়ে। যদি (তাও) না পারে, তা হলে অন্তর দিয়ে। এটিই ঈমানের দুর্বলতম স্তর।"[২৫৯]

আবার কিছু জায়গায় হিসবাহ-কে মুমিনদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে:

---

[২৫৬] সূরা আল-হাজ্জ ২২:৪০
[২৫৭] শারহুল নববী, ১১/২৬
[২৫৮] সূরা আলে ঃইমরান ৩:১০৪
[২৫৯] মুসলিম : ১৮৬

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"মুমিন পুরুষ আর মুমিন নারী পরস্পরের আওলিয়া (সহায়ক, বন্ধু, সমর্থক)। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয়, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতিই তো আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তো প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাবান।"[২৬০]

আবার কিছু জায়গায় এ কাজে অবহেলাকারীদের প্রতি তিরস্কার ও শাস্তির হুমকি এসেছে :

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

"বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল, তাদেরকে দাঊদ ও ঈসা ইবনু মারইয়ামের মুখে (উচ্চারিত কথার দ্বারা) অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। এটা এই কারণে যে তারা অমান্য করেছিল আর তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী। তারা যেসব অসৎকর্ম করত, তা থেকে একে অন্যকে নিষেধ করত না। তারা যা করত, তা কতই-না নিকৃষ্ট!"[২৬১]

নবীজি ﷺ আরো বলেন, "কোনো জাতির মাঝে যদি (আল্লাহর) অবাধ্যতা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে আর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বের কেউ এ অবস্থার পরিবর্তন না করে, তা হলে আল্লাহ তাদের প্রতি ধ্বংসাত্মক আযাব পাঠাবেন।"[২৬২]

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করো। না হলে আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন যালিম শাসক চাপিয়ে দেবেন যে তোমাদের মধ্যকার বয়স্কদের সম্মান করবে না এবং ছোটদের প্রতি দয়া দেখাবে না। তোমাদের মধ্যকার দ্বীনদাররা তার ধ্বংসের জন্য দুআ করলে সেই দুআ কবুল করা হবে না। তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি সাহায্য করবেন না। তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করবেন না।"

[২৬০] সূরা আত-তাওবা ৯:৭১

[২৬১] সূরা আল-মাইদাহ ৫:৭৮-৭৯

[২৬২] আবু দাউদ : ৪৩৪০

বিলাল বিন সাঈদ বলেন, "কোনো মন্দকাজ যদি গোপনে করা হয়, তা হলে তা শুধু ওই ব্যক্তিরই ক্ষতি করবে। কিন্তু যদি তা প্রকাশ্যে করা হয় এবং তাতে বাধা না দেওয়া হয়, তা হলে তা সকলের ক্ষতি করবে।"[২৬৩]

ইমাম নববী বলেন, "হিসবাহ হলো সকল কাজের মধ্যমণির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। মন্দকাজ যদি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে দ্বীনদার-পাপী নির্বিশেষে সবার ওপর আল্লাহর আযাব আপতিত হবে। যদি তারা সীমালঙ্ঘনকারীকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়, তা হলে তাঁর আযাব সকলের ওপর আপতিত হবে।"[২৬৪]

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"যারা তার (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা সতর্ক হোক যে তাদের ওপর পরীক্ষা নেমে আসবে কিংবা তাদের ওপর নেমে আসবে ভয়াবহ শাস্তি।"[২৬৫]

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'হে লোকসকল! তোমরা এই আয়াত পাঠ করে থাকো : "হে মুমিনগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের ওপর। যদি তোমরা সত্যপথ-প্রাপ্ত হয়ে থাকো, তা হলে পথভ্রষ্টরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"[২৬৬] অথচ তোমরা এর প্রকৃত তাৎপর্য জানো না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'মানুষ যদি কাউকে অন্যায় করতে দেখেও তাকে সংশোধন না করে, আল্লাহ তাদের প্রায় নিশ্চিতভাবেই তাদের সবাইকে আযাবে নিপতিত করবেন।' আরেক বর্ণনায় আছে, 'তারা যদি খারাপ কাজ হতে দেখে এবং তা নিরোধ করার ব্যবস্থা না নেয়...।'[২৬৭]

নববী বলেন, "নবীজির কথা 'সে তা পরিবর্তন করবে'—এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এটি (হিসবাহ) চর্চা করা ফরজ। এটিই উম্মাতের ইজমা।" তিনি আরো বলেন, "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ হলো ফরজে কিফায়া। কিছু মানুষ তা সম্পাদন করলে সকলে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু কেউই যদি তা সম্পাদন না করে, তা হলে শারঈ ওজর ব্যতীত এই কাজ ত্যাগ করা সকলেই গুনাহগার হবে। আর যদি এমন হয় যে, কোনো একটি কাজ খারাপ হওয়ার ব্যাপারে একজনই জানে এবং ওই একজনই তাতে বাধা দিতে সক্ষম, তা হলে ওই একজনের ওপরই তা ফরজে আইন হয়ে যায়।"[২৬৮]

---

[২৬৩] কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারক, বর্ণনা নং ১৩৫০

[২৬৪] শারহুন নববী, ১১/২৯

[২৬৫] সূরা আন-নূর ২৪:৬৩

[২৬৬] সূরা আল-মাইদাহ ৫:১০৫

[২৬৭] আহমাদ : ২৯, তিরমিযি: ২১৬৮

[২৬৮] শারহুন নববী, ১১/২৭

হিসবাহ-র বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন, "এটি এমনিতে ফরজে কিফায়া। কিন্তু কেউ যদি এই দায়িত্ব পালন না করে, তা হলে তা ফরজে আইন হয়ে যাবে।" তিনি আরো বলেন, "এই দায়িত্ব পালনের মাত্রা হলো যার যার সামর্থ্য। যার যতটুকু সামর্থ্য আছে, সেই পরিমাণে এ দায়িত্ব আদায় করতে হবে। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো।"[২৬৯] [২৭০]

হিসবাহ-র উপাদান চারটি।

আল-মুহতাসিব (যে হিসবাহ পালন করে),

আল-মুহতাসাবু আলাইহি (যার প্রতি হিসবাহ পালন করা হয়),

আল-মুহতাসাবু ফীহি (যে বিষয়ে হিসবাহ করা হয়) এবং

ইহতিসাব (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ)।

১. আল-মুহতাসিব : এর অর্থ হলো যিনি হিসবাহ-র দায়িত্ব সম্পাদন করেন। তিনি মুসলিমদের শাসক কর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তাও হতে পারেন, অথবা অন্য কেউও হতে পারেন। মুহতাসিব হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়, (ক) মুসলিম, (খ) মুকাল্লাফ, (গ) কাদির।

প্রথম শর্তের ফলে কাফিররা বাদ পড়ে যায়। মুকাল্লাফ অর্থ প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন। অর্থাৎ, নাবালক ও পাগলরা বাদ। ব্যতিক্রম হলো, নাবালকেরা এ কাজ করতে পারে কিন্তু এটা তাদের ওপর ফরয না। কাদির দিয়ে বোঝানো হয় হিসবাহ সম্পাদনের সামর্থ্য থাকা। যাদের হিসবাহ করার সামর্থ্য নেই, তারা মনে মনে ঘৃণা করাই যথেষ্ট। ইবনু রজব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "অন্তর দিয়ে মন্দকে ঘৃণা করা আবশ্যক। মুমিন যদি অন্তর দিয়েই মন্দকে ঘৃণা না করে, তা হলে বোঝা যাবে যে তার অন্তরে আর ঈমানই নেই। মুখ এবং হাত দিয়ে হিসবাহ করা মূলত সংশ্লিষ্ট সামর্থ্যবানদের দায়িত্ব।" অপূরণীয় কোনো ক্ষতির ভয় থাকলে সামর্থ্যবানের ওপরও হিসবাহ ফরয থাকে না। তবে সামর্থ্যবান ব্যক্তি যদি সে ক্ষতি মোকাবিলা করারও সামর্থ্য রাখেন, তখন আবার হিসবাহ ফরয হবে। নবীজি ﷺ এ প্রসঙ্গে বলেন, "শ্রেষ্ঠতম শহীদ হলেন হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সেই ব্যক্তি যে যালিম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করে তার হাতে নিহত হয়।"[২৭১]

পক্ষান্তরে, গালিগালাজ বা নিন্দা-সমালোচনার মতো সহনীয় মাত্রার ক্ষতির আশঙ্কা থাকলেও হিসবাহ ফরয থাকে। এক্ষেত্রে মুহতাসিবের দায়িত্ব হলো এসবের মুখোমুখি

[২৬৯] সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:১৬

[২৭০] মাজমু আল-ফাতাওয়া, ২৮/৬৫

[২৭১] মুস্তাদরাক হাকিম : ৪৮৮৪

হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা। লুকমান আলাইহিস সালাম তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন :

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

"হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি সালাত প্রতিষ্ঠা করো, সৎকাজের আদেশ দাও আর মন্দ কাজ হতে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"[২৭২]

পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, সামর্থ্যও আছে, কোনো ক্ষতির আশঙ্কাও নেই, কিন্তু হিসবাহ করে যে লাভ হবে না সেটা বোঝাই যাচ্ছে, এক্ষেত্রেও হিসবাহ ফরয থাকে বলেই প্রতীয়মান হয়। ইমাম নববী বলেছেন, "মুহতাসিবের দায়িত্ব সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা, গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া তার দায়িত্ব না।" তিনি আরো বলেন, "উলামায়ে কিরাম বলেছেন যে, দায়িত্বশীল ব্যক্তির যদি মনে হয় সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করে এই বিশেষ ক্ষেত্রে লাভ হবে না, তা হলেই ওই ক্ষেত্রে হিসবাহ-র ফরযিয়্যাত রহিত হয়ে যায় না।"[২৭৩]

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

"আর স্মরণ করিয়ে দাও। নিশ্চয় স্মরণ করিয়ে দিলে মুমিনরা উপকৃত হয়।"[২৭৪]

দায়িত্বপ্রাপ্তদের ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তাদের দায়িত্ব অন্য যে-কারো চেয়ে বেশি। কারণ দায়িত্ব হলো সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। সামর্থ্যবানের ওপর যা আবশ্যক, অসমর্থ্যের ওপর তা নয়।"[২৭৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন, "কাজেই আল্লাহকে সাধ্যমতো ভয় করো।"[২৭৬] নবীজি ﷺ বলেন, "আমি যদি তোমাদের কোনোকিছু করার নির্দেশ দিই, তা হলে যতটুকু সাধ্যে কুলায় ততটুকু করবে।"[২৭৭]

এই সকল বিধিবিধান তখনই প্রযোজ্য যখন একজন মুসলিম নেতা বিদ্যমান থাকেন এবং তিনি যোগ্যতা অনুসারে কাউকে হিসবাহ-র দায়িত্ব আরোপ করেন। কিন্তু আমাদের

---

[২৭২] সূরা লুকমান ৩১:১৭
[২৭৩] শারহুন নববী, ১১/২৭
[২৭৪] সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫৫
[২৭৫] তুরুকুল হাকিমিয়্যাহ ফিস-সিয়াসাতিশ শারইয়্যাহ, ১/৩৪৫
[২৭৬] সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:১৬
[২৭৭] বুখারি : ৭২৮৮, মুসলিম : ৩৩২১

যুগে শরীয়তের আইন পরিবর্তন করে মুরতাদ হয়ে যাওয়া শাসকেরা হিসবাহ-র দায়িত্ব পালনের কোনো অধিকার রাখে না। বরং, উলামাদের ঐকমত্য অনুযায়ী এদেরকে অপসারণ করাটাই দায়িত্ব। ইমামুল হারামাইন আল-জুয়াইনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই যে, মুসলিম ইমামের অনুপস্থিতিতেও একদল মানুষ জমিনে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের হাত থেকে সমাজকে পরিচ্ছন্ন করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে।"

মুহতাসিবের যেসব নৈতিক শর্ত পূরণ করতে হয়, সেগুলোর মধ্যে আছে ইখলাস, হিসবাহ-সংক্রান্ত জ্ঞান, ধৈর্য, অবিচলতা, নম্রতা, অন্যকে যা আদেশ-নিষেধ করে নিজেও সে অনুযায়ী চলা। শেষেরটা যদিও হিসবাহ করার আবশ্যক কোনো শর্ত না, কিন্তু মুহতাসিব এই শর্ত পূরণ করলে মানুষের ওপর তাঁর হিসবাহ-র প্রভাব বাড়ে।

২. আল-মুহতাসাবু আলাইহি : এর অর্থ হলো এমন কোনো কার্য-সম্পাদনকারী, যার কাজের ফলে তার ওপর হিসবাহ সম্পাদন করতে হয়। এমন ব্যক্তির মুকাল্লাফ হওয়া শর্ত। অর্থাৎ, সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ, যে আদেশ-নিষেধ বুঝতে সক্ষম।

৩. আল-মুহতাসাবু ফীহি : এর অর্থ হলো এমন সব মন্দ কাজ, যা মন্দ হওয়ার বিষয়টি ঐকমত্যের ভিত্তিতে সুপরিচিত, বর্তমানে সংঘটিত হচ্ছে এবং কোনো রকম গোয়েন্দাগিরি ছাড়াই মুহতাসিবের গোচরে আসে।

আরবি শব্দ 'মুনকারে'র অর্থ করা হয়েছে 'মন্দ'। এটা দিয়ে ঠিক গুনাহের কাজের চেয়েও ব্যাপক কিছু বোঝানো হয়। যেমন একটি নাবালক শিশু মদপান করলে আখিরাতে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে না। কিন্তু মদপানের কাজটি কিন্তু ঠিকই মন্দ। এই কাজটিকে ঘৃণা করতে হবে ও এ কাজে বাধা দিতে হবে। ঐকমত্যে সুপরিচিত হওয়ার অর্থ হলো ইখতিলাফি বিষয় না হওয়া। যেসব ব্যাপারে আলিমগণের দলিলভিত্তিক বৈধ মতভেদ আছে, সেসব ক্ষেত্রে হিসবাহ করা হবে না। ভুলভাল দলিলের ভিত্তিতে বা শায মত দিয়ে মতভেদ করা হলে তা আবার গ্রহণযোগ্য নয়। 'বর্তমানে সংঘটিত' বলতে বোঝানো হচ্ছে যে, অতীতে কোনো একটা মন্দ কাজ করা হতো, এখন আর করা হয় না এরকম কাজের ভিত্তিতে কাউকে সতর্ক করা বা শাস্তি দেওয়া হবে না। কোনো একটা মন্দ কাজ ভবিষ্যতে করা হতে পারে, এরকম আশঙ্কার ক্ষেত্রেও কেবল উপদেশ-নসিহতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। 'গোয়েন্দাগিরি ছাড়াই মুহতাসিবের গোচরে আসা' কথাটির মাধ্যমে আল্লাহর এই নির্দেশের কথা বলা হচ্ছে "তোমরা একে অপরের ওপর (দোষ খোঁজাখুঁজির উদ্দেশ্যে) গুপ্তচরবৃত্তি কোরো না।"[২৭৮]

[২৭৮] সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১২

৪. আল-ইহতিসাব : এটি দিয়ে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার কাজটাকে বোঝানো হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, পাপের প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ করা প্রতিটি মুসলিমের ওপরই আবশ্যক। কারণ নবীজি ﷺ বলেছেন, "এর পরে আর কোনো ঈমানই নেই।" এর সাথেও এও যোগ করতে হয় যে, অন্তরে ঘৃণা করার শর্ত হলো যেখানে পাপ সংঘটিত হচ্ছে, সেখানে উপস্থিত না থাকা। এ প্রসঙ্গে বলা হয়, "যে মন্দ কাজে বাধা দিতে পারে না, সে যেন অবশ্যই সেই পাপ সংঘটনের স্থান এড়িয়ে চলে।"

পাপকাজে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য থাকলে তা সম্পাদন করার ক্রম হবে এরকম :

ক) জানানো : যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করছে, তার হয়তো জানা না থাকতে পারে যে সেই কাজটি খারাপ। সেক্ষেত্রে তাকে এ বিষয়টি নম্রভাবে জানিয়ে দিতে হবে। যদি তাতে কাজ না হয়, তা হলে পরবর্তী ধাপে যেতে হবে।

খ) উপদেশ-নসিহত : যে মন্দকাজ করছে, তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। তাকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখাতে হবে এবং সৎকাজ করে আল্লাহর পুরস্কারের আশা করতে বলতে হবে। এক্ষেত্রেও নম্রতা বজায় রাখতে হবে। ইমাম শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে তার (মুসলিম) ভাইকে গোপনে উপদেশ দিল, সে তার প্রতি ভালো আচরণ করল। আর যে প্রকাশ্যে তা করল, সে আসলে তাকে অপমান-অপদস্থ করল।" (শারহুল আরবাইন, ১/২৭)

গ) তিরস্কার করা : কিন্তু এক্ষেত্রেও হালাল পন্থায়ই কথা বলতে হবে। পাশাপাশি শুধু যতটুকু দরকার, ততটুকুই তিরস্কার করতে হবে। সীমালঙ্ঘন করা যাবে না।

ঘ) হাত দিয়ে বাধা দেওয়া : এর উদাহরণ হলো বাদ্যযন্ত্র ভেঙে ফেলা, মদ ফেলে দেওয়া। এমনটা করা তখনই জায়িয হবে, যখন মন্দ কাজ সম্পাদনকারী নিজে থেকে সেই কাজ না করে। এ ছাড়া শুধু ততটুকু উপকরণই নষ্ট করতে হবে, যতটুকু গুনাহের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

ঙ) ধমক দেওয়া ও সতর্ক করা : বৈধ শাস্তি ছাড়া অন্য কিছুর হুমকি দেওয়া যাবে না।

চ) শারীরিক সহিংসতার দিকে যাওয়া : যেমন হাত-পা ব্যবহার। এক্ষেত্রে খারাপ কাজটি থামিয়ে দেওয়ার জন্য যতটুকু সহিংসতা যথেষ্ট, ঠিক ততটুকুতেই কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

ছ) সাহায্যের আবেদন ও অস্ত্রধারণ : পরিস্থিতি আরো খারাপ হলে সাহায্যের জন্য লোক ডাকা এবং একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা লাগতে পারে। ফুকাহায়ে কিরামের একাংশের মতে সাধারণ জনগণ এমনটা করতে পারবে। ইমাম গাযালি

এটাকেই সঠিকতর মত বলেছেন। আরেক অংশের মতে, এক্ষেত্রে খলিফা বা মুসলিম শাসকের অনুমতি আবশ্যক।

ফুকাহায়ে কিরামের সকলে একমত যে, কোনো একটি অসৎকাজের নিষেধ করতে গিয়ে যদি ফলস্বরূপ এরচেয়ে বড় কোনো খারাপ কাজ হয়ে যায়, অথবা ওই খারাপ কাজের চেয়ে বড় কোনো ভালো কাজের লঙ্ঘন হয়ে যায়, তা হলে সেক্ষেত্রে হিসবাহ্ করা বন্ধ রাখতে হবে। ক্ষতির কথা জেনেশুনেও যে এসব ক্ষেত্রে হিসবাহ্ করবে, সে গুনাহগার হবে।

যদি এমন হয় যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ভালো-খারাপ দুইই মিলিয়ে করে (অর্থাৎ, তারা দুটিই করতে পারে অথবা দুটিই ছেড়ে দিতে পারে), তা হলে দুইরকম কাজের মধ্যে তুলনা করে দেখতে হবে। যদি ভালোর পরিমাণ বেশি হয়, তা হলে সেই ভালো কাজের আদেশ দিতে হবে। এমনকি তা করতে গিয়ে সেটার চেয়ে কম পরিমাণ মন্দ কাজ করা লাগলেও। সেই অল্প মন্দকে নিষেধ করা তখন হারাম বলে গণ্য হবে। কারণ সেই অল্প মন্দ কাজের নিষেধ করতে গিয়ে বড় একটি ভালো কাজে বাধা পড়ে যাবে।

কিন্তু যদি ভালো-মন্দের পরিমাণ সমান হয়, তা হলে আদেশ ও নিষেধ উভয়ই হারাম। ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন, "কিছু কিছু ক্ষেত্রে সৎকাজের আদেশ প্রয়োজন। কিছু ক্ষেত্রে মন্দ কাজের নিষেধ প্রয়োজন। আবার কিছু ক্ষেত্রে সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ কোনোটাই করা যাবে না। এটি সেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন কোনো কাজে ভালো-খারাপ দুটোই মিশ্রিত থাকে। আইনের ভাষায় বললে, সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজের নিষেধ হলো অখণ্ড বিধান। ভালো কাজের আদেশ এরকমই হতে হবে যে এর মাধ্যমে যেন তার চেয়ে বড় কোনো ভালো কাজে বাধা না পড়ে বা তার চেয়ে বড় কোনো মন্দ কাজ সংঘটিত না হয়ে যায়। আর মন্দ কাজের নিষেধ এরকমই হতে হবে যেন এর ফলে এর চেয়ে বড় কোনো মন্দ সংঘটিত না হয়ে যায় বা এরচেয়ে বড় কোনো ভালো কাজে বাধা না পড়ে।[২৭৯]

এখানে মনে রাখতে হবে যে, ভালো-খারাপ নির্ধারণ করার মানদণ্ড হবে শরীয়ত। কারো খেয়াল-খুশি বা মনগড়া বিধান নয়। এই কাজ করার দায়িত্ব কেবল সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ মনমানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির। বেপরোয়াভাবে অথবা ভীতির ফলে প্রদত্ত কোনো মতামত এখানে বিবেচ্য নয়।

হিসবাহ্ অতি উত্তম এক নেক আমল। এটি ব্যক্তিপর্যায়কে ছাপিয়ে সমগ্র সমাজেরই উপকার করে। অনেক পাপাচারীকেই নসিহত-তিরস্কারের মাধ্যমে থামিয়ে দেওয়া যায়। উৎসাহ দেওয়ার মাধ্যমে অনেক বেখেয়াল মানুষকে নেক আমলের দিকে ফিরিয়ে আনা

[২৭৯] মাজমু আল-ফাতাওয়া, ২৮/১৩০

যায়। এভাবে হাত ও মুখের মাধ্যমে অনেক কবিরা গুনাহে বাধা পড়ে। সামান্য ক্ষতির ভয়ে এত বড় নেক আমল ত্যাগ করা কখনোই উচিত নয়। বিশাল-সংখ্যক মুসলিম এই দায়িত্ব পালন ছেড়ে দিয়েছে, এটা কোনো অজুহাতেই হতে পারে না।

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

"তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ করো, তা হলে তারা আল্লাহর পথ হতে তোমাকে বিচ্যুত করে ফেলবে।"[২৮০]

বরং আমাদের উচিত সালফে সালিহীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। তাঁরা যেদিকে অগ্রসর হয়েছেন, সেদিকে অগ্রসর হওয়া। তারা যেদিক থেকে বিরত ছিলেন, সেদিক থেকে বিরত থাকা। শরীয়তকে বাদ দিয়ে যারা নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুগামী হয়েছে, তাদের প্রতি ধিক্কার। শরীয়তের ওপর নিজেদের বিচারবুদ্ধিকে প্রাধান্য দানকারীদেরও ধিক্কার। আমাদের তো লুকমানের এই উপদেশ মেনে চলতে হবে, যা তিনি তাঁর ছেলেকে দিয়েছিলেন :

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

"হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি সালাত প্রতিষ্ঠা করো, সৎকাজের আদেশ দাও আর মন্দ কাজ হতে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"[২৮১]

একজন সত্যিকারের মুমিন কখনোই মন্দের আধিক্য দেখে দমে যায় না। কারণ সেসব মন্দের "উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ যাকে ভূমি থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে এবং এর কোনো স্থায়িত্ব নেই।"[২৮২] মন্দের আধিক্য দেখে হিসবাহ-র গুরুত্ব ভুলে গেলে তা হবে বিরাট অপরাধ। অসৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধের মাধ্যমে শুধু সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনই আসবে না, বরং ভালো-খারাপের ধারণা বিকৃত হয়ে যাওয়ার হাত থেকেও রক্ষা পাবে। হিসবাহ পরিত্যাগ করলে একসময় না একসময় এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, ভালোকে মন্দ আর মন্দকে ভালো মনে করা হতে থাকে।

হিসবাহ-সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করার আগে আমরা একটি ভ্রান্ত মতের খণ্ডন করতে চাই। অনেকে দাবি করে যে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে হলে

---

[২৮০] সূরা আল-আনআম ৬:১১৬
[২৮১] সূরা লুকমান ৩১:১৭
[২৮২] সূরা ইবরাহীম ১৪:২৬

আগে নিজে সম্পূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া (আদালাত অর্জন করা) আবশ্যক। আদালাত থাকা অবশ্যই মুহতাসিবের জন্য ভালো, কিন্তু এটি আবশ্যক কোনো শর্ত নয়। ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে অসৎকাজের নিষেধ করে, তার (সম্পূর্ণ) ন্যায়পরায়ণ হওয়াটা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের মতে আবশ্যিক কোনো শর্ত নয়।" পরিপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠ হওয়াটা অল্প কিছু মানুষের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ সকল মুসলিমের দায়িত্ব। অনেকে এই আয়াতগুলো তুলে এনে দেখাতে পারে :

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ

"তোমরা কি (মানুষকে) সৎকাজের আদেশ দিবে, অথচ নিজেরা (তা করতে) ভুলে যাবে?"[২৮৩]

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّـهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

"আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় যে, তোমরা এমন কথা বলবে যা তোমরা করো না।"[২৮৪]

এর জবাব হলো, এখানে মন্দ কাজ করার ব্যাপারে ধমক দেওয়া হয়েছে। অন্যকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে মানা করা হয়নি।[২৮৫] ইমাম নববী একে ব্যাখ্যা করে বলেন, "(একজন মুসলিমের) উচিত একইসাথে দুটো কাজ করা। নিজের প্রতিও হিসবাহ করা, অন্যদের প্রতিও হিসবাহ করা। কেউ যদি এর মধ্যে একটাকে অবহেলা করে, তা হলে এটা কী করে অন্যটাকেও অবহেলা করার অজুহাত হতে পারে?"[২৮৬]

আবু হামিদ গাযালিও রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সঠিক ব্যাপার এই যে, গুনাহগারও হিসবাহ করবে।"[২৮৭]

আবার আরেকদল দাবি করে যে, শাসকের নিযুক্ত কর্মকর্তা ছাড়া আর কেউই হিসবাহ করার অধিকার রাখে না। এটা একেবারেই ভুল মত। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, এই দায়িত্ব সকলের ওপর প্রযোজ্য। কারো জন্য নির্দিষ্ট নয়। সালাফগণ ইমামের অনুমতি ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে হিসবাহ করতেন। এমনকি শাসক নিজে যখন শরীয়ত-বিরোধী কাজ করত, তখন তারা শাসকের ওপরও হিসবাহ করতেন। নবীজি

[২৮৩] সূরা আল-বাকারাহ ২:৪৪
[২৮৪] সূরা আস-সফ ৬১:৩
[২৮৫] তাফসির আল-কুরতুবি, ৪/৪৭
[২৮৬] শারহুন নাবাবী, ২/২৩
[২৮৭] ইয়াহইয়াউ উলুমুদ্দীন, ২/৩১২

ﷺ বলেন, "শ্রেষ্ঠতম একটি জিহাদ হলো যালিম শাসকের সামনে হক কথা বলা।"[২৮৮]

এই হাদীস থেকেই বোঝা যায় যে, সাধারণ মানুষও শাসককে মন্দ কাজ করা থেকে নিষেধ করতে পারবে। সুস্থ মস্তিষ্কের কেউই দাবি করতে পারে না যে, শাসককে উপদেশ দেওয়ার জন্য শাসকেরই অনুমতি নিতে হবে। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আলিমগণ বলেছেন যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ একচ্ছত্রভাবে শাসকের দায়িত্ব নয়। সাধারণ মুসলিম জনগণও তা করতে পারবে। ইমামুল হারামাইন বলেন, এর দলিল পাওয়া যায় মুসলিমদের ইজমা থেকে। মুসলিমদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের লোকদের মধ্যে সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্তরা ছাড়াও অন্যেরাও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমগণ কখনোই তাঁদেরকে অনধিকার চর্চার অভিযোগে অভিযুক্ত করেনি। এবং আল্লাহই ভালো জানেন।"[২৮৯]

ইমাম নববী আরো বলেন, "ইমামুল হারামাইন বলেছেন, সাধারণ মুসলিমদের জন্যও কবীরা গুনাহকারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো জায়েয।"[২৯০]

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, হিসবাহ যেহেতু এক ধরনের দায়িত্বশীলতা, তা হলে এই দায়িত্ব সাধারণ মুসলিমদের হাতে অর্পণ করার কর্তৃত্ব কার হাতে?

এর জবাব হলো, মুহতাসিবের দায়িত্ব সর্বশক্তিমান আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশের মাধ্যমেই অর্পিত হয়েছে। হ্যাঁ, রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত মুহতাসিবের কাজের পরিধি সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বিস্তৃত। কিন্তু তার কোনো অধিকার নেই সাধারণ জনগণের ব্যক্তিগত হিসবাহ পালনের দায়িত্বে বাধা দেওয়ার। ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন, "সরকারি দায়িত্বশীলরা অন্য যে-কারো চেয়ে (এই দায়িত্ব পালনে) বেশি সমর্থ্য ও বেশি বাধ্য। কারণ এ কাজ করার পূর্ব শর্ত হলো এই কাজ করার সামর্থ্য থাকা; আর প্রত্যেকেরই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এ দায়িত্ব পালন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো।"[২৯১]

সাধারণ মানুষ তো বটেই, ইসলামি আন্দোলনের অনেক কর্মীও আজকাল এই ধারণা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন যে হিসবাহ হলো শুধুই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব যা খলিফা ও প্রতিষ্ঠিত মুসলিম জামাত ছাড়া কেউই আদায় করতে পারবে না। এই ধারণার বিরোধিতা করাটাকেই অপরাধ বানিয়ে ফেলা হয়েছে। এই আয়াতটা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় :

---

[২৮৮] আহমাদ : ১১১৪৩, আবু দাউদ : ৪৩৪৬, তিরমিযি : ২১৭৪, ইবনু মাজাহ : ৪০১১
[২৮৯] শারহুন নাবাবী, ২/২৩
[২৯০] শারহুন নাবাবী, ২/২৫
[২৯১] সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:১৬

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করে। আর এরাই সফলকাম।"[২৯২]

আসল কথা হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর অনন্য দায়িত্ব। অন্য কোনো জাতি এই দায়িত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়নি। আর রাজনৈতিক ক্ষমতা মুসলিমদের হাতে সব সময় না-ও থাকতে পারে। তাই বলে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ কখনো থেমে থাকবে না। এটি আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ

"তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করো।"[২৯৩]

তার মানে যতদিন মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব থাকবে, রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, হিসবাহ-র এই দায়িত্ব ততদিন রয়ে যাবে।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করা লোকদের উচিত হিসবাহ-র এই দায়িত্বে নেতৃত্ব প্রদান করা। তাদের উচিত শুধু নিজেরা ভালো কাজ করা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার দায়িত্বে সীমাবদ্ধ না থেকে অন্যদেরকেও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা। তা হলেই জমিনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য আল্লাহর দেওয়া শর্ত পূরণ হবে :

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ

"তাদের (অর্থাৎ মুসলিম শাসককে) আমি জমিনে কর্তৃত্ব দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করবে।"[২৯৪]

---

[২৯২] সূরা আলে ইমরান ৩:১০৪
[২৯৩] সূরা আলে ইমরান ৩:১১০
[২৯৪] সূরা আল-হাজ্জ ২২:৪১

এমনটা বলার কি কোনো যুক্তি আছে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার আগ পর্যন্ত সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান করা বন্ধ থাকবে? সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ব্যাপারেও একই কথা। বর্ণিত আছে যে, এক আব্বাসি খলিফার জামানায় তাঁর অনুমতি না নিয়ে একজন সাধারণ মুসলিম মুহতাসিবের কাজ করতে শুরু করায় খলিফা তাঁকে তিরস্কার করেন। তিনি নিজের মতের পক্ষে দলিল হিসেবে এই আয়াত তুলে ধরেন "তাদের (মুসলিম শাসক) আমি জমিনে কর্তৃত্ব দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করবে।"[২৯৫]

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হিসবাহকে শাসকের ও শাসকের নিযুক্ত কর্মকর্তার একচ্ছত্র দায়িত্ব হিসেবে তুলে ধরা। জবাবে সেই সাধারণ মুসলিম এই আয়াত তুলে ধরেন "মুমিন পুরুষ আর মুমিন নারী পরস্পরের আওলিয়া (সহায়ক, বন্ধু, সমর্থক)। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে।"[২৯৬] খলিফা এই জবাব শুনে আর কোনো কথা বাড়ালেন না।

আজকের মিথ্যা প্রচারকারীরা যদি অন্তত এই খলিফার মতো চুপ করে যেত, তা হলেও একটা কথা ছিল।

এ কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে থাকলে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা অনেক সহজ ও ফলপ্রসূ হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে আজকের এই যুগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা না থাকার দোহাই দিয়ে হিসবাহ-র দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে ফেলা ঠিক নয়। তার ওপর মুসলিম শাসক থাকাকালীনই যদি শাসকের অনুমতি ছাড়া এ কাজ করা যায়, তা হলে শাসকের অনুপস্থিতিতে এ কাজ তো আরো বেশি জরুরি। কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে হিসবাহ-সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসগুলো খাস (বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) নয়, বরং আম (সর্বাত্মকভাবে প্রযোজ্য)। নিশ্চয় এখানে সকল মুসলিমদের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ সামর্থ্য পরিমাণ কাজ করতে বলা হচ্ছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

শুধু তা-ই না, হিসবাহ হলো ইসলামি আন্দোলন কর্মীদের সাফল্যের অন্যতম শর্ত। জাহিলিয়াত আমাদের চারপাশে নতুন নতুন মাধ্যম ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আমাদের শরীয়ত স্বয়ংসম্পূর্ণ, ব্যাপক বিস্তৃত ও যে-কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম। এই চ্যালেঞ্জগুলোর কোনোটাকে দাওয়াত দিয়ে, কোনোটাকে হিসবাহ দিয়ে, কোনোটাকে জিহাদ দিয়ে মোকাবিলা করতে হয়। আমরা হিসবাহ পরিত্যাগ করলে জাহিলিয়াত আমাদের পরাজিত করে ছাড়বে। কারণ এটি পরিত্যাগ করার অর্থ হলো

[২৯৫] সূরা আল-হাজ্জ ২২:৪১
[২৯৬] সূরা আত-তাওবা ৯:৭১

যুদ্ধের ময়দানের এক জায়গায় দরকারি একটি অস্ত্র হাত থেকে ফেলে দেওয়া। ফলে সেই জায়গায় পরাজিত হয়ে সমগ্র ময়দানেই টালমাটাল পরিস্থিতিতে পড়ে যাওয়া।

শরীয়তের নির্দেশ ও আলিমগণের দিঙ্‌নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের দাওয়াতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো সকল মন্দ দূর করতে ও সকল হারিয়ে যাওয়া ভালো কাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। এভাবেই তো আমরা নিজেদের ও অন্যদের দ্বীন ও দুনিয়া রক্ষার্থে যথাসম্ভব উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে পারব। আগেই বলা হয়েছে যে, মানুষকে তাদের প্রতিপালকের ইবাদতের দিকে নিয়ে আসা আমাদের মৌলিক লক্ষ্যগুলোর একটি।

অনেকে দাবি করে যে হিসবাহ-র মতো ছোটখাটো (!) দায়িত্ব ছেড়ে সবচেয়ে বড় মন্দের (জাহিলি আইন-বিধান) অপসারণ ও সবচেয়ে বড় ভালোর (শরীয়তের আইন-বিধান) প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দিতে। হ্যাঁ, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে জাহিলি বিধান উপড়ে ফেলে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা সবচেয়ে বড় দায়িত্বগুলোর অন্যতম। কিন্তু এই কথিত 'সবচেয়ে বড় ভালো' কাজের আদেশ ও 'সবচেয়ে মন্দ' কাজের নিষেধের থেকে সাধারণ হিসবাহকে আলাদা করাটাই একটা ভুল। যদি পার্থক্য থাকেই, তা হলে তা বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ কিছু ব্যক্তির জন্য। আলিমগণ তাঁদের আলোচনায় এসব ক্ষেত্রবিশেষকে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করে গেছেন।

কেউ যদি মনে করে যে হিসবাহ পরিত্যাগ করলে অনেক শক্তি ও সময় বেঁচে যাবে, অন্যান্য কাজ করে এমনি এমনিই শরীয়ত প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে, তা হলে বলতে হয় তারা শরীয়তের ওপর নিজেদের যুক্তিবুদ্ধিকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা হয় আল্লাহকে ভুলে যাচ্ছে বা আল্লাহকে ভুলে থাকার ভান করছে। আল্লাহ নিজেই তো হিসবাহ করার আদেশ দিয়েছেন :

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّـهُ مَن يَنصُرُهُ

"আল্লাহ তাদের অবশ্যই সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করে।"[২৯৭]

আল্লাহরই একটি হুকুম অমান্য করে আল্লাহরই সাহায্য পাওয়ার আশা কীভাবে করা যায়? আল্লাহর দেওয়া সীমা লঙ্ঘিত হতে দেখে ক্রোধান্বিত না হয়ে কী করে আল্লাহর ক্রোধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? আমরা তো পশুর মতো আচরণ করছি। কানে আঙুল ঢুকিয়ে কাপড় দিয়ে চোখ ঢেকে রাখছি। নিজেদেরকে ভাবছি আল্লাহর দ্বীনের অভিভাবক, যে ইচ্ছেমতো এখানে কমবেশি করতে পারে। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, "(আল্লাহর দেওয়া সীমা লঙ্ঘিত হতে দেখেও) যে আল্লাহর ওয়াস্তে রাগান্বিত হয় না, সে আসলে একটা

[২৯৭] সূরা আল-হাজ্জ ২২:৪০

গাধা।"[২৯৮]

যারা অসৎকর্ম সংঘটিত হতে দেখে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা পরিবর্তন করার চেষ্টা করে না, তারা একসময় এতে গা সওয়া হয়ে যাবে। ভালকে মন্দ আর মন্দকে ভালো ভাবতে শুরু করবে। তারা বানী ইসরাঈলের সেই কতিপয় ব্যক্তির মতো অভিশপ্ত হওয়ার যোগ্য:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

> "বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল, তাদের প্রতি দাউদ ও ঈসা ইবনু মারইয়ামের মুখ দিয়ে অভিশাপ করা হয়েছে। কারণ তারা ছিল অবাধ্য ও তারা সীমালঙ্ঘন করত। তারা যেসব অপকর্ম করত, তা থেকে একে অপরকে নিষেধ করত না। নিশ্চয় তারা যা করত, তা অত্যন্ত মন্দ।"[২৯৯]

নবীজি ﷺ বলেছেন, "সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! হয় তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করবে, পাপাচারীকে সত্যপন্থী হতে সাহায্য করবে, আর নয়তো আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ তৈরি করে দেবেন অথবা তোমাদেরকে তাদের (বানী ইসরাঈলের) মতো অভিশাপ দেবেন।"[৩০০]

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ছোট-বড় সকল মন্দ প্রতিরোধ করার আদেশ দিয়েছেন। মন্দকে প্রতিরোধ করার হাদীসটিতে মুনকার শব্দটির সাথে সুনির্দিষ্ট নির্দেশক নেই। অতএব, এর দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো মন্দকাজকে না বুঝিয়ে সকল মন্দকে বোঝানো হয়েছে। কাজেই যারা দাওয়াতের স্বার্থে হিসবাহ্ ত্যাগ করার কথা বলে, তাদের কোনো উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। দাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন যিনি, হিসবাহ-র নির্দেশও দিয়েছেন তিনিই। আমাদের যা আদেশ করা হয়েছে, তা-ই করতে হবে।

৩. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ

জিহাদ নিয়ে কথা বলতেই আজ আমাদের দুঃখ হয়। জিহাদের সাথে করে যতই দুর্ভোগ আর বিপদ আসুক না কেন, সত্যিকারের মুমিনদের কাছে এই ইবাদতটি চোখের মণি। কারণ, এই ইবাদত আল্লাহর ইচ্ছায় মুমিনদেরকে অসম্মান-অপমানের জীবন থেকে উদ্ধার করে সম্মান-মর্যাদার দিকে নিয়ে যায়। আখিরাতেও এটি জান্নাত অর্জন করার পথ সুগম করে দেয়।

---

[২৯৮] সিরাজুল মুলুক, ১/১৭৩
[২৯৯] সূরা আল-মাইদাহ ৫:৭৮-৭৯
[৩০০] মু'জামুল কাবির : ১০২৬৭

فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

"যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হলো এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো, অবশ্যই সে সফলকাম হলো। কারণ পার্থিব জীবন তো ছলনার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৩০১]

নবীজি ﷺ বলেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ধুলা এবং জাহান্নামের আগুনের ধোঁয়া কখনো একত্র হবে না।"[৩০২]

"উটের দুধ দোহন করার মধ্যবর্তী সময় পরিমাণ সময় যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩০৩]

مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

আল্লাহর পথে যার দু'পা ধূলোমলিন হয়েছে, আল্লাহ তার ওপর জাহান্নামকে হারাম করে দিয়েছেন।[৩০৪]

এ কারণেই কয়েকজন গরীব সাহাবি জিহাদে ব্যয় করার মতো অর্থ না থাকার দুঃখে কান্না করেছিলেন।

تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾

"তখন তারা ফিরে গেল, আর সেই সময় তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছিল এই দুঃখে যে, (জিহাদে) ব্যয় করার মতো অর্থ তাদের ছিল না।"[৩০৫]

অথচ এই জিহাদকে এড়িয়ে যেতেই আজকের মুসলিমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটিই করি না। কে যেন একে যথার্থই 'ভুলে যাওয়া ফরয' বলে অভিহিত করেছিলেন। উম্মাহর প্রথম প্রজন্মের সাথে আমাদের বিশাল ফারাক বোঝানোর জন্য এই একটি বিষয়ই যথেষ্ট। এ থেকে আরো বোঝা যায় সাহাবাগণ কেন সম্মানিত হয়েছিলেন আর আমরা কেন অপদস্থতার গর্তে পড়ে আছি। নবীজি ﷺ যথার্থই বলেছেন, "মানুষ যখন দিনার-দিরহামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে, ব্যবসা-বাণিজ্য আর কৃষিকাজে ব্যস্ত হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তাদের ওপর এমন বিপদ নাযিল করবেন যা তাদের কখনোই পরিত্যাগ করবে না, যতদিন না তারা তাদের দ্বীনের দিকে ফিরে

[৩০১] সূরা আলে ইমরান ৩:১৮৫

[৩০২] আহমাদ : ৯৬৯৩, আদাবুল মুফরাদ : ২৮১, ইবনু মাজাহ : ২৭৭৪, মুস্তাদরাক হাকিম : ২৩৯৪

[৩০৩] আহমাদ : ৯৭৬২, আবু দাউদ : ২৫৪৩, তিরমিযি : ১৬৫০

[৩০৪] বুখারি : ৯০৭

[৩০৫] সূরা আত-তাওবা ৯:৯২

আসছে।"[৩০৬]

এই কথা সত্যি হয়ে গেছে। আল্লাহরই দেওয়া জান-মালকে মানুষ আল্লাহরই কাছে জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

> "নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, কারণ তাদের জন্য বিনিময়ে আছে জান্নাত..."

এই লাভজনক ব্যবসার বাজার এই দিকে—

> "তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, হত্যা করে ও নিহত হয়..."

চুক্তির দলিল—

> "এ ওয়াদা তাঁর ওপর অবশ্যই পালনীয়, যা আছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে। আর আল্লাহর চেয়ে কে বেশি ওয়াদা পালনকারী?"

তিনি এই বাণিজ্যে খুশি হতে বলেছেন—

> "কাজেই তোমরা যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করেছ, তার জন্য আনন্দিত হও।"

কারণ হলো—

وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

"আর এটাই হলো মহান সফলতা।"[৩০৭]

বান্দা তার মালিকের কাছে একটি জিনিস বিক্রয় করল, যা এমনিতেই তার নিজের না। বিনিময়ে পেয়ে গেল আসমান-জমিনের মতো প্রশস্ত জান্নাত। এমন জান্নাত, যা কেউ নিজের নেক আমলের জোরে লাভ করতে পারে না। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, (অন্তত) এর কাছাকাছি থেকো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। কারো আমলই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না।" লোকেরা বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি নন?" তিনি ﷺ বললেন, "আমিও নই, যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমতের চাদরে ঢেকে দেন।"[৩০৮]

শুধু তা-ই না, যথাযথ মূল্য পরিশোধকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ এতই উদার যে, তিনি ঘোষণা দেন :

---

[৩০৬] আবু দাউদ : ৩৪৬৪, আহমাদ : ৫৫৬১
[৩০৭] সূরা আত-তাওবা ৯:১১১
[৩০৮] বুখারি: ৬৪৬৭, মুসলিম: ৭৩০০

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত ভেবো না। বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে থেকে তারা রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছে।"[৩০৯]

নবীজি ﷺ বলেন, "শহীদদের আত্মাগুলো থাকে সবুজ পাখির ভেতরে, যারা আল্লাহর আরশ থেকে ঝুলে থাকা ঝাড়বাতিদানে বসা থাকে এবং জান্নাতের যেখানে খুশি সেখানেই ঘুরে বেড়ায়।"[৩১০]

এভাবেই আল্লাহ তাঁর চুক্তি অনুযায়ী শহীদদের জীবন ও সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হন না, তাদের সম্মানজনক রিযিকও দিতে থাকেন। এতকিছুর পরও আজকের মুসলিমরা এই ইবাদতকে ছেড়ে দেয়। ভুলে যায় যে "(ইসলামের) চূড়া হলো জিহাদ।"[৩১১]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করা হলো, যদিও তোমরা তা অপছন্দ করো। কিন্তু তোমাদের কাছে যা অপছন্দনীয়, হতে পারে তা কল্যাণকর। আর যা তোমাদের কাছে পছন্দনীয়, হতে পারে তা কল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।"[৩১২]

দীর্ঘদিন ধরে জিহাদ পরিত্যাগ করতে করতে এর চিহ্নগুলো হারিয়ে গিয়েছে, এর ফিকহ মানুষ ভুলে বসেছে, মানুষের হৃদয়ে এর প্রভাব দুর্বল হয়ে গিয়েছে। মানুষের অজ্ঞতা আর অপছন্দের কারণে জিহাদ বিষয়টা নিয়ে কথা বলাই হয়ে গেছে দুরূহ। কারণ "তাদের ওপর অতিবাহিত হয়ে গেছে বহু বহু যুগ, ফলে তাদের অন্তর হয়ে গেল কঠিন।"[৩১৩]

জিহাদ নিয়ে কথা বলা কঠিন হয়ে গেছে, কারণ দুনিয়া আমাদের পেছন থেকে টেনে ধরে রেখেছে। শয়তান আমাদের মনে মিথ্যে আশা আর ভয় জাগ্রত করে। ভীরুতা আমাদের মৃত্যুর প্রতি বিতৃষ্ণ করে তুলেছে। দুনিয়ার মোহ আমাদের পথে অনড় এক পাথরের মতো আটকে আছে। এমনকি আমাদের নফসও এই দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে।

[৩০৯] সূরা আলে ইমরান ৩:১৬৯

[৩১০] দারিমি : ২৪৬৫, তিরমিযি : ১৬৪১

[৩১১] তিরমিযি : ২৭৪৯, ইবনু মাজাহ : ৩৯৭৩

[৩১২] সূরা আল-বাকারাহ ২:২১৬

[৩১৩] সূরা আল-হাদীদ ৫৭:১৬

বলছে :

رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ

"হে আমাদের প্রতিপালক! কেন আমাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করলেন? আরেকটু সময় কেন দিলেন না?"[৩১৪]

আল্লাহ এর মোক্ষম জবাব দেন :

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝٧٧ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

"(তাদের) বলো (হে মুহাম্মাদ), 'পার্থিব ভোগ তো সামান্যই। যে তাকওয়া অবলম্বন করে, তার জন্য আখিরাতই উত্তম। তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় করা হবে না।' তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের পেয়ে বসবেই। যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে থাকো।"[৩১৫]

তা হলে আমাদের কি উচিত নয় এই সামান্য ভোগ-বিলাসকে পেছনে ফেলে আখিরাতের জন্য কাজ করা? তখনই কেবল আমরা রাসূল ﷺ সাহাবাগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) মতো করে জিহাদকে ভালোবাসতে পারব। তখনই কেবল আমরা জিহাদের নাম শুনে জান্নাতের সুগন্ধ অনুভব করব। নবীজি ﷺ বলেন, "জান্নাত হলো তরবারির ছায়াতলে।"[৩১৬] তখনই কেবল আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা নিয়ে কথা বলা সম্ভব। কিন্তু এই আলোচনা কোথা থেকে শুরু করা উচিত? এর বৈশিষ্ট্য-প্রকৃতি থেকে? নাকি এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে? নাকি এর বিভিন্ন পর্যায়-ক্রম থেকে? নাকি ঐতিহাসিক ও আইনগত প্রয়োজনীয়তা থেকে? আচ্ছা তাদের ব্যাপারে আলোচনা করলে কেমন হয়, যারা খোঁড়া অজুহাতে জিহাদ পরিত্যাগ করেছিল? চলুন সেই দিনটিতে ফিরে যাই, যেদিন নবীজি ﷺ সর্বপ্রথম ওহি লাভ করেন।

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তাঁর প্রতি তাঁর রবের নাযিলকৃত সর্বপ্রথম ওহি হলো তাঁর প্রতিপালকের নামে পড়ার হুকুম, যিনি সৃষ্টি করেছেন। এটি হয়েছিল তাঁর মিশনের একদম শুরুর দিকে। কাজেই প্রথম নির্দেশ ছিল অন্যকে জানানোর আগে নিজে অন্তর দিয়ে জ্ঞান অনুধাবন করা। এর কিছুকাল পর নাযিল হলো, "ওহে বস্ত্র আবৃত

[৩১৪] সূরা আন-নিসা ৪:৭৭
[৩১৫] সূরা আন-নিসা ৪:৭৭-৭৮
[৩১৬] বুখারি : ২৮১৮, মুসলিম : ৪৬৪০

(ব্যক্তি)! ওঠো, সতর্ক করো।"[৩১৭]

তো দেখা যাচ্ছে যে প্রথমে মুহাম্মাদ ﷺ-কে "পড়ো।"[৩১৮] আদেশ দিয়ে নবুওয়্যাত দেওয়া হয়েছে। তারপর মানুষের কাছে দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দিয়ে রাসূলের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। প্রথমে নিকটাত্মীয়, তারপর নিজের গোত্র, তারপর সংলগ্ন আরব, তারপর পূর্ণ আরব ভূখণ্ড, তারপর সবশেষে সমগ্র মানব ও জিন জাতির কাছে পর্যায়ক্রমে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ এসেছে।

নবুওয়্যাতের প্রথম প্রায় দশ বছরে মুহাম্মাদ ﷺ-কে ইসলামের বাণী প্রচার করতে বলা হয়েছে। জিহাদ বা জিযিয়ার বিধান তখনও দেওয়া হয়নি। বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে আসা বিভিন্ন আচার-আচরণকে ধৈর্য ও ক্ষমার মাধ্যমে মোকাবিলা করতে বলা হয়েছে। তারপর তাঁকে হিজরত করা ও পালটা লড়াইয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। তারপর যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, শুধু তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বাকিদেরকে ছাড় দিতে বলা হয়। কিছুকাল পর তাঁকে সাধারণভাবে সকল মুশরিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়, যতদিন না দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহরই জন্য হয়ে যায়।

জিহাদের নির্দেশ আসার পর কাফিরদেরকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, যাদের সাথে মুসলিমদের শান্তিচুক্তি আছে (আহলুস সুলহ ওয়াল হুদনাহ বা আহলুল 'আহদ); দ্বিতীয়ত, যাদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা যুদ্ধরত (আহলুল হারব); তৃতীয়ত, যেসব অমুসলিম জিযিয়া পরিশোধ করার মাধ্যমে মুসলিম সরকারের নিরাপত্তাধীন আছে (আহলুয যিম্মাহ)। নবীজি ﷺ-কে প্রথম দলটির সাথে অতীতে যেসব চুক্তি হয়েছে, তারা সেই চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করার আগ পর্যন্ত তাদের সাথে সেসব চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করতে বলা হয়। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কারো বিশ্বাসঘাতকতা করার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা দেয়, তা হলে চুক্তি বাতিল করার কথা জানিয়ে দিয়ে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। চুক্তিভঙ্গকারীদের সাথে যুদ্ধের বিধানও বলে দেওয়া হয়। এই সকল শ্রেণীর মানুষদের ব্যাপারে শরীয়তের অবস্থান বর্ণনা করে সূরা আত-তাওবা নাযিল হয়। আহলে কিতাব সম্প্রদায় (ইহুদী ও খ্রিষ্টান) যতক্ষণ না ইসলাম গ্রহণ করে অথবা জিযিয়া প্রদান করে, ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ করা হয়। তাঁকে ﷺ আল্লাহ আরও আদেশ করেন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় অস্ত্রের মাধ্যমে আর মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় যুক্তি-তর্ক ও লেখনীর মাধ্যমে। আহলুল-আহদকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—

[৩১৭] সূরাজ আল-মুদ্দাসসির ৭৪:১-২

[৩১৮] সূরা আল-আলাক্ব ৯৬:১

১) যারা নবীজি ﷺ সাথে চুক্তি করার পরে তা ভঙ্গ করে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ করা হয়।

২) যারা চুক্তিভঙ্গকারী কোনো কাজ করেনি, বিশ্বাসঘাতকতা করেনি এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাউকে সমর্থ্যন করেনি। এদের সাথে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করতে বলা হয়।

৩) যাদের সাথে নবীজি ﷺ-এর কোনো চুক্তি নেই এবং তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাউকে সমর্থনও করেনি অথবা যাদের সাথে স্থায়ী চুক্তি আছে। এদেরকে চার মাস সময় দিতে বলা হয়, এই চার মাস পর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। একইভাবে, এদের মধ্যে যারা চুক্তি ভঙ্গ করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ করা হয়। আর যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি বা যাদের সাথে স্থায়ী চুক্তি আছে, তাদের চার মাস সময় দেওয়া হয়। রাসূল ﷺ মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সকল চুক্তিকে সম্মান করেছেন। এ ছাড়া তিনি আহলে কিতাব সম্প্রদায়কে জিযিয়া পরিশোধ করার আদেশ দেন, এর বিনিময়ে তারা নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারবে।

অর্থাৎ, সূরা তাওবা অনুযায়ী, কাফিরদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় :

১) আহলুল হারব (তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত)

২) আহলুল আহদ (তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ)

৩) আহলুয যিম্মাহ (জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত আহলে কিতাব)

দ্বিতীয় দলটি ইসলাম গ্রহণ করার পর প্রতিপক্ষ হিসেবে থেকে যায় কেবল আহলুল হারব এবং আহলুয যিম্মাহ। অতএব, ইসলাম এসেছে সকল মানুষকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার জন্য।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

“বলো, ‘হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্বের মালিক। তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই। তিনিই জীবত করেন আর মৃত্যু আনেন।’”[৩১৯]

ইসলাম এসেছে পৃথিবীর বুক থেকে সব রকম শিরকের শেকড় উপড়ে ফেলে এক আল্লাহর ইবাদত চালু করার জন্য। নবীজি ﷺ বলেছেন, “আমাকে কিয়ামতের আগে

[৩১৯] সূরা আল-আরাফ ৭:১৫৮

তরবারিসহ প্রেরণ করা হয়েছে যতদিন না কোনো শরীক ছাড়া এক আল্লাহর উপাসনা করা হয়।"[৩২০]

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য মক্কায় নবীজি ﷺ-এর আহ্বানের ভাষা ছিল, "বলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ!"

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾

> "বলো, 'হে মানবজাতি! আমি (প্রেরিত হয়েছি) তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারীরূপে।"[৩২১]

মুসলিম সেনাবাহিনী মদীনা থেকে আরব উপদ্বীপের সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন, সেখান থেকে যান পারস্য ও রোমে। তের শতক ধরে ইসলামি খিলাফাতের রাজধানী ঘুরে বেড়িয়েছে মদীনা থেকে দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো হয়ে কন্সটান্টিনোপলে। প্রতিটি রাজধানী থেকেই সত্যের সেনাবাহিনী ইসলামের পতাকা নিয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে।

এই সকল দাওয়াত কার্যক্রমে মুসলিমদের একটিই লক্ষ্য ছিল। নবীজি ﷺ-এর হাতে মক্কার কা'বার ভেতরকার ও তৎসংলগ্ন এলাকার মূর্তিগুলো ধ্বংস করার উদ্দেশ্যও একটিই ছিল। এই একই উদ্দেশ্যেই মুসলিম সেনাবাহিনীগুলো পৃথিবীর নানা অংশে অভিযানে বেরিয়েছে। পারস্য সেনাপতি রুস্তম যখন জানতে চাইল, "কীসে তোমাদের এখানে আনল?" তখন মুসলিম সেনা রিবঈ বিন আমির জবাব দিয়েছিলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের প্রেরণ করেছেন মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে বের করে স্রষ্টার দাসত্বের দিকে নিয়ে আসার জন্য। মানবরচিত ধর্মের যুলুম থেকে বের করে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার দিকে নিয়ে আসার জন্য। এই দুনিয়ার কাঠিন্য থেকে বের করে আখিরাতের আরাম-আয়েশের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।"

আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) লক্ষ্য এটিই ছিল। এই লক্ষ্যে কখনো পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী আল্লাহরই হুকুমে এই লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম ও পদ্ধতিতে যথোচিত পরিবর্তন-সংযোজন-বিয়োজন এসেছে। নবীজি প্রথমে গোপনে দাওয়াত দিয়েছেন। একদম কাছের মানুষদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার উপযুক্ত মনে হয়, বেছে বেছে তাদের কাছেই দাওয়াত পৌঁছানো হয়েছে। তিন বছর পর প্রকাশ্যে দাওয়াতের নির্দেশ দেওয়া হয়। মক্কা ও অন্যান্য জায়গায় নবীজি ﷺ এই দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে প্রায় দশ বছর

[৩২০] আহমাদ : ৫১১৫

[৩২১] সূরা আল-হাজ্জ ২২:৪৯

পর্যন্ত চলতে থাকে। বিরোধিতার জবাবে নবী ও সাহাবিগণকে ধৈর্য ধরতে বলা হয়। আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়। এ কারণে 'আকাবাহর দ্বিতীয় বাই'য়াতের সময় তিনি শপথ গ্রহণকারীদের মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, "আমাদেরকে তা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।"[৩২২]

মদীনায় হিজরতের পরপর শুধু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়, যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এই পর্যায়ে বদর, উহুদ, খন্দকের যুদ্ধ ও অন্যান্য ছোটখাটো যুদ্ধ হয়। খন্দকের যুদ্ধে সম্মিলিত মিত্রবাহিনীর (আল-আহযাব) পরাজয়ের পর জিহাদের চূড়ান্ত বিধান আসে। খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পর নবীজি ﷺ বলেন, "এবার সময় এসেছে আমাদের পক্ষ থেকে তাদের আক্রমণ করার। তারা আর আমাদের আক্রমণ করবে না। এখন থেকে আমরাই তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হব।"[৩২৩]

কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে সূরা আত-তাওবা নাযিল হয়। সেখানে আল্লাহ আদেশ দেন যে সকল কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এভাবে জিহাদ পরিণত হলো আল্লাহর দ্বীনকে ছড়িয়ে দেওয়ার ও আল্লাহর কালামকে বুলন্দ করার একটি ফরয বিধানে। নবীজি ﷺ বলেছেন, "আমাকে কিয়ামতের আগে তরবারিসহ প্রেরণ করা হয়েছে যতদিন না কোনো শরীক ছাড়া এক আল্লাহর উপাসনা করা হয়। আমার রিযিক দেওয়া হয় আমার বর্শার নিচ থেকে। আমার বিরুদ্ধাচারণকারীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে অপদস্থতা-লাঞ্ছনা।"[৩২৪]

এক হাতে কুরআন আর অপর হাতে তরবারি নিয়ে মুসলিম সেনাবাহিনীগুলো ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন জাতি, রাজ্য, সাম্রাজ্য ও গোত্রকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার জন্য। যে মেনে নিয়েছে, তাকেই ইসলামের ভেতর স্বাগত জানানো হয়েছে। কিন্তু যে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়ে জিযিয়া কর আদায় করা হয়েছে অথবা তাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়েছে।

লক্ষ্য কখনো পাল্টায়নি। নবীজি ﷺ ও সাহাবিগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) দাওয়াত ও জিহাদ আবর্তিত হয়েছে একটি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই। কুরআনে এটি খুব চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّـهِ

"তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত না ফিতনা (শিরক ও কুফর)

[৩২২] ইবনু ইসহাক, সীরাতুর রাসূল
[৩২৩] বুখারি : ৪১১০
[৩২৪] আহমাদ : ৫১১৫

খতম হয়ে যায় আর দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।"[৩২৫]

মক্কা বিজয়ের পর মূর্তি ধ্বংসের ঘটনা তাওহীদের বিজয়ের একটি প্রতীক। যুদ্ধও তাওহীদের দিকে ডাকার একটি মাধ্যম। যেমনটা নবীজি ﷺ বলেছেন, "আমাকে আদেশ করা হয়েছে মানুষের সাথে ততক্ষণ লড়াই করে যাওয়ার জন্য, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল।"[৩২৬]

যুদ্ধ করা ইসলামের দিকে আহ্বানেরই একটি অংশ। শাসক ও রাজা-বাদশাহরা আল্লাহর ভূমি ও সৃষ্টিগুলোকে নিজেদের মালিকানাধীন দাবি করে সেখানে ইসলামের প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করছিল। তাই তাদের সাথে লড়াই করা অপরিহার্য হয়ে যায়। এ ছাড়া এসকল যালিম শাসক মানবরচিত আইন প্রণয়ন করে জনগণকে তা মানতে বাধ্য করার মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত করছিল। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে উপাসনা করা এবং ইসলামের দাওয়াতের বিরোধিতা করা এইসব শাসকদেরকে অপসারণ করা আবশ্যক। এসব শাসকের মধ্যে যারাই ইসলামে প্রবেশ করতে বা জিযিয়া দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে নিতে অস্বীকৃতি জানাবে, তাদের সবার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা হবে। ফিতনা তথা শিরক ও কুফর নির্মূল করার জন্য যুদ্ধের কোনো বিকল্প নেই।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّـهِ

"তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতদিন না ফিতনা নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহরই জন্য হয়ে যায়।"[৩২৭]

কেউই আল্লাহর পাশাপাশি বা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেকে স্রষ্টা বলে দাবি করতে পারে না। তেমনিভাবে আল্লাহর পাশাপাশি বা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেকে আইন প্রণেতা বলেও কেউ দাবি করতে পারে না। ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কারো অধিকার নেই আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার-ফায়সালা করার। এমনকি একজন মুসলিম ও একজন কাফিরের মধ্যকার বিচারও না।"[৩২৮]

মুসলিম হিসেবে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আল্লাহর ভূমি ও সৃষ্টিজগতের ওপর আল্লাহর আইনের সার্বভৌমত্ব কায়েম করার জন্য। আমাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমরা যেন আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোনোকিছু দিয়ে মানুষের মাঝে বিচার না

[৩২৫] সূরা আল-আনফাল ৮:৩৯
[৩২৬] বুখারি : ১৩৯৯, মুসলিম : ১৩৩
[৩২৭] সূরা আল-আনফাল ৮:৩৯
[৩২৮] মাজমু আল-ফাতাওয়া, ৩৫/৪০৭

করি। যে-কেউ তা প্রত্যাখ্যান করবে বা এতে বাধা দেবে, তার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা হবে।

অনেকে বলতে পারে যে, আমরা মানব জাতির ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিচ্ছি। আমাদের জবাব হলো—এই কর্তৃত্ব আল্লাহর সৃষ্টির ওপর আল্লাহর কর্তৃত্ব। আমরা কেবল মানবজাতির কল্যাণের জন্য বের করা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাত হিসেবে আল্লাহর এই নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে চলেছি।

মানুষ কখনোই এমন কোনো আইনবিধান বানাতে পারবে না, যা আল্লাহর আইনের সমান বা তার চেয়ে বেশি ন্যায়ানুগ। যে ইসলামকে মেনে নিবে, সে নিঃসন্দেহে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হবে। কিন্তু যে-কেউ কাফির হিসেবে থাকাকেই বেছে নেয়, সে তা করার ব্যাপারে স্বাধীন। কিন্তু এর বিনিময়ে অবশ্যই তাকে জিযিয়া দিয়ে ইসলামের আইনব্যবস্থার প্রতি অনুগত হয়ে থাকতে হবে।

অজ্ঞ লোকেরা প্রশ্ন করতে পারে, "আপনাদেরকে এবং ইসলামকে মানুষের ওপর নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব চালানোর অধিকার কে দিয়েছে?" আমরা জবাব দিই—"মানবজাতির রব, মানবজাতির অধিপতি, মানবজাতির ইলাহ আল্লাহ আমাদের এই অধিকার দিয়েছেন।" এখন আমাদের পালটা প্রশ্ন, "তোমাদেরকে ইচ্ছেমতো আইন বানিয়ে মানবজাতির ওপর নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ফলানোর অধিকার কে দিয়েছে?"

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ব্যাপারে এটিই সঠিক বুঝ। যারা এর অন্যথা ভাবে, তাদের উচিত ইসলামি শাস্ত্রের উৎসগুলো অধ্যয়ন করে তার বুঝকে সংশোধন করে নেওয়া। ইসলাম কেবল কিছু বিশ্বাসের সমষ্টি নয়, মুখে যার সাক্ষ্য দিয়ে এবং জবান ও কলম দিয়ে যাকে সমর্থ্যন করলেই সব দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। এই খণ্ডিত বুঝের পক্ষে অনেকে দলিল হিসেবে এই আয়াত উল্লেখ করে :

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

> "আর বলে দাও, 'সত্য এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে। কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করুক।"[৩২৯]

এই আয়াত উল্লেখ করে জিহাদকে অস্বীকার করতে চাওয়াটা অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা; মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহর নাযিল করা বিধান। এ কারণেই মুসলিমদের আকীদা-সম্পর্কিত একটি ভাষণ বা খুতবা দিয়ে দেওয়াটাই ইসলাম প্রতিরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং আমাদের সকল দায়িত্বই পালন করতে হবে। মুখ ও সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে হবে, বাগ্মিতার

[৩২৯] সূরা আল-কাহফ ১৮:২৯

সহিত প্রমাণ তুলে ধরতে হবে এবং অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। জিহ্বা, সুন্দর আচরণ ও বাগ্মিতা হলো মন ও মননের জন্য। কাজেই হয় মানুষ ঈমান এনে অন্তরের শান্তি লাভ করবে। আর নয়তো বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া পরিশোধ করে নিজের ওপর ইসলামি আইন-বিধানের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেবে। কিন্তু কেউ অহংকার করে তা প্রত্যাখান করলে আমাদের তরবারি চালাতে হবে, যতদিন না এসব মিথ্যা উপাস্য মুখ থুবড়ে পড়ে। তারপরই আমরা এই আয়াতের সকল হক আদায় করে তিলাওয়াত করতে পারব :

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

"আর বলো দাও, 'সত্য এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে। কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করুক।"[৩৩০]

এটিই হলো ইসলামে যুদ্ধের বিধানের কারণ, যা আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলে দিয়েছেন :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّـهِ

"তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতদিন না ফিতনা নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহরই জন্য হয়ে যায়।"[৩৩১]

এভাবেই ধাপে ধাপে ইসলামের নিয়মাবলি পূর্ণতা লাভ করেছে। চূড়ান্ত ধাপে পৌঁছার পর এর বিধান কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর হয়ে গেছে।

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

"মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করো, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে।"[৩৩২]

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

"তারপর এই নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো। তাদের ঘেরাও করো। তাদের অপেক্ষায় প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ

[৩৩০] সূরা আল-কাহফ ১৮:২৯
[৩৩১] সূরা আল-আনফাল ৮:৩৯
[৩৩২] সূরা আত-তাওবা ৯:৩৬

পেতে বসে থাকো।"[৩৩৩]

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴿٢٩﴾

"আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা (১) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, (২) শেষ-দিবসের প্রতি ঈমান আনে না, (৩) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তাকে হারাম গণ্য করে না, আর (৪) সত্য দ্বীনকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না—তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যে পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্বীকার করে স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়।"[৩৩৪]

এগুলো হলো ইসলামে জিহাদের বিধানের কারণ।

ইসলামের অবশ্য ঠেকা পড়েনি তার কোনো বিধানের পক্ষে সাফাই গাওয়ার। যারা নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে লজ্জিত, জাহিলিয়াতকে খুশি করার জন্য তৎপর, জাহিলি বিধানের পক্ষে যুদ্ধ করতে নির্লজ্জ, তাদের খুশি করতে না পারলে ইসলামের কিছু আসে যায় না। আজকাল অনেক মুসলিমই জিহাদের ব্যাপারে কথা বলাও এড়িয়ে চলে। এভাবে তারা প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের 'প্রভু'দেরকে খুশি রাখতে চায়, তাদের রোষানল থেকে বাঁচতে চায়!

অনেক মুসলিম প্রশ্ন করে, "জিহাদ আবার কী? আল্লাহ আমাদের শুধু দাওয়াত করতে বলেছেন। কারণ তিনি বলেন :

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"জ্ঞান-বুদ্ধি আর উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তুমি (মানুষকে) তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান জানাও আর লোকদের সাথে বিতর্ক করো এমন পন্থায় যা অতি উত্তম।"[৩৩৫]

এসকল লোক ভুল করে জিহাদকে দাওয়াতের বিপরীত মনে করে। এই আয়াতটা যে দাওয়াতের নিয়ম-কানুন বর্ণনা করে আর জিহাদের যে নিজস্ব নিয়ম-কানুন ও মূলনীতি আছে, এই বিষয়টা তারা এড়িয়ে যায় অথবা না দেখার ভান করে। অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ জিহাদের নিয়ম-কানুনও বলেছেন :

[৩৩৩] সূরা আত-তাওবা ৯:৫
[৩৩৪] সূরা আত-তাওবা ৯:২৯
[৩৩৫] সূরা আন-নাহল ১৬:১২৫

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

> "হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করো। তাদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম। আর তা কতই-না নিকৃষ্ট আবাসস্থল!"[৩৩৬]

আবার কিছু মুসলিম বলে, "ইসলামে জিহাদের বিধান দেওয়া হয়েছে শুধুই আত্মরক্ষা করার জন্য। অতএব, জাহিলিয়াতকে বিরক্ত না করে তাকে তার মতো থাকতে দিন। সে যতদিন আমাদের ভূমি আক্রমণ না করছে, ততদিন পর্যন্ত আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারি।" এই অজ্ঞ লোকেরা ইসলাম আর জাহিলিয়াতকে এক করে দেখে। মনে করে, এই দুটি মতাদর্শই আল্লাহর সৃষ্টির ওপর নিজ নিজ সীমা-পরিসীমা অনুযায়ী শাসন-কর্তৃত্ব বজায় রাখার অধিকারী।

এরা জিহাদের বিধানকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রহিত প্রমাণ করার চেষ্টা করে। তাদের খোঁড়া যুক্তি হলো, নবীজি ﷺ তো প্রথমে গোপনে দাওয়াত প্রদান শুরু করেছেন। তারপর প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়ে বিরোধিতাকারীদের অত্যাচার সহ্য করে গেছেন। তারপর যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের বিরুদ্ধে রক্ষণাত্মক যুদ্ধ করেছেন। সব শেষে গিয়ে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। তা হলে আমরাও এভাবে ধাপে ধাপে আগাই। এত তাড়াহুড়ার কী আছে?

এরা ভুলে যায়, অথবা ভুলে যাওয়ার ভান করে যে, নবীজি ﷺ এই সবকিছু করেছেন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী। তিনিও যদি এসব নির্দেশের অন্যথা করতেন, তা হলে তাঁরও গুনাহ হতো। তবে তিনি এমনটা করেননি এবং তিনি নিষ্পাপ। জিহাদের বিধান যখন চলেই এসেছে, তখন আমরা তা অমান্য করার অর্থ হলো গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হওয়া।

আবার অনেকে আছে যারা বলে যে, জিহাদ তো ফরয ঠিক আছে। কিন্তু খিলাফাত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এভাবে নেতৃত্বশূন্য অবস্থায় কোনো জিহাদ করা যাবে না। এখানেও তারা দুই ক্ষেত্রের দুটি বিধানকে গুলিয়ে ফেলছে। একটি হলো নেতা থাকা অবস্থায় তাঁর অনুমতি নিয়ে যুদ্ধ করার বিধান, আরেকটি হলো মুসলিম নেতা ক্ষমতায় না থাকা অবস্থায় কী করা হবে তার বিধান। যেখানে আমরা জিহাদ করবই মুসলিম শাসককে ক্ষমতায় আনার জন্য, সেখানে কী করে কেউ এসে এই দাবি করতে পারে যে শাসকের অনুমতি ছাড়া জিহাদ হবে না?

---

[৩৩৬] সূরা আত-তাওবা ৯:৭৩

ইবনু কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মুসলিম শাসকের অনুপস্থিতি যেন জিহাদ বন্ধ না করে (অর্থাৎ, জিহাদ বন্ধ করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহৃত না হয়)। তা হলে এটি (জিহাদ) থেকে যেসব ফায়দা পাওয়া যেত, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আর মুসলিমরা যদি এমতাবস্থায় কোনো গনিমত লাভ করে, তা হলে তা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বণ্টন করবে।"[৩৩৭]

ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কেউ যদি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ও অন্যায়কারীদের শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়, তা হলে (আল্লাহর) আনুগত্যের ব্যাপারে সে যেসব নির্দেশনা দিবে তা মেনে চলা বাধ্যতামূলক।"[৩৩৮]

আসলে অজুহাত যারা দিতে চায়, তাদের কাছে অজুহাতের অভাব কখনোই হবে না। জিহাদ এমনিতেই এমন একটা ইবাদত, যেখানে কষ্ট সবচেয়ে বেশি। নিজের ঘরবাড়ি-পরিবার, আরাম-আয়েশ ছেড়ে চলে যাওয়া লাগে। আজকের দুনিয়ালোভী ও মৃত্যুভয়ে ভীত মুসলিমরা তা হলে কেনই বা অজুহাত দেবে না? মজার ব্যাপার হলো, একই রকমের অজুহাত নবীজি ﷺ-এর যুগেও অনেকে দিত। কেউ বলত :

ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي

"আমাকে (জিহাদে না যাওয়ার) অনুমতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না।"[৩৩৯]

لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ

"এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হোয়ো না।"[৩৪০]

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ

"যদি আমরা যুদ্ধ করতে জানতাম, তা হলে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম।"[৩৪১]

رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ

[৩৩৭] মুগনি, ১০/৩৬৮; শারহুল কাবির, ১০/৩৭৩
[৩৩৮] মাজমু আল-ফাতাওয়া, ১৮/১৫৮
[৩৩৯] সূরা আত-তাওবা ৯:৪৯
[৩৪০] সূরা আত-তাওবা ৯:৮১
[৩৪১] সূরা আলে ইমরান ৩:১৬৭

"হে আমাদের রব! কেন আমাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করলেন? কেন আমাদের আরেকটু সময় দিলেন না?"[৩৪২]

غَرَّ هَـٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ

"এই লোকগুলোকে তাদের ধর্ম ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।"[৩৪৩]

وَعَدَنَا اللَّـهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৩৪৪]

لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا

"তোমরা (শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে) দাঁড়াতে পারবে না। কাজেই তোমরা ফিরে যাও।"[৩৪৫]

شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا

"আমাদের সম্পদ-সম্পত্তি আর পরিবার-পরিজন আমাদের ব্যস্ত রেখেছিল। কাজেই আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"[৩৪৬]

بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ

"নিশ্চয় আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত।"[৩৪৭]

কিন্তু এই সকল লোককে ভীতু ও মিথ্যুক আখ্যা দিয়ে নাযিল হয় আল্লাহর কালাম :

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَـٰكِن كَرِهَ اللَّـهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾

[৩৪২] সূরা আন-নিসা ৪:৭৭
[৩৪৩] সূরা আল-আনফাল ৮:৪৯
[৩৪৪] সূরা আল-আহযাব ৩৩:১২
[৩৪৫] সূরা আল-আহযাব ৩৩:১৩
[৩৪৬] সূরা আল-ফাতহ ৪৮:১১
[৩৪৭] সূরা আল-আহযাব ৩৩:১৩

“তাদের যদি (যুদ্ধাভিযানে) বের হওয়ার ইচ্ছে থাকত, তবে তারা সেজন্য অবশ্যই প্রস্তুতি নিত। কিন্তু তাদের অভিযানে গমনই আল্লাহর পছন্দ নয়। কাজেই তিনি তাদের পশ্চাতে ফেলে রাখেন। আর তাদের বলা হলো, ‘যারা (নিষ্ক্রিয় হয়ে) বসে থাকে, তাদের সাথে বসে থাকো।’”[৩৪৮]

মুনাফিক ও যাদের অন্তর রোগাক্রান্ত, তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব না জিহাদের মতো উঁচু চূড়ায় আরোহণ করা। যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকে ঘৃণা করে, জিহাদ তাদেরই ঘৃণা করে। যারা দয়াময় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় ও তাঁর জান্নাতে বাস করতে চায়, দুনিয়ার জীবনকে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেয়, তাদের একান্ত সম্পত্তি হিসেবেই জিহাদ নিজেকে উপস্থাপন করে। যারা জিহাদকে আল্লাহর হুকুম বলে জানে ও মানে, তাদেরই একচ্ছত্র অধিকার হয়ে রয় জিহাদ। জিহাদ ইসলামের অপরিহার্য বিধান, জাহিলিয়াতের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া আর ইতিহাসের অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

ইসলামের বেশ কয়েকটি ফরয বিধান জিহাদ ছাড়া পরিপূর্ণ করা সম্ভব না। যেমন :

১. আলিমদের ইজমা হলো, কাফির শাসকদেরকে অপসারণ করতে হবে। শরীয়ত আইন বাদ দিয়ে মানবরচিত জাহিলি আইন দিয়ে শাসন করে আমাদের শাসকরা কি কাফির হয়ে যায়নি? এমন শাসকদের অপসারণ করার জন্য কি জিহাদ আমাদের ওপর বাধ্যতামূলক নয়?

২. ক্ষমতাশীল কোনো গোষ্ঠী যদি শাসন করার ক্ষেত্রে ইসলামি আইনের এক বা একাধিক ধারা কার্যকর করতে অস্বীকার করে, তা হলে আলিমগণের ইজমা হলো সেই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আমাদের শাসন করা গোষ্ঠীগুলো কি বেশিরভাগ ইসলামি বিধানের প্রতি অবাধ্য নয়? জিহাদের মাধ্যমে তাদের সেসব আইন মানতে বাধ্য করা কি আমাদের ওপর বাধ্যতামূলক নয়?

৩. আলিমগণের ইজমা হলো একজন খলিফাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা। খিলাফাত কি আজ অনুপস্থিত নয়? শত্রুরা কি ক্ষমতা ও তরবারি প্রয়োগ করে একে ধ্বংস করে দেয়নি? জিহাদ কি তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ নয়?

৪. মুসলিম ভূমিগুলোর প্রতিরক্ষা এবং কাফিরদের হাতে দখল হওয়া মুসলিমদের সকল ভূমি পুনরুদ্ধার করা আলিমদের ইজমা অনুযায়ী ফরয। ফিলিস্তিন, আন্দালুসিয়া, বলকান, মধ্য এশিয়ার মুসলিম রিপাবলিকগুলোসহ পৃথিবীর অনেক জায়গা কি একসময় মুসলিমদের ছিল না? এগুলো পুনরুদ্ধার করতে জিহাদ কি ফরয না?

৫. আলিমগণের ইজমা হলো, কাফিরদের হাতে থাকা সব মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করা।

[৩৪৮] সূরা আত-তাওবা ৯:৪৬

> পৃথিবীর নানা প্রান্তে কারাগার ও ডিটেনশান সেন্টারগুলো কি হাজার হাজার মুসলিম আলিম ও সাধারণ মুসলিমদের দ্বারা ভর্তি নয়? তাঁদের উদ্ধার করতে জিহাদ কি বাধ্যতামূলক নয়?

নিশ্চয় আমাদের শাসন করা কাফির শাসকদের অপসারণ করার জন্য, এই শাসকদের ঘিরে থাকা চাটুকার ও সমর্থকদের দমানোর জন্য, ইসলামি খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, মুসলিমদের ভূমি পুনরুদ্ধার ও বন্দিদের মুক্তি করার জন্য জিহাদ আমাদের ওপর ফরয। তখনই কেবল আমাদের সেনাবাহিনীগুলো কুরআন আর তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারবে। রাজ্য আর সাম্রাজ্যগুলোকে ইসলামের দিকে ডাকতে পারবে। ঠিক যেভাবে ইসলামের প্রথম প্রজন্ম প্রবেশ করেছিল রোম, পারস্য আর অন্যান্য ভূমিতে। এই সব ফরয বিধান আদায় করার জন্য জিহাদ কি আমাদের ওপর ফরয হয়নি? নাকি এই ফরযিয়াত অবহেলা করতে করতে, গুনাহগার হতে হতে একদিন আমাদের ঈমানটাই খুইয়ে বসব?

নাকি আমরা "আরো জোরে মাটি কামড়ে" ধরব?[৩৪৯] আখিরাতকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার ভোগবিলাসে মত্ত থাকব? নাকি সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব?

وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ﴿٣٨﴾

> "আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তা হলে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন। তখন তারা তোমাদের মতো হবে না।"[৩৫০]

আমরা জানি যে, অনেক সত্যপন্থী মুসলিমই জিহাদের ব্যাপারে এই সকল কথার সাথে একমত। তাঁরা জানেন ও মানেন যে জিহাদ ফরয। তাঁরা একে অবজ্ঞা করার পরিণামও জানেন। তাঁরা ভয় করেন নবীজি ﷺ-এর এই হাদীস, "যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ না করে অথবা যুদ্ধের বাসনা মনে না রেখে মৃত্যুবরণ করল, সে নিফাকের একটি শাখার ওপর মৃত্যুবরণ করল।"[৩৫১] কিন্তু এরপর তাঁরা মুসলিমদের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত করেন। দেখেন যে তারা আজ অত্যাচারিত, শক্তিহীন, রাষ্ট্রহীন, নেতৃত্বশূন্য। এই অবস্থা দেখে তাঁরা এত হতাশ হয়ে পড়েন যে তাঁরা জিহাদকে পেছাতে থাকেন। পরিস্থিতির সাথে সমঝোতায় আসেন। নবী ﷺ-এর মতো ধাপে ধাপে শক্তিশালী অবস্থার দিকে পৌঁছাবেন বলে নিজেদের বুঝ দেন। এরকম দৃষ্টিভঙ্গি ত্রুটিপূর্ণ। কারণ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও

---

[৩৪৯] সূরা আত-তাওবা ৯:৩৮

[৩৫০] সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৩৮

[৩৫১] মুসলিম : ৫০৪০, আবু দাউদ : ২৫০৪

সাহাবাগণ ﷺ নিজেদের যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছিলেন, তাঁরা সেটা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ীই করেছিলেন। সেখানে আমরা এমন এক সময়ে আছি, যখন কুরআন নাযিল হওয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং জিহাদের বিধান চলে এসেছে। এই দায়িত্বে অবহেলা করে নিশ্চিতভাবেই আমরা গুনাহ করে চলেছি।

অনেকে বলতে পারে, "কিন্তু আমরা তো এখন দুর্বল অবস্থায় আছি। তাই আমাদের ধৈর্য ধরে সবকিছু সহ্য করা উচিত।"

এর জবাব হলো, দুর্বল অবস্থায় আছি সেটা ঠিক আছে। কিন্তু তা মুখ বুজে সহ্য করার বদলে আমাদের সেই ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে আমরা শক্তিশালী অবস্থায় পৌঁছে যাই এবং জিহাদ করার সামর্থ্য অর্জন করি। এই লাঞ্ছনার জীবন থেকে মুক্তির উপায় এটিই। আমরা নিজেরাই নিজেদের সামনে যেই বাধা দাঁড় করিয়েছি, তা আমাদের নিজেদেরই ভাঙতে হবে। আমাদেরই তো আল্লাহ বলেছেন, "আর তাদের মোকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী সদা প্রস্তত রাখবে যা দিয়ে তোমরা ভয় দেখাতে থাকবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে।"[৩৫২]

মক্কার প্রথমদিকের মুসলিমদের সাথে আমাদের পার্থক্য এখানেই। তাঁরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেননি, কারণ তাঁদেরকে তা করতে আদেশ করা হয়নি। আমাদের তা করতে হবে, কারণ আমাদের এর আদেশ করা হয়েছে। যদি জিহাদ করার শক্তি-সামর্থ্য না থাকে, তা হলে তা অর্জন করতে হবে।

শক্তি অর্জন প্রচেষ্টা চালানোর সময় নিজেদের মক্কার মুসলিমদের মতো দুর্বল ভাবলে হবে না। কারণ সেই অবস্থার বিধান রহিত হয়ে নতুন বিধান নাযিল হয়েছে। সে সময়কার সাহাবাগণকে যুদ্ধ করতে মানা করা হয়েছিল, আর আমাদের এর প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যখন দুর্বলতার কারণে জিহাদ করা সম্ভব থাকে না, তখন জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়া ফরয হয়ে যায়। কারণ যেটি অর্জন ব্যতিরেকে কোনো ফরয দায়িত্ব আটকে থাকে, সেটি অর্জন করাটাই ফরয হয়ে যায়।"[৩৫৩]

ইসলামের প্রকৃতি ও আমাদের চারপাশের জাহিলিয়াতের প্রকৃতির কারণেই জিহাদ আমাদের ওপর ফরয। ইসলাম আর কুফর কখনো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারে না। প্রকৃতিগতভাবেই এ দুটি আদর্শ একে অপরের কর্তৃত্ব সহ্য করতে পারে না, তা তাদের কর্তৃত্বাধীন ভূমি একটি আরেকটির থেকে যত দূরেই থাকুক না কেন। প্রকৃতিগতভাবেই তারা একে অপরের মূলোচ্ছেদ করতে তৎপর। যুদ্ধের এই চক্র কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

[৩৫২] সূরা আল-আনফাল ৮:৬০
[৩৫৩] মাজমু আল-ফাতাওয়া, ২৮/২৫৯

নবীজি ﷺ বলেন, "আমার উম্মাতের একটি দল হকের ওপর থেকে যুদ্ধ করে যাবে যতদিন না তাদের শেষ দলটি মাসিহ দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।"[৩৫৪]

আমরা যদি এই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানকে অবহেলা করার চেষ্টা করি, তা হলে (আল্লাহ না করুন) আমাদের শত্রুরা আমাদের ঈমানহারা করার আগ পর্যন্ত থামবে না। দুটি শিবিরেরই নিজ নিজ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, যদিও কুফরের শিবির সর্বদাই মিষ্টি কথার আড়ালে তাদের আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখার চেষ্টা করে। অপরদিকে ইসলাম কুফরকে এবং কুফরি শাসনব্যবস্থাকে শেকড়সহ উপড়ে ফেলার লক্ষ্যে কাজ করে। সে জায়গায় বপন করে ঈমানের বীজ, যা মহীরুহ হয়ে বেড়ে ওঠে। মুসলিমদের দায়িত্ব হলো ইসলামের এই লক্ষ্যকে নিঃসংকোচে খোলাখুলি প্রকাশ করা এবং এর পরিপূর্ণতার জন্য কাজ করা। কাফির-মুশরিকদের উদ্দেশ্য আমরা না বুঝলেও আল্লাহ ঠিকই তা কুরআনে বলে দিয়েছেন :

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

"আহলে কিতাবদের মধ্যে অনেকেই তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তাদের অন্তরের হিংসার দাহনে কামনা করে যে, যদি তোমাদের তোমাদের ঈমান আনার পর কুফরিতে ফিরিয়ে নিতে পারত!"[৩৫৫]

يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

"যদি তাদের সাধ্যে কুলায় তা হলে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে দেয়।"[৩৫৬]

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

"ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা কখনোই তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা তাদের ধর্ম অনুসরণ করো।"[৩৫৭]

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّـهِ بِأَفْوَاهِهِمْ

[৩৫৪] মুস্তাদরাক হাকিম : ২৩৯২
[৩৫৫] সূরা আল-বাকারাহ ২:১০৯
[৩৫৬] সূরা আল-বাকারাহ ২:২১৭
[৩৫৭] সূরা আল-বাকারাহ ২:১২০

"তারা আল্লাহর নূরকে মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত করে দিতে চায়।"[৩৫৮]

কতই-না বোকামি হবে যদি আমরা শত্রুদের শত্রুতার এই স্পষ্ট প্রমাণগুলো এড়িয়ে যাই, যদি তাদের আদর্শের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেওয়ার আগে তরবারিগুলো কোষবদ্ধ করে ফেলি। আমরা লড়াই না করলে কুফরও লড়াই করা বন্ধ করে দেবে, এমন ভাবাটা নিতান্ত বোকামি। এই বোকামোর ফল হলো দুটি পরাজয়; একটি দুনিয়ায়, আরেকটি আখিরাতে। কুফরের বাহিনী আমাদের জান ও ঈমান দুইই কেড়ে নেবে। তারা না আমাদের সম্মান করে, না কোনো চুক্তিকে সম্মান করে। সীরাত পড়লেই জানা যায় যে, রাসূল ﷺ এর সাথে চুক্তি করা কাফির গোষ্ঠীগুলো বারবার নিজেরা আগ বাড়িয়ে চুক্তি ভেঙেছে। আমরা আমাদের অস্ত্র খাপবদ্ধ রাখলেও তারা আমাদের মারবে। জিহাদের গুরুত্বের ব্যাপারে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। নবীজি ﷺ হিজরতের আগে অস্ত্রই ধরেননি। কিন্তু তাতে কিন্তু কুরাইশরা সাহাবাগণকে নির্যাতন ও হত্যা করা বন্ধ রাখেনি। এর কারণ আর কিছুই নয়। কারণ হলো নবীজি তাদের এই বলে আহ্বান করতেন যে, "আমি এক ভয়াবহ শাস্তির পূর্বে তোমাদের নিকট (প্রেরিত) একজন সতর্ককারী।"(আহমাদ) এবং "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।" রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রদর্শনের পরও কী কারণ থাকতে পারে কুরাইশদের এর অত্যাচারের? কারণ একটাই। তারা মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে চায়।

কুরাইশরা যখন রাসূল ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের পরিকল্পনা আঁচ করল, তারা সর্বশক্তি এক করে তাঁকে হত্যাচেষ্টা করল। অথচ নবীজি তো তাদের তাদের ভূমি, পরিবার ও মিথ্যে উপাস্যগুলো ছেড়ে দিয়েই যাচ্ছিলেন। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় নবীজি ﷺ নিরাপদে মদীনা পৌঁছান। কিন্তু তারপরও কুরাইশরা তাঁকে জীবিত বা মৃত ধরে আনার জন্য লোক পাঠায়। ইসলাম যদি কুফরের ভূমি ছেড়ে দূরেও চলে যায়, কুফর কখনো ইসলামকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। এজন্যই নবী ও সাহাবাগণকে শেষ করে দেওয়ার আশা নিয়ে কাফিররা ফিরে ফিরে এসেছে বদর, উহুদ আর খন্দকে।

শিশু অবস্থায় থাকা ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্যই আল্লাহ শুরুতে লড়াই করতে মানা করেছিলেন। যুদ্ধ নিষিদ্ধ থাকলেও আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে, দ্বীনকে ও দ্বীনের অনুসারীদের রক্ষা করেছেন। মদীনায় চলে আসার পর যুদ্ধের অনুমতি ও নির্দেশ দেওয়া হয়। তখন কোনো মুসলিমই বলেননি, "না থাক। আমরা বরং মক্কার জীবনের মতোই ক্ষমা করি ও ধৈর্য ধরি। আল্লাহই তাঁর দ্বীনকে বাঁচাবেন।" তাঁরা এমনটা বললে কুরাইশরা তাঁদেরকে নিঃশেষ করে দিত এবং ইসলামের কোনো নাম-নিশানাও আর থাকত না।

তারপর যখন সর্বাত্মক আক্রমণাত্মক জিহাদের বিধান আসলো, তখন মুসলিমরা এই

[৩৫৮] সূরা আত-তাওবা ৯:৩২

ভেবে ঘরে বসে থাকেননি যে আগের মতো শুধু রক্ষণাত্মক জিহাদ করলেই হবে। তাঁরা এমনটা করলে তাঁদের দাওয়াত কখনোই মদীনার বাইরে ছড়াতে পারত না। শত্রুভাবাপন্ন আরব সটান দাঁড়িয়ে থেকে ইসলামকে মদীনার বাইরে এক পা-ও ফেলতে দিত না, রোম-পারস্য তো অনেক দূরের কথা। উল্টো কুফরের বাহিনী এসেই এই মুষ্টিমেয় মুসলিমদের বিধ্বস্ত করে দিয়ে যেত।

কিন্তু এর কোনোটিই ঘটেনি। কারণ আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের এমন এক প্রজন্ম সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যারা বলবে, "আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।"[৩৫৯] এই প্রজন্মের কাঁধের ওপর ভর দিয়েই দাঁড়িয়েছে ইসলামের কেল্লা আর এই প্রজন্মের রক্তে ভিজেই ইসলামের জন্য উর্বর হয়েছে দূর-দূরান্তের ভূমি। ইতিহাস সাক্ষী, যখনই মুসলিমরা অবহেলা বা দুর্বলতাবশত পিঠটান দিয়েছে, তখনই জাহিলিয়াতের সেনারা পাল্টা আক্রমণে এসে ইসলামের ভূমি ও ঘরগুলোতে হামলে পড়েছে। ইতিহাসের একটি বড় শিক্ষা এই যে, আমরা ঠিক যেই বিন্দুতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই, কুফরের বাহিনী সেই বিন্দু থেকেই আমাদের ওপর চড়াও হওয়া শুরু করে। চীনের মহাপ্রাচীরে গিয়ে যখন ইসলামের বাহিনী থেমে গেল, তখনই সে দেওয়ালের পেছন থেকে রক্তের বন্যা নিয়ে ধেয়ে এল মঙ্গোলিয়ানরা। ধ্বংস করে দিল খিলাফাতের রাজধানীসহ বিস্তীর্ণ জনপদ।

ঠিক একই ঘটনা পশ্চিমেও। মুসলিম জয়যাত্রা যখন আন্দালুসিয়া ও দক্ষিণ ফ্রান্স পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়াল, তখনই আসতে লাগল পরাজয়। স্পেনের সেই একই জায়গা থেকে ক্রুসেডাররা তাদের রথের চাকা ঘোরানো শুরু করে। তাদের বাহিনী ও নৌবহর চষে বেড়াল কেপ অব গুড হোপ, দাপিয়ে বেড়াল লোহিত সাগর, পূর্ব উপকূলে নেমে নিশ্বাস ফেলতে লাগল হিজাযের ভূমিতে। একইভাবে উসমানীরা যখন ভিয়েনার ফটকে থেমে গেল, ইউরোপের মধ্যভাগ থেকে উঠে আসা সেনাবাহিনী ইস্তাম্বুলে এসে খিলাফাত ধ্বংস করে দিল আর ছিঁড়েখুঁড়ে খেলো মুসলিম সাম্রাজ্যকে।

ইতিহাস যেন আমাদের ডেকে ডেকে বলছে, "দেখো! তোমরা যদি সত্যের হয়ে লড়াই না করো, শত্রুরা কিন্তু ঠিকই মিথ্যের হয়ে লড়াই করবে। তোমরা যদি তাদের আক্রমণ না করো, তারা ঠিকই তোমাদের আক্রমণ করবে। তোমাদের তরবারি যদি আঁধার চিরে আলো না আনে, তাদের তরবারি ঠিকই আলো চিরে আঁধার নামিয়ে আনবে।" ইতিহাস জিহাদের বিধানের পক্ষে কথা বলে!

ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন, "সকল মুসলিম একমত যে যুদ্ধের বিধানের ভিত্তি হলো জিহাদ, যাতে দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় এবং তাঁর কালিমা সুউচ্চ হয়ে যায়। যে-কেউ জিহাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করা ইজমা অনুযায়ী

[৩৫৯] সূরা আল বাকারাহ ২:২৮৫

বাধ্যতামূলক। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষেধ, যেমন : নারী, শিশু, সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ, অন্ধ, জিযিয়া প্রদানকারী আহলে কিতাব, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা ও কাজ দিয়ে যুদ্ধ না করলে তাদের হত্যা করা হবে না।"[৩৬০]

এটিই জমহুর উলামার ইজমা। এর বিপরীতে কিছু আলিম এই মত পোষণ করেন যে, শুধুমাত্র কুফরের কারণেই এই সকল কাফিরদেরও হত্যা করা হবে। নারী ও শিশুরা বাদে, তারা গনিমাত হিসেবে হস্তগত হবে। যা-ই হোক, সঠিক মত হলো প্রথমটি। আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য শুধু তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হয়, যারা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আল্লাহ বলেন :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় সেই লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কিন্তু সীমা অতিক্রম কোরো না।"[৩৬১]

কারণ আল্লাহ শুধু ততটুকুই হত্যা করা বৈধ করেছেন, যতটুকু করলে মোটের ওপর কল্যাণ হয়। "ফিতনা হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর।"[৩৬২] এর অর্থ হলো কাফির কর্তৃক মুসলিমদের ওপর ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যা হতেও গুরুতর অপরাধ। যারা মুসলিমদেরকে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয় না, তারা ব্যক্তিগত জীবনে কুফরের মাধ্যমে কেবল নিজেদেরই ক্ষতি করছে। এ কারণে শরীয়ত কাফিরদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে যুদ্ধের অনুমতি দিলেও অসহায় নারী-শিশুদের বাদ দিয়েছে।

কোনো কাফির যদি জিহাদে মুসলিমদের হাতে বন্দি হয়, তা হলে মুসলিম শাসক তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী সবচেয়ে কল্যাণজনক সিদ্ধান্তটি নেবেন। দাস বানানো, মুক্ত করে দেওয়া, হত্যা করা, মুক্তিপণ নেওয়া বা মুসলিম বন্দির সাথে বিনিময় করা—এর মধ্যে যে-কোনো একটি বেছে নেওয়া জায়েয। এটিই কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী বেশিরভাগ আলিমের মত। কিছু আলিম অবশ্য মত দিয়েছেন যে, মুক্ত করা বা মুক্তিপণ নেওয়ার বিধান রহিত হয়ে গেছে। আহলে কিতাব ও মাজুসিদের ব্যাপারে বিধান হচ্ছে, তারা ইসলাম গ্রহণ বা জিযিয়া প্রদানের আগ পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। এ ছাড়া অন্যান্যদেরকে জিযিয়া প্রদানের সুযোগ দেওয়া হবে কি না, এ নিয়ে আলিমগণের মতপার্থক্য আছে। বেশিরভাগের মত হলো জিযিয়া নেওয়া হবে না।

এ ছাড়া এ ব্যাপারেও মুসলিম আলিমগণের ঐকমত্য আছে যে, মুসলিমদের মধ্যকার

[৩৬০] আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ, ১/১৫৯; মাজমু আল-ফাতাওয়া, ২৮/৩৫৪
[৩৬১] সূরা আল-বাকারাহ ২:১৯০
[৩৬২] সূরা আল-বাকারাহ ২:২১৭

কোনো গোষ্ঠী যদি ইসলামের এক বা একাধিক অকাট্য বিধান মেনে চলতে অস্বীকৃতি জানায়, তা হলে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা হবে। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধই এর প্রমাণ। অনেক হাদীস থেকে এটিও প্রমাণিত যে, খারিজিদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হবে। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা থেকে তাই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যারাই ইসলামি আইনের বাইরে পা ফেলবে, তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা হবে, যদিও তারা কালেমার সাক্ষ্য দেয়। এসকল গোষ্ঠী ইসলামের বার্তা পেয়ে গেছে। তাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আর তারা যদি আগ বাড়িয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শুরু করে, তা হলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আরো বড় ফরয হয়ে যায়।

কাফির এবং ইসলামের কিছু অংশ অস্বীকারকারীদের (যেমন খাওয়ারিজ ও যাকাত অস্বীকারকারী) বিরুদ্ধে জিহাদ আক্রমণাত্মকও হতে পারে, রক্ষণাত্মকও হতে পারে। প্রথমটির ক্ষেত্রে এটি ফরযে কিফায়া। মুসলিমদের একাংশ এ দায়িত্ব পালন করলে সকলেই দায়মুক্ত হয়ে যাবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে, শুধু তারাই তাদের কুরবানির কারণে এর ফযিলত ভোগ করবে। আল্লাহ সুবনহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً
ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾
دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾

> "অক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও বসে থাকা মুমিনরা আর জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারীরা সমান নয়। নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদকারীদেরকে বসে থাকা লোকদের ওপর আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ সকলের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন এবং মুজাহিদদেরকে বসে থাকা লোকদের তুলনায় মহাপুরস্কার দিয়ে আল্লাহ মর্যাদা দান করেছেন। ওটা আল্লাহর নিকট হতে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।"[৩৬৩]

কিন্তু শত্রুরা মুসলিমদের আক্রমণ করার চেষ্টা করলে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। যেসব মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়, আর অন্য সকল মুসলিম যারা সাহায্য করতে সক্ষম–উভয় দলের ওপর এই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

[৩৬৩] সূরা আন-নিসা ৪:৯৫-৯৬

وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ

"কিন্তু যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য চায়, তা হলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে তাদের বিরুদ্ধে নয়, যাদের সঙ্গে তোমাদের মিত্রতা চুক্তি আছে।"[৩৬৪]

নবীজি ﷺ-ও আমাদের আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা সেসব মুসলিমদের সাধ্যমতো সাহায্য করি, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে। রক্ষণাত্মক জিহাদে নিজের জানমাল বিলিয়ে দিয়ে ইসলাম এবং এর অনুসারীদের জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করার ব্যাপারে কারো কোনো অজুহাত গ্রহণীয় নয়। খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমরা এই দায়িত্বটিই পালন করেছেন। আক্রমণাত্মক জিহাদে যেমন কারো কারো ঘরে বসে থাকার অনুমতি আছে, এই যুদ্ধে আল্লাহ কাউকে সে অনুমতি দেননি। যারাই অব্যাহতি চেয়েছিল, তাদের তিরস্কার করে আল্লাহ বলেন :

وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

"আর তাদের একদল এই বলে নবীর কাছে অব্যাহতি চাচ্ছিল যে, 'আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত।' অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।"[৩৬৫]

এটি হলো দ্বীনের পবিত্রতা ও মুসলিমদের জীবন রক্ষা করার নিমিত্তে একটি বাধ্যতামূলক যুদ্ধ। রক্ষণাত্মক জিহাদের উদাহরণ বদর, উহুদ, খন্দক। আক্রমণাত্মক জিহাদের উদাহরণ হলো তাবুক ও অন্যান্য যুদ্ধ।

মুসলিমরা আজ এক ওপেন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। সসম্মানে বেঁচে থাকা, নয়তো অসম্মানে বেঁচে থাকা। এই চ্যালেঞ্জের জবাব হলো জিহাদ। আমরা মর্যাদা সহকারে বাঁচতে চাইলে অবশ্যই আমাদের আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে হবে। আর যদি আমরা অপমানের জীবন চাই, মৃত্যুকে ভয় করি আর জীবনকে ভালোবাসি, তা হলে জিহাদ ছেড়ে দিলেও সমস্যা নেই। ইসলামের জন্য কাজ করা সকলকেই রাস্তার এই বাঁকে থমকে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। কেউ ইতস্তত করেছে, পথভ্রষ্ট হয়েছে, পিঠটান দিয়ে চলে গেছে। আর কেউ দৃঢ়পদ থেকেছে, আল্লাহর রাস্তায় চলার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে। অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের অবশ্যই জিহাদের ফলাফল

[৩৬৪] সূরা আল-আনফাল ৮:৭২
[৩৬৫] সূরা আল-আহযাব ৩৩:১৩

ও দায়িত্বের কথা মাথায় রাখতে হবে। আমাদেরকে এর প্রস্তুতি নিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। আমাদের হাতে আর নষ্ট করার মতো মোটেও সময় নেই।

ঈমানের পতাকাতলে সমবেত হয়ে দৃঢ়ভাবে কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা, সহীহ আকীদার দুর্গে-বর্মে সুরক্ষিত থাকা এবং তাকওয়া ও নেক আমলের রসদ জমা করে রাখা ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই। আমাদের এক সুদীর্ঘ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে, যা চলবে সকল জাহিলি বিধান বিলুপ্ত হয়ে খিলাফাত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত। এরপর আমরা এক হাতে কুরআন, আরেক হাতে তরবারি নিয়ে অগ্রসর হব ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে। নিঃসন্দেহে এটি খুবই ভারী এক দায়িত্ব। কিন্তু আমাদের মধ্যকার সামর্থ্যবান লোকেদের ওপর এটি ফরয হয়ে আছে। এটি ত্যাগ করলে আমরা গুনাহগার হব। এই ফরয আদায়ের জন্য যেসব প্রস্তুতি নেওয়া দরকার, সেসব প্রস্তুতিও আরেকটি ফরয। আমাদেরকে একক মুসলিম নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। চলুন যুদ্ধ করি—"...আল্লাহর রাস্তায়; তাদের জন্য যারা দুর্বল, নিপীড়িত ও অত্যাচারিত পুরুষ, নারী ও শিশু; যারা দুআ করছে, 'হে আমাদের রব! আমাদের এই জনপদ থেকে উদ্ধার করুন। এখানকার অধিবাসীরা যে যালিম! আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কাউকে রক্ষাকারী বানিয়ে দিন এবং আপনার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী করে দিন।"[৩৬৬]

চলুন যুদ্ধ করি— "...যতদিন না ফিতনা নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহরই জন্য হয়ে যায়।"[৩৬৭]

চলুন যুদ্ধ করি— "এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, অতঃপর সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক, অচিরেই আমি তাকে মহা প্রতিফল দান করব।"[৩৬৮]

চলুন যুদ্ধ করি— "আর যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ করো, তবে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা অতি উত্তম, তারা যা সঞ্চয় করে তার চেয়ে।"[৩৬৯]

চলুন যুদ্ধ করি— "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত ভেবো না। বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের কাছে রিযিকপ্রাপ্ত।"[৩৭০]

চলুন যুদ্ধ করি— "সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রি করে, তারা

---

[৩৬৬] সূরা আন-নিসা ৪:৭৫
[৩৬৭] সূরা আল-আনফাল ৮:৩৯
[৩৬৮] সূরা আন-নিসা ৪:৭৪
[৩৬৯] সূরা আলে ইমরান ৩:১৫৭
[৩৭০] সূরা আলে ইমরান ৩:১৬৯

আল্লাহর পথে জিহাদ করুক।"[৩৭১]

চলুন যুদ্ধ করি— "হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন ব্যবসায়ের সন্ধান দেব যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তা হলো এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে যুদ্ধ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে!"[৩৭২]

৪. জামাত বা সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করা

জামাতের আলোচনায় প্রবেশ করার আগে আমাদের লক্ষ্য, এতে পৌঁছানোর পথ ও আমাদের প্রতি আমাদের শত্রুদের-অবস্থান-সম্পর্কিত আলোচনাগুলো আবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। এতে করে জামাতের পালনীয় ভূমিকা ও দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার গুরুত্ব অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আল্লাহ্ আদেশ করেন :

أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

"আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো এবং তাতে বিভক্তি সৃষ্টি কোরো না।"[৩৭৩]

আমরা আমাদের লক্ষ্যকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখিয়েছি। মানুষকে তাদের প্রতিপালকের ইবাদতের দিকে নিয়ে আসা এবং নবীজি ﷺ-এর দেখানো তরিকা অনুযায়ী খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করা।

যেই পথ ধরে চলে এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তা মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত। দাওয়াত, হিসবাহ এবং জিহাদ।

ভালো করে দেখলেই বোঝা যায় যে, এই পথটি ফুল দিয়ে ভরা নয়। এতে চলার জন্য অনেক আত্মত্যাগ প্রয়োজন। আমাদের এসব দুঃখ-কষ্ট দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে যেতে হবে এবং লক্ষ্যে পৌঁছানো পর্যন্ত শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে হবে।

শত্রুদের অবস্থান, সংখ্যা, শক্তি, দুর্বলতা, তাদের লক্ষ্য ও নেতাদের ব্যাপারে সব সময় আমাদের চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। আমাদের শত্রু অনেক। খ্রিষ্টান, ইহুদী, নাস্তিক, মূর্তিপূজারি, গো-পূজারি, অগ্নিপূজারি, মুরতাদ, মুনাফিক, মুসলিম নামধারী সেক্যুলার নেতা-নেত্রীর দল ও তাদের চ্যালা-চামুণ্ডা। তাদের অস্ত্রশস্ত্রও নানা রকম। গণমাধ্যম,

---

[৩৭১] সূরা আন-নিসা ৪:৭৪
[৩৭২] সূরা আস-সফ ৬১:১০-১১
[৩৭৩] সূরা আশ-শুরা ৪২:১৩

শিক্ষাব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও গণবিধ্বংসী অস্ত্রধারী সামরিক বাহিনী।

এই সব শত্রু তাদের সব অস্ত্র নিয়ে মুখিয়ে আছে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। যখনই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর রাস্তায় প্রথম পদক্ষেপ রাখব, তখনই তারা সর্বশক্তি নিয়ে হামলে পড়বে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে ও আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করে কখনো ক্লান্ত হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

"যদি তাদের সাধ্যে কুলায় তা হলে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে দেয়।"[৩৭৪]

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّـهِ بِأَفْوَاهِهِمْ

"তারা আল্লাহর নূরকে মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত করে দিতে চায়।"[৩৭৫]

এখন চলুন আমরা নিজেদের এই কয়েকটি প্রশ্ন করি।

আমরা কি একাকী এই রাস্তায় চলতে প্রস্তুত? আমরা কি নিজে নিজে দাওয়াত, হিসবাহ ও জিহাদের গুরুদায়িত্ব পালনে সক্ষম? আমরা কি একা একা এসকল শত্রুর মোকাবিলা করতে তৈরি? আমরা কি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এসব লক্ষ্য অর্জন করতে পারব?

সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো মানুষই এসব প্রশ্নের হ্যাঁ-সূচক উত্তর দেবে না। বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা কিছুতেই দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল আনবে না। কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েই আবার যাত্রায় ক্ষান্ত দিতে হবে। এ পথের পুরনো পথিক ও সহযাত্রীদের বাদ দিয়ে যে-ই একা একা চলার চেষ্টা করবে, সে-ই মহাবিপদে পড়বে। দিনশেষে এসব প্রচেষ্টা সামগ্রিক বিচারে নিষ্ফল হয়ে যাবে।

আমাদের এই পূর্ণাঙ্গ ও সর্বব্যাপী দিন হলো চূড়ান্ত জীবনব্যবস্থা। ঐক্য-অনৈক্যের নীতিমালার ব্যাপারে চুপ থেকে এই দ্বীন তার অনুসারীদের বিপদে ফেলতে পারে না। এ পথের সব বিপদে-আপদে, পথিকদের কাঁধে থাকা গুরুদায়িত্ব, শত্রুদের ভয়াবহতার ব্যাপারে আগাম সতর্কবার্তা দিয়েই দেওয়া হয়েছে এই দ্বীনে। ইসলামি আইন আমাদের এই চ্যালেঞ্জের যথাযথ জবাব সরবরাহ করে রেখেছে। জাহিলিয়াতের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার অত্যন্ত বাস্তবসম্মত নীতিমালা রয়েছে ইসলামে। আমাদের দায়িত্ব হলো পরিপূর্ণ মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে এই নীতিমালা জানা ও মেনে চলা। আল্লাহ

[৩৭৪] সূরা আল-বাকারাহ ২:২১৭

[৩৭৫] সূরা আত-তাওবা ৯:৩২

আমাদের আদেশ দেন :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

"আল্লাহর রজ্জুকে সমবেতভাবে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হোয়ো না।"[৩৭৬]

এই আয়াতের তাফসিরে ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের দলবদ্ধ থাকতে আদেশ দিয়েছেন এবং বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন। এ-সংক্রান্ত প্রচুর হাদীসও রয়েছে।"[৩৭৭]

কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সাম্মাক আল-হানাফিকে বলেন, "ওহে হানাফি! অবশ্যই জামাত (ঐক্য) বদ্ধ থাকো। কারণ পূর্বেকার জাতিগুলো তাদের অনৈক্যের কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা কি আল্লাহর এই বাণী পড়োনি? 'আল্লাহর রজ্জুকে সমবেতভাবে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হোয়ো না।'"[৩৭৮]

কুরতুবী আরো বলেন, "ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে তিনটি বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকেন ও তিনটি বিষয়ে অসন্তুষ্ট হন। তিনি যেসব বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকেন তা হলো—তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, তোমরা আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। যে তিনটি বিষয়ে তিনি অসন্তুষ্ট হন তা হলো—বেহুদা কথাবার্তা, অযথা প্রশ্ন ও অর্থ অপচয়।'[৩৭৯]

তাই আল্লাহ (মুসলিমদের) ওপর বাধ্যতামূলক করেছেন যে, তারা তাঁর কিতাব (কুরআন) আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং মতপার্থক্যের সময় এর দিকে রুজু হবে। তিনি আমাদের আদেশ দিয়েছেন ঐক্য রক্ষা করার এবং নিষেধ করেছেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে, যা পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে।"

কুরতুবী একই আয়াতের ব্যাপারে ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বক্তব্য উল্লেখ করেন, "(তিনি তাদের আদেশ দিয়েছেন) জামাতবদ্ধ থাকার। আল্লাহ তাআলা ঐক্যের

[৩৭৬] সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩
[৩৭৭] তাফসির কুরআনিল আযিম, ২/৮৯
[৩৭৮] আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, ৪/১৬৪
[৩৭৯] মুসলিম : ৪৫৭৮

আদেশ দেন ও অনৈক্যকে নিষেধ করেন। কারণ অনৈক্য হলো ধ্বংস আর ঐক্য হলো নাজাত।"

আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

"আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো এবং তাতে বিভক্তি সৃষ্টি কোরো না।"[৩৮০]

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

"এটাই আমার সরল পথ। অতএব, এর অনুসরণ করো। নানান পথের অনুসরণ কোরো না। তা হলে তোমরা তাঁর (আল্লাহর) পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে।"[৩৮১]

আলী ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না। কারণ ঐক্য হলো রহমত আর অনৈক্য হলো আযাব।"

আলোচ্য আয়াত দুটির ব্যাপারে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে জামাত বদ্ধ থাকার আদেশ দিয়েছেন এবং কলহ-বিবাদ ও অনৈক্য হতে নিষেধ করেছেন।" মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ ও অন্যান্যদের থেকেও ইবনু কাসির অনুরূপ বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

আমাদের দ্বীন আমাদের আদেশ দেয় :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"সৎকাজ ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো। আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য কোরো না।"[৩৮২]

ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ঐক্য ও সম্প্রীতির আদেশ দিয়েছেন এবং কলহ-বিবাদ ও অনৈক্য হতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা আদেশ করেছেন আমরা যেন পরস্পরকে সৎকাজ ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে সাহায্য করি এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য না করি।"[৩৮৩]

---

[৩৮০] সূরা আশ-শুরা ৪২:১৩
[৩৮১] সূরা আল-আনআম ৬:১৫৩
[৩৮২] সূরা আল-মাইদাহ ৫:২
[৩৮৩] মাজমু আল-ফাতাওয়া, ১১/৯২

আমাদের দ্বীন আমাদের আদেশ দেয়, "একজনের চেয়ে দুইজন উত্তম, দুইজনের চেয়ে তিনজন উত্তম এবং তিনজনের চেয়ে চারজন উত্তম। অতএব ঐক্যবদ্ধ (জামাত) থাকো।"[৩৮৪] এবং "ভেড়ার জন্য নেকড়ে যেমন, মানুষের জন্য শয়তান তেমন। সে দলছুট হওয়া ব্যক্তিদের আক্রমণ করে। অতএব, একাকী রাস্তা পরিহার করে জামাতের সাথে থাকো।"[৩৮৫]

আমাদের দ্বীন আরো বলে :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"মুমিন পুরুষ আর মুমিন নারী পরস্পরের আওলিয়া (সহায়ক, বন্ধু, সমর্থক)। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে।"[৩৮৬]

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّـهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

"যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারগণকে আওলিয়া হিসেবে গ্রহণ করবে, (সে দেখতে পাবে যে) আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।"[৩৮৭]

আমাদের দ্বীন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, জামাত হলো মুমিনদেরকে আওলিয়া হিসেবে গ্রহণ করার প্রকৃত চিহ্ন। সংঘবদ্ধ হয়ে সুপরিকল্পিত কাজ না করে ছন্নছাড়া হয়ে এলোপাথাড়ি কাজ করার অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করা।

এই আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, সকল বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে মান্য করার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হলো জামাতবদ্ধ থাকা। কিন্তু এগুলোই ঐক্যবদ্ধ থাকার একমাত্র কারণ নয়। ইসলামের একটি মূলনীতি হলো, "যেটি ব্যতিরেকে কোনো ফরয দায়িত্ব আটকে থাকে, সেটি অর্জন করাও ফরয।" দলবদ্ধ না হয়ে আল্লাহর অনেক হুকুমই পালন করা সম্ভব হয় না। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ফরয দায়িত্ব পালন করতে গেলেই আমরা এমন এক বাহিনীর মুখোমুখি হব যারা জাহিলিয়াত প্রতিষ্ঠা করতে চায়। পরিকল্পিত সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া এসকল বাহিনীকে প্রতিহত করা অসম্ভব। তাই উল্লেখিত মূলনীতি অনুযায়ী, মুসলিমদের জামাতবদ্ধ হওয়া, নেতা নিয়োগ করা, সঠিক জায়গায় সঠিক দক্ষতার লোক নিয়োগ করা সবই আমাদের ওপর ফরয।

উল্টোদিক থেকে বলা যায়, দলবিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ

[৩৮৪] আহমাদ : ২১২৯৩
[৩৮৫] আহমাদ : ২২০২৯
[৩৮৬] সূরা আত-তাওবা ৯:৭১
[৩৮৭] সূরা আল-মাইদাহ ৫:৫৬

ছুড়ে ফেলা। এর অর্থ দ্বীনের যেসব বিষয় পূরণ করতে দলবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন, সেগুলোকে অবজ্ঞা করা। আজকের জামানায় ইসলাম কেবল কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা, সামাজিক লেনদেন, সরকার, শাসনব্যবস্থা, যুদ্ধ, চুক্তি—এই সব ক্ষেত্রে ইসলামের বদলে জাহিলিয়াত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। জাহিলিয়াতের এই বিপুল সমাহারের সাথে আমাদের লড়াই করে টিকতে হলে সংগঠিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ওপরে যা যা বলা হলো, এর পরে মনে হয় না আর কারোই বুঝতে বাকি থাকার কথা যে জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী কাজ করলে কী কী ক্ষতি হয়। এভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ আসমানী হুকুম-আহকাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া; জিহাদ, হিসবাহ, দাওয়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া; ফিলিস্তিন, আন্দালুসিয়া সহ সকল মুসলিম ভূমিকে সেক্যুলারদের হাত থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। অজ্ঞদের শিক্ষাদান, অহংকারীকে উপদেশ দান, সৎকাজের আদেশ, জিহাদের প্রস্তুতি, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, আমাদের ভূমিগুলো মুক্ত করা, শরিয়া প্রতিষ্ঠা করা এ সবকিছুই দলবদ্ধ হয়ে করার মতো ইবাদত। ইতিহাসে কোনো আলিম কোনোকালেই এমন ফাতওয়া দেননি যে এগুলো ত্যাগ করে শুধুমাত্র সালাত, দুআ, যিকিরের মতো ব্যক্তিগত ইবাদতেই সীমাবদ্ধ হয়ে যেতে হবে।

আবু হামিদ গাযালি রাহিমাহুল্লাহ লিখেন, "জেনে রাখুন, যে-কেউ নিজেকে কেবল ঘরে বসে থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে, সে আজকের যুগে মন্দ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না। কারণ এমনটা করার মাধ্যমে সে মানুষকে পথ দেখানো, শিক্ষাদান, সৎকাজের আদেশ (ইত্যাদি দায়িত্বকে) অবহেলা করছে।"[৩৮৮]

গাযালি এসব কথা লিখেছেন তাঁর জীবনকালে, যখন খিলাফাহর অধীনে শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তা হলে আজকের অবস্থা চিন্তা করুন!

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর (ঘোষিত) পবিত্র জিনিসগুলোর পবিত্রতা লঙ্ঘিত হতে দেখে, তাঁর দেওয়া সীমা লঙ্ঘিত হতে দেখে, তাঁর দ্বীন পরিত্যক্ত হতে দেখে, তাঁর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে অবহেলিত দেখে, তারপরও নির্লিপ্ত থাকে, মেজাজ ঠাণ্ডা রাখে, নীরব শয়তানের মতো চুপ করে থাকে, তার মধ্যে আর কী কল্যাণ থাকতে পারে? এমন ব্যক্তিরা আল্লাহর ঘৃণা অর্জন করার পাশাপাশি সবচেয়ে খারাপ রোগে আক্রান্ত হয়। সেই রোগ হলো অন্তরের মৃত্যু। কারণ অন্তরের জীবনীশক্তি যত বেশি হয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে কিছু হতে দেখলে তা ততই রাগান্বিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। দ্বীনের জন্য ততই তার সমর্থ্যন ততই শক্তিশালী ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে

[৩৮৮] ইয়াইয়াউ উলুমুদ্দিন, ৩/৩৬৯

থাকে।"[৩৮৯]

তিনি আরও বলেন, "ইসলামের শত্রুদের কাছে ভীতি সৃষ্টিকারী একজন সাহসী, শক্তিশালী ব্যক্তির সেনাসারিতে দাঁড়িয়ে এক ঘণ্টা জিহাদ করাটা তার জন্য হাজ্জ, সাওম, দান-সদকা ও নফল ইবাদত থেকে উত্তম। ঠিক একইভাবে, সামাজিক জীবন ত্যাগ করে একাকী সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর যিকির করার চেয়ে উত্তম হলো মানুষের সাথে মেশা, সুন্নাহ-হালাল-হারাম-ভালো-মন্দের জ্ঞানসম্পন্ন আলিমের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা ও উপদেশ দান করা।"[৩৯০]

আমির আশ-শা'বী থেকে ইবনুল মুবারাক বর্ণনা করেন, কিছু লোক সামাজিক জীবন ত্যাগ করে ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য কুফা ত্যাগ করে চলে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের ব্যাপারে শুনে তাদের সাথে দেখা করতে গেলেন। তারা তাঁকে দেখে খুশি হলো। কিন্তু তিনি বললেন, "কীসে তোমাদের এমনটা করতে প্ররোচিত করল?" তারা বলল, "আমরা ইবাদত করার জন্য লোকেদের থেকে আলাদা হয়েছি।" আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বললেন, "সবাই যদি তোমাদের মতো এরকম করে, তা হলে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কারা? তোমরা আমার সাথে ফিরে না চলা পর্যন্ত আমি তোমাদের ত্যাগ করব না।"[৩৯১]

ইবনু মাসঊদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। তিনি এমন এক সময় এই কথা বলেছেন, যখন জিহাদ ছিল ফরযে কিফায়া। আজকের যুগে যখন জিহাদ ফরযে আইন, এসময় থাকলে তিনি কী বলতেন, ভাবুন!

এ ছাড়া বৈরাগ্যবাদীরা কীভাবে এই হাদীস অস্বীকার করতে পারে যেখানে নবীজি ﷺ বলেন, "আমার উম্মাতের মাঝে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শত্রুদের পরাজিত করতে থাকবে এবং বিরোধিতাকারীদের কোনো পরোয়া করবে না।"[৩৯২]

এই সকল বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কি পড়েনি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাগণকেই বৈরাগ্যবাদী হতে নিষেধ করেছেন? বলেছেন, "এটা কোরো না। কারণ আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) বের হয়ে যাওয়া তোমাদের ঘরে থেকে সত্তর বছর সালাত আদায় করার চেয়েও উত্তম। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান? আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো। কারণ যে ব্যক্তি উটের দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়

---

[৩৮৯] ই'লামুল মুওয়াক্কিয়িন, ২/১৯৮
[৩৯০] উদ্দাতুস সাবিরিন, ১/৯৩
[৩৯১] আয-যুহদ, বর্ণনা নং ১১০৪
[৩৯২] মুসলিম: ৫০৬৬

পরিমাণও আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, সে নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩৯৩]

সবশেষে আমরা আমাদের বৈরাগ্যবাদী ভাইদের জন্য শামের মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ-এর একটি কবিতা তুলে ধরছি। তিনি এটি লিখে পাঠিয়েছিলেন মক্কা-মদীনায় ইবাদতে মগ্ন থাকা মহান যাহিদ ফুজাইল ইবনু ইয়াজকে।

ও হারামাইনের আবিদ, যদি তুমি দেখতে মোদের,
তোমার ইবাদতকে ভাবতে—নিছক ছেলেখেলা শিশুদের।
তোমার গাল রাঙাচ্ছ তুমি অশ্রু ঝরিয়ে?
মোদের গলা তো যাচ্ছে রেঙে রুধির বরণ দিয়ে।
ওহে, অযথা ঘোড়ায় সফরকারী!
রণক্ষেত্রে নিতি চিরক্লান্ত ঘোড়াগুলো আমাদেরি।
তব গায়ে সুগন্ধী আতরদেয় রে সুবাস মেলি,
মোদের আতর তো ঘোড়ার খুরে ওড়ে আসা ধুলোবালি।
আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে মহানবীর অমীয় বাণী,
চিরসত্য যাহা, নেইকো তাহাতে সন্দেহের লেশখানি।
আল্লাহর রাহে ঘোড়া-খুরের ধূলি যে-জন মাখে গায়,
জাহান্নামী-ধোঁয়া তাহার সনে মিলবে না কভু হায়।
কিতাবুল্লাহ সদা সত্য কথা বলে যায় যে আমাদের—
কভু বোলো না মৃত, আল্লাহর তরে প্রাণ-দানকারীদের।

৫. শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত জামাত

যে জামাত আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করতে চায়, তাদের অবশ্যই শরীয়তের সকল দিক মেনে চলতে হবে। এর লক্ষ্য, বিশ্বাস, বুঝ ও কর্মকাণ্ড সবই হতে হবে শরীয়তসম্মত। শরীয়ত মেনে চলার কথাটি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে এর গুরুত্বের কারণে। এই যে আজকের কতিপয় ইসলামি আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, কোনোটি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে, কোনোটি আবার শত্রুদের সাথে সমঝোতায় আসছে, এই সবকিছুর কারণ হলো শরীয়তকে ঢিলেঢালাভাবে মানা অথবা এর সীমাগুলো লঙ্ঘন করা। ইসলামি কর্মকাণ্ড তো শরীয়ত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হতেই হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

[৩৯৩] তিরমিযি : ১৬৫০

অনেক ইসলামি দলই ধরে নিয়েছে যে ইসলামের জন্য কাজ করার মাধ্যমে তারা শরীয়তের সীমা ভেঙে যাচ্ছেতাই করার লাইসেন্স পেয়ে গেছে। এ কারণেই ইসলামি আন্দোলনের নাম দিয়ে অনেক অকাট্য হারাম কাজ প্রসার লাভ করছে আর অনেক অকাট্য ফরয অবহেলিত হচ্ছে। যেন ইসলামি আন্দোলনের চাহিদা পূরণের জন্য ইসলামি শরীয়ত যথেষ্ট নয়! এভাবে শরীয়ত লঙ্ঘন করে তারা এই আয়াত লঙ্ঘন করেছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে বেড়ে যেয়ো না। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর আওয়াজের ওপর তোমাদের আওয়াজ উচ্চ কোরো না।"[৩৯৪]

এ থেকেই দ্বীনের ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতা স্পষ্ট হয়ে যায়। আসল কথা হলো, শরীয়তের নীতিমালা মেনে চললে ইসলামি আন্দোলন যেই গতিতে সফল হতো, তা ইসলামি আন্দোলনকর্মীরা নিজেরাও ধারণা করতে পারবে না। আন্দোলনই যদি শরীয়তের অভিভাবক হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে ইসলামের ছদ্মবেশে তা নতুন এক জাহিলিয়াত হয়ে দাঁড়াবে।

জামাতের অধীনে থাকাকে ইসলামই ফরযে আইন করেছে। তাই জামাতের উচিত না সেই ইসলামেরই শরীয়তকে লঙ্ঘন করতে শুরু করা। নেতাদের ব্যক্তিগত মতামতের ওপরে ইসলামি শরীয়তকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। ইসলামি আন্দোলনকে সঠিক পথে রাখার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি করে বর্তায় মুত্তাকী, হক্কানী, আল্লাহর পথে জিহাদকারী আলিমগণের কাঁধে। দুনিয়ালোভী এবং সেক্যুলার শাসকদের চাটুকার আলিমদেরকে এই দায়িত্ব দেওয়া যাবে না।

আলিমগণের ওপর অর্পিত এই দায়িত্ব এতই স্পর্শকাতর যে, অন্য কোনো শ্রেণীর মানুষ এই দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম। তাঁদের ইসলামি আন্দোলনকে এমনভাবে পথ দেখাতে হবে যেন তা একইসাথে বাস্তবতার চাহিদাকেও নির্ভয়ে মোকাবিলা করতে পারে, আবার শরীয়তের সীমা-পরিসীমাও লঙ্ঘন না করে।

আলিমগণ যদি তাঁদের দায়িত্বে অবহেলা করেন, তা হলে অজ্ঞ লোকেরা এবং জ্ঞানী হওয়ার ভান করা লোকেরা এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে। আলিমের অভাবে নানা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে আন্দোলন দিশেহারা হয়ে যাবে। ফলে আন্দোলনের কর্মীদের

[৩৯৪] সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১-২

সামনে শরীয়তের বিধিবিধান অস্পষ্ট হয়ে যাবে। আজকের ইসলামি আন্দোলনগুলোর জন্য আহলুল ইলম রাহাবারের বড় প্রয়োজন, নাহলে কাফেলা পথ খুঁজে পাবে না।

ইসলামের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করা ব্যক্তিদের বুঝতে হবে যে আলিমগণ হলেন নবীগণের উত্তরসূরি। তাঁরাই উম্মাহর নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতম শ্রেণী। তাই চলুন, আমরা উলামায়ে কিরামকে তাঁদের প্রাপ্য স্থান বুঝিয়ে দেই। আল্লাহ বলেন :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝٩

"যারা জানে, আর যারা জানে না, তারা কি সমান? বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।"[৩৯৫]

৬. অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়া জামাত

فَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝٣٦

আল্লাহ তাআলা বলেন, "অতএব, জমিনে ভ্রমণ করে দেখো, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের কী পরিণতি হয়েছিল।"[৩৯৬]

যারা শিখতে চায়, তাদের জন্য ইতিহাস একটি অসাধারণ বিদ্যালয়। ইসলাম আমাদের অতীতের জাতিগুলোর ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে বলে। আল্লাহ তাআলার প্রতি কুফরি এবং গোঁয়ারের মতো তাঁর হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পরিণতি থেকে জ্ঞান আহরণ করতে বলে :

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّـهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝١٠١

"এসব জনপদের কিছু বিবরণ তোমাকে জানালাম। তাদের কাছে তো তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু যেহেতু তারা আগেই প্রত্যাখ্যান করে নিয়েছিল, এজন্য তারা আর ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না। এভাবেই আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে সীল লাগিয়ে দেন।"[৩৯৭]

আল্লাহর নিয়ামত ও সন্তুষ্টি হাসিল করতে চাওয়া সত্যিকার মুমিনদের চলার পথ

[৩৯৫] সূরা আয-যুমার ৩৯:৯
[৩৯৬] সূরা আন-নাহল ১৬:৩৬
[৩৯৭] সূরা আল-আরাফ ৭:১০১

আলোকিত করে আছে ইতিহাসের পাতার অসংখ্য আলোকবর্তিকা। এর মধ্যে সবচেয়ে আদর্শ হলো নবী ﷺ-এর সীরাত, যা থেকে একজন মুসলিমদের জীবনের প্রতিটি পদে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত জানতে পারা যায়।

উম্মাহর সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাসে হাজারো ঘটনা ঘটেছে। রাজ্য-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে সেনাবাহিনী। শত শত বছর যাবত ইসলামের সূর্য কখনো অস্তমিত হয়নি। তারপর একদিন ইহুদী-নাসারা-মূর্তিপূজারি-নাস্তিকদের সম্মিলিত কুফরি জোটের হাতে ১৯২৪ সালে খিলাফাতের পতন হয়ে মুসলিম উম্মাহ টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

ইসলামি খিলাফাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে আমাদের ইতিহাসের গতিধারা বুঝতে হবে। এর অনুসরণীয়-বর্জনীয় শিক্ষাগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে শিখতে হবে। আমাদের মহান লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় অতীত ও বর্তমানের ইসলামি আন্দোলনগুলোর ইতিহাস থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। তাদের যেসব কাজ শরীয়তসম্মত, তা গ্রহণ করতে হবে। তাদের ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আমাদের পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলো কেন ব্যর্থ হয়েছে, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। তাঁরা যেখানে থেমে গেছেন, সেখান থেকেই যেন আমাদের পথচলা শুরু হয়।

অধ্যয়নের উপযোগী কিছু ইসলামি আন্দোলন হলো আরব উপদ্বীপের আল-ওয়াহহাবিয়্যাহ, লিবিয়ার আস-সান্নুসিয়্যাহ, সুদানের আল-মাহদিয়্যাহ, ইখওয়ানুল মুসলিমীন ভাবধারার আন্দোলন এবং ফিলিপাইন, আফগানিস্তান, শাম, মিশর, আরব মাগরিব, বলকান ইত্যাদি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলন।

আমাদের পাথেয়

- তাকওয়া ও ইলম
- ইয়াকীন ও তাওয়াক্কুল
- শোকর ও সবর
- দুনিয়ার ওপর আখিরাতের প্রাধান্য

পথিকমাত্রই পাথেয়র মুখাপেক্ষী। পথ যত লম্বা হয়, পাথেয় তত বেশি লাগে। তা হলে আল্লাহ ও আখিরাতের দিকে যার সুদীর্ঘ যাত্রা, তার পাথেয় কতটুকু হওয়া উচিত? এই যাত্রার শেষে আছে জান্নাত নয়তো জাহান্নাম। তার যাত্রা শুরু হয় পৃথিবীর নানা পরীক্ষার ভেতর দিয়ে, মাঝে থাকে কবরের মাটি, আর শেষ হয় তার রব্ব এর হাতে গিয়ে। এই পথযাত্রীকে সাহায্য করতে পারে কোন সে পাথেয়? কীসে তাকে দিতে পারে পথের সকল বিপদ থেকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা? সে পাথেয় কি সম্পদ, সন্তান, মর্যাদা ও ক্ষমতা? আল্লাহর কসম! তার এসবের কিছুরই দরকার নেই। এসব দুনিয়াবি রসদ আখিরাতে তার থোড়াই কাজে আসবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾
يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ۜ ﴿٢٨﴾

> "কিন্তু যাকে তার আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, 'হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না-ই দেওয়া হতো! আর আমার হিসাব কী, তা যদি আমি না-ই জানতাম! হায় দুনিয়ার মৃত্যুই যদি আমার শেষ অবস্থা হতো! আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো কাজে আসলো না।'"[৩৯৮]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن
وَالِدِهِ شَيْئًا

---

[৩৯৮] সূরা আল-হাক্কাহ ৬৯:২৫-২৮

“হে মানবজাতি! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো আর ভয় করো সেই দিনের, যেদিন পিতা তার সন্তানের কোনো উপকার করতে পারবে না। সন্তানও পিতার কোনোই উপকার করতে পারবে না।”[৩৯৯]

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ۝٣٣ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝٣٤ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝٣٥ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝٣٦ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝٣٧

“অবশেষে যখন (শিঙ্গার কানা ফাটানো শব্দ) আসবে, সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাই থেকে, তার মা, তার বাপ, তার স্ত্রী ও তার সন্তান থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে।”[৪০০]

তাকওয়া (আল্লাহর প্রতি ভয়) না থাকলে এসবের কিছুই কাজে আসবে না :

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ

“তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে আর তাকওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।”[৪০১]

জ্ঞানও আমাদের পাথেয় :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّـهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“বান্দাদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।”[৪০২]

ইয়াকীনও আমাদের পাথেয় :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ۝٢٤

“আর যখন তারা ধৈর্য অবলম্বন করেছিল তখন আমি তাদের মধ্য হতে মনোনীত করেছিলাম নেতা—যারা আমার নির্দেশ মুতাবেক সৎপথপ্রদর্শন করত, আর তারা আমার আয়াতসমূহের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস (ইয়াকীন) রেখেছিল।”[৪০৩]

---

[৩৯৯] সূরা লুকমান ৩১:৩৩
[৪০০] সূরা 'আবাসা ৮০:৩৩-৩৭
[৪০১] সূরা আল-বাকারাহ ২:১৯৭
[৪০২] সূরা ফাতির ৩৫:২৮
[৪০৩] সূরা আস-সাজদাহ ৩২:২৪

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা বা আস্থা রাখাও আমাদের পাথেয় :

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

"যে-কেউ আল্লাহর ওপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।"[৪০৪]

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাও আমাদের পাথেয় :

مَّا يَفْعَلُ اللَّـهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ

"তোমরা যদি শোকরগুজারি করো এবং ঈমান আনো, তা হলে তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কী করবেন?"[৪০৫]

ধৈর্যও আমাদের পাথেয় :

إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

"আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[৪০৬]

যুহদ বা দুনিয়াবিমুখিতাও আমাদের পাথেয় :

"দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও, তা হলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন। মানুষের কাছে যা (দুনিয়াবি সম্পদ) আছে, তার প্রতি অনাসক্ত হও। তা হলে মানুষও তোমাকে ভালোবাসবে।"[৪০৭]

আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়াও আমাদের পাথেয় :

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿١٩﴾

"আর যে-কেউ আখিরাত কামনা করে ও এর জন্য যথাযথভাবে চেষ্টাসাধনা করে, অতপর সে হয় মুমিন, এদের চেষ্টাসাধনাই সাদরে গৃহীত হবে।"'[৪০৮]

আল্লাহ ও আখিরাতের দিকে যাত্রায় আমাদের এই পাথেয়গুলোই কাজে আসবে। আল্লাহর নির্দেশিত হালাল-হারাম মেনে চলা এবং বিপদ-আপদ সহ্য করার ক্ষেত্রে

---

[৪০৪] সূরা আত-তালাক ৬৫:৩
[৪০৫] সূরা আন-নিসা ৪:১৪৭
[৪০৬] সূরা আল-বাকারাহ ২:১৫৩
[৪০৭] ইবনু মাজাহ : ৪১০২
[৪০৮] সূরা আল-ইসরা' ১৭:১৯

এগুলো আমাদের সাহায্য করবে। এই পাথেয়গুলোর দ্বারাই আমরা শত্রুদের পরাজিত করতে পারব, জাগতিক উন্নতি লাভ করতে পারব এবং আল্লাহর সাহায্য লাভের যোগ্য হব। একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলিমের ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য এসব পাথেয় হলো মৌলিক উপাদান।

কুফরের সর্বগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে সংখ্যা ও শক্তির বিচারে আমরা অনেক পিছিয়ে। আমাদের শত্রুদের কব্জায় আছে সকল দুনিয়াবি অস্ত্র এবং ভৌগলিক কর্তৃত্ব। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“নিশ্চয় যালিমরা পরস্পরের আওলিয়া' (সাহায্যকারী, রক্ষক, বন্ধু)।”[৪০৯]

কিন্তু আমাদের কী আছে?

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

“আর আল্লাহ হলেন মুত্তাকীগণের ওলি (সাহায্যকারী, রক্ষক, বন্ধু)।”[৪১০]

নিশ্চয় আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম সাহায্যকারী।

وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾

“আল্লাহ হলেন শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।”[৪১১]

আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা সামর্থ্য অনুযায়ী শত্রুর বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রস্তুতি নিই। কিন্তু আমরা যত বস্তুগত প্রস্তুতিই নিই না কেন, শত্রুদের তুলনায় তা হবে নিতান্তই তুচ্ছ। তা হলে আমরা কী করতে পারি? আমরা এই কারণেই জয়লাভ করব যে, আমাদের যেসব পাথেয় আছে তা শত্রুদের কাছে নেই। এই পাথেয়গুলোই তাদের সাথে আমাদের সামর্থ্যের এই বিশাল ফারাক মিটিয়ে দিয়ে এনে দেবে কাঙ্ক্ষিত বিজয়।

আমরা তাকওয়ার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কবিরা-সগিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকব। ফরযের সাথে নফল আমল করে বাড়াব আমাদের শক্তি। নবীজি ﷺ বলেন, আল্লাহ বলেছেন,

“যে আমার কোনো ওলির সাথে শত্রুতা করে, তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করি। আমার বান্দা আমার নিকট প্রিয় যে কাজের দ্বারা আমার নৈকট্য সবচেয়ে বেশি লাভ করে, তা হলো

[৪০৯] সূরা আল-জাসিয়াহ ৪৫:১৯
[৪১০] সূরা আল-জাসিয়াহ ৪৫:১৯
[৪১১] সূরা ত-হা ২০:৭৩

ফরয ইবাদতসমূহ। এরপর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। আমি যখন তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার শ্রবণক্ষমতা হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, আমি তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, সেই হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে, তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। আর সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায়, তা হলে অবশ্যই তাকে আশ্রয় দান করি।”[৪১২]

আমরা শত্রুর মুখোমুখি হব দ্বীনি জ্ঞানের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। ফলে আমরা পথভ্রষ্ট হব না এবং আল্লাহর মনোনীত পন্থায় ইবাদত করতে পারব। এই দ্বীনের জন্য আল্লাহর সাহায্য আসার ব্যাপারে আমরা সুনিশ্চিত থাকব। এই ইয়াকীন আমাদের উৎসাহিত করবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার জন্য। আমরা যদি পথ চলতে গিয়ে বিপদে পড়ি, তা হলে সবর করব। আর যদি ভালো কিছু পাই, তা হলে মহান দাতা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হব, যেমন কৃতজ্ঞতা তাঁর পাওনা, তিনি মহান ও সুউচ্চ। আমরা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করে দেব। শত্রুরা যেভাবে জীবন ভালোবাসে, আমরা সেভাবে মৃত্যুকে ভালোবাসবো। এতকিছুর পরও আমাদের কি আর পরাজিত হওয়া সম্ভব?

১. তাকওয়া

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।”[৪১৩]

তাকওয়া হলো মুসলিম জামাতের জন্য অপরিহার্য এক পাথেয়। দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আমাদের সকল প্রচেষ্টা আল্লাহ ব্যর্থ করে দেবেন যদি আমরা তাকওয়া অর্জন না করি। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দুই ছেলে নিজ নিজ কুরবানি পেশ করেছিলেন। আল্লাহ একজনেরটি গ্রহণ করে অপরজনেরটি প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ—

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّـهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের কুরবানিই কবুল করেন।”[৪১৪]

এই তাকওয়ার কারণেই একজনের কুরবানি আল্লাহর সন্তুষ্টির যোগ্য হয়েছিল, আর আরেকজনের কুরবানি এই তাকওয়ার অভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসে। কথা-কাজে

[৪১২] বুখারি : ৬৫০২

[৪১৩] সূরা আলে ইমরান ৩:১০২

[৪১৪] সূরা আল-মাইদাহ ৫:২৭

সক্রিয় কত মানুষের যে সকল প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যাত হয় তাকওয়ার আলোয় আলোকিত না হওয়ার কারণে!

এ ছাড়াও দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের কাজকর্মের সফলতার পূর্বশর্ত হলো তাকওয়া। মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন :

اسْتَعِينُوا بِاللَّـهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّـهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

"তোমরা আল্লাহর সাহায্য কামনা করো আর ধৈর্য অবলম্বন করো। জমিনের মালিক হলেন আল্লাহ। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে, তাকেই তার উত্তরাধিকারী বানাবেন। কল্যাণময় শেষ পরিণাম হচ্ছে মুত্তাকীদের জন্য।"[৪১৫]

জমিনে ক্ষমতা-প্রতিপত্তি লাভ করার মাধ্যম হলো তাকওয়া :

الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

"শুভ পরিণতি মুত্তাকীদের জন্যই নির্দিষ্ট।"[৪১৬]

পারসিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় মুসলিম সেনাপতি সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে পাঠানো এক চিঠিতে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখেছেন, "আমি আপনাকে ও আপনার সৈনিকদের তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিচ্ছি। এটিই শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রস্তুতি এবং সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। আমি নির্দেশ দিচ্ছি যেন আপনি ও আপনার সৈনিকরা শত্রুদের বিরুদ্ধে সতর্ক হওয়ার চেয়ে নিজেদের গুনাহর বিরুদ্ধে অধিক সতর্ক হোন। কারণ গুনাহকেই শত্রুদের চেয়ে বেশি ভয় করা উচিত। নিশ্চয় মুসলিমরা জয়লাভ করে তাদের শত্রুদের গুনাহের কারণে। নাহলে আমরা শক্তিসামর্থ্যে তাদের ওপর কোনো প্রাধান্যই বিস্তার করতে পারতাম না। আমাদের সংখ্যা ও রসদ তাদের সংখ্যা ও রসদের মতো নয়। আমরা যদি গুনাহে তাদের সমান হয়ে যাই, তাহলে তাদের শারিরীক শক্তির মাধ্যমে তারা আমাদেরকে হারিয়ে দেবে। আমরা যদি তাদেরকে তাকওয়ায় হারাতে না পারি, তা হলে শক্তি দিয়ে কখনোই তাদেরকে হারাতে পারব না।"

তাকওয়া অবলম্বনের শর্তেই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছে আসমানী সাহায্য পাঠান:

بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ

[৪১৫] সূরা আল-আরাফ ৭:১২৮
[৪১৬] সূরা হুদ ১১:৪৯

الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

"হ্যাঁ, যদি তোমরা সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তাহলে যে মুহূর্তে দুশমন তোমাদের ওপর চড়াও হবে ঠিক তখনি তোমাদের রব বিশেষভাবে চিহ্নিত পাঁচ হাজার ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন।"[৪১৭]

মু'তার যুদ্ধের দিন আদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্যই বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম! আমরা আমাদের সৈন্যসংখ্যা বা প্রস্তুতির জোরে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করি না। আমরা সেই দ্বীনের জোরে লড়াই করি যা দিয়ে আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেছেন।"[৪১৮]

আমাদের শত্রুদের সাথে সংখ্যা-সামর্থ্যে আমাদের বিশাল ফারাক। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ব্যবধান কাটিয়ে ওঠার জন্য এমন এক জিনিস দিয়েছেন, যা আমাদেরই শত্রুদের ওপর বিজয়ী করে ছাড়ে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّـهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তা হলে তিনি তোমাদের ফুরকান (ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্য করার শক্তি) প্রদান করবেন।"[৪১৯]

ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ফুরকান হলো ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারা।"[৪২০]

ফুরকানের মাধ্যমে আমরা মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক করি। এর মাধ্যমে আমরা হক অনুযায়ী কাজ করি ও বাতিল পরিহার করি। আর এর মাধ্যমে আমরা হককে সাহায্য করে বাতিলের ওপর জয়লাভ করি।

ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহর যে আদশ দিয়েছেন তা পালন করা ও তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য বোঝার সামর্থ্য দেবেন। এই জ্ঞানের মাধ্যমে সে বিজয়, নিরাপত্তা ও দুনিয়াবি কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করবে। এ ছাড়াও সে কিয়ামতের

---

[৪১৭] সূরা আলে ইমরান ৩:১২৫

[৪১৮] ফিকহুন নাসর, ১/৪৪৬

[৪১৯] সূরা আল-আনফাল ৮:২৯

[৪২০] কুরতুবি, ৭/৩৯৬

দিন শাস্তি ও গুনাহ থেকে মাগফিরাত লাভ করবে।"[৪২১]

উম্মাহর আজকের এই দুর্বল, পশ্চাৎপদ ও লাঞ্ছনাকর অবস্থা থেকে উত্তরণের আসল চাবিকাঠি হতে পারে তাকওয়া। এই একটি হাতিয়ারকে সঠিকভাবে ধরতে পারলেই বিজয়ের সকল মাধ্যম আমাদের সামনে হাজির হয়ে যাবে, অদৃশ্য হয়ে যাবে পরাজয়ের সকল মাধ্যম। যে জিনিস আমাদের হাতে ধরে হকের কাছে নিয়ে যায়, হককে ভালোবাসতে শেখায়, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হকের পক্ষে কাজ করার অনুপ্রেরণা জোগায়, সেটি হলো তাকওয়া। পথভ্রষ্টতার বিরুদ্ধেও এটি শক্তিশালী বর্ম। আল্লাহর ইচ্ছায় এই তাকওয়াই আমাদের সকল বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করে।

وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

"আর যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য কোনো না কোনো পথ বের করে দেবেন।"[৪২২]

وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

"আর যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন।"[৪২৩]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আদেশ মেনে চলা আপাতদৃষ্টিতে কঠিন হলেও তাকওয়ার শক্তিতে সেগুলো একেবারেই সহজ হয়ে যায়। মুসলিমদের জামাতে নেতার যেসকল নির্দেশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে যায় না, সেই সব নির্দেশ আনুগত্যের সহিত মেনে চলতেও সাহায্য করে তাকওয়া। আল্লাহ তাআলা হুকুম করেন :

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

"তোমরা পাথেয় গ্রহণ করো আর তাকওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানীরা! আমাকেই ভয় করতে থাকো।"[৪২৪]

তাকওয়াকে আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয় বলেছেন। এই পাথেয়ই যদি হারিয়ে যায়, তা হলে কাফেলা আর এক কদমও আগে বাড়তে পারবে না। নবীজি ﷺ কত চমৎকার এক কথাই না বলেছিলেন সফরে বের হতে চলা কয়েকজন সাহাবাকে, "আল্লাহ তোমাদের তাকওয়ার রসদ দান করুন।" তিনি আসলে তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে,

---

[৪২১] তাফসির ইবনু কাসির, ৪/৪৩
[৪২২] সূরা আত-তালাক ৬৫:২
[৪২৩] সূরা আত-তালাক ৬৫:৪
[৪২৪] সূরা আল-বাকারাহ ২:১৯৭

তাকওয়াই হলো মুমিনের সকল সফরের পাথেয়। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাকওয়ার সংজ্ঞায় বলেন, "তাকওয়া হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভয় করা, কুরআন অনুযায়ী কাজ করা, সামান্য যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, আর মৃত্যুদিনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।"

ইরবায ইবনু সারিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ এমন খুতবা দিলেন যে আমাদের অন্তর ভীত হয়ে গেল, চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেল। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে যেন এটি শেষ খুতবা। তাই আমাদের কিছু উপদেশ দিয়ে যান।' রাসূল ﷺ বললেন, 'আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করার (তাকওয়া অবলম্বন করার)...।"[৪২৫]

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বললাম আমাকে কিছু উপদেশ দেওয়ার জন্য। তিনি বললেন, 'তাকওয়া অবলম্বন করো, কারণ এটি সব বিষয়ের চূড়া। আর জিহাদকে আঁকড়ে থাকো, কারণ এটিই ইসলামের বৈরাগ্যবাদ।"[৪২৬]

নবীজি ﷺ-এর রীতি ছিল, যাকেই তিনি কোনো সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ করতেন, তাকেই তিনি তার নিজের ব্যাপারে ও সাথের সৈনিকদের ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিতেন। তাকওয়ার বিশাল গুরুত্বের কারণেই সালাফগণ পরস্পরকে তাকওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর আগে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে খিলাফাতের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। সেই সাথে দেন অসাধারণ কিছু উপদেশ। সেই উপদেশমালা শুরু হয় এভাবে, "হে উমর! আল্লাহকে ভয় করো।"[৪২৭]

উমর তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহুর আনহু কাছে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেন, "আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করার জন্য, যিনি তাদের রক্ষা করেন যারা তাঁকে ভয় করে। তাদের পুরস্কৃত করেন, যারা তাঁকে উত্তম ঋণ প্রদান করে। তাদের আরো বাড়িয়ে দেন, যারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাকওয়ার দিকে মনোযোগ দাও। একে তোমার হৃদয়ের আলোয় পরিণত করো।"

কিন্তু মুত্তাকী আসলে কারা? তাঁদের বৈশিষ্ট্যই বা কী কী?

মুআয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "কিয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে,

---

[৪২৫] আবু দাউদ : ৪৬০৯, তিরমিযি : ২৬৭৬

[৪২৬] আহমাদ : ১১৭৭৪

[৪২৭] কানযুল উম্মাল : ৩৫৭১৭, জামিউল আহাদিস : ২৭৮৮৫

'মুত্তাকীরা কোথায়?' তারপর মুত্তাকীগণ রহমানের ছায়ার নিচে উঠে দাঁড়াবে, যিনি তাদের কাছ থেকে নিজেকে গোপন করবেন না।" মুআযকে জিজ্ঞেস করা হলো, "মুত্তাকী কারা?" তিনি জবাব দেন, "যারা শিরক ও গাইরুল্লাহর পূজা থেকে বিরত থাকে এবং যাবতীয় ইবাদতকে আল্লাহর জন্য খালিস করে।"[৮২৮]

হাসান বাসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মুত্তাকী হলো তারা, যারা আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত জিনিস থেকে বিরত থাকে এবং তাঁর আদেশ পালন করে।"[৮২৯]

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "সত্যিকারের তাকওয়া হলো বান্দা আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করবে যে অণু পরিমাণ মন্দও এড়িয়ে চলবে এবং সন্দেহজনক হালাল থেকেও বিরত থাকবে।"[৮৩০]

সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তাঁদেরকে মুত্তাকী বলার কারণ হলো—অন্যেরা যা এড়িয়ে চলে না, তাঁরা তাও এড়িয়ে চলেন।"[৮৩১]

মাইমুন বিন মিহরান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কৃপণ ব্যক্তি তার (ব্যবসায়িক) অংশীদারের সাথে যতটা কড়া, মুত্তাকী নিজের (আমলের) হিসাব-নিকাশ গ্রহণে তার চেয়ে বেশি কড়া।"[৮৩২]

মুত্তাকী তো তাঁরাই, যারা ধার্মিকতা ও ভালোত্বের সবকিছুর অধিকারী। নবীজি ﷺ যথার্থই বলেছেন, "আল্লাহকে ভয় করো। কারণ তাকওয়া সকল ভালোর সমষ্টি।"[৮৩৩] নবীজি ﷺ আরো বলেন, "তাকওয়া এইখানে।" এই বলে তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার দেখান।"[৮৩৪]

তা হলে আমাদের অন্তরকে কীভাবে আমরা তাকওয়ার রসদ দিয়ে তাজা করতে পারি?

উমর বিন আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ একবার এক ব্যক্তির কাছে লিখেন, "আমি তোমাকে তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি। কারণ তাকওয়া ছাড়া আল্লাহ কিছুই কবুল করেন না। তাকওয়া অবলম্বনকারীদেরই তিনি রহম করেন। এর জন্যই পুরস্কৃত করেন। এর কারণ হলো, তাকওয়ার প্রচারকারী অনেক আর তাকওয়া অবলম্বনকারী

---

[৮২৮] তাফসির ইবনু আবি হাতিম, বর্ণনা নং ৫৯
[৮২৯] দুররুল মানসুর, ১/৫৮
[৮৩০] ফাতহুল বারি, ১/১৫
[৮৩১] আত-তারিক ইলাল জান্নাহ, ১/২৬০
[৮৩২] জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, ১/১৫৯
[৮৩৩] মু'জামুত তাবারানি : ৯৪৯
[৮৩৪] আহমাদ : ৮৭২২

স্বল্প।"[৪৩৫]

হ্যাঁ, তাকওয়া অবলম্বন করা কঠিন বটে। কিন্তু যারা খোলা অন্তর নিয়ে আল্লাহর দিকে যায়, তাদের জন্য তা খুবই সহজ। সেই দিকে যাওয়ার প্রথম ধাপ হলো অন্তরকে বাতিল ও গায়রুল্লাহর কলুষতা থেকে মুক্ত করা। যাতে অন্তরের সব আনুগত্য, স্মরণ, কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা, ভয় ও নির্ভরতা কেবল আল্লাহর প্রতিই থাকে। অন্তর হলো পাত্রের মতো। একবার তা কোনোকিছু দিয়ে পূর্ণ করা হয়ে গেলে সেই জিনিস পুরোপুরি বের না করে একে অন্য কিছু দিয়ে পূর্ণ করা যায় না। একইভাবে, অন্তর থেকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছুর দাসত্ব সমূলে উপড়ে ফেলার আগে কিছুতেই তাতে আল্লাহর দাসত্ব প্রবেশ করে না।

যেসব অন্তর দুনিয়াবি জীবনের প্রতি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ, সেগুলো আল্লাহ থেকে অনেক দূরে। কুপ্রবৃত্তি, শিরক আর গায়রুল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ অন্তরগুলোও আল্লাহ থেকে দূরে। কাজেই যারা আল্লাহকে রব্ব হিসেবে পেতে চায় এবং অন্তরে তাঁর প্রতি আশা, ভয় ও ভালোবাসা আনতে চায়, তাদের উচিত ওইসব কলুষ হতে তার অন্তরকে পবিত্র করা।

এই অবস্থা অর্জনের উপায় হলো :

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا

> "বলো, 'আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি; আল্লাহর জন্য তোমরা একা একা এবং দু'জন দু'জন মিলে নিজেদের মাথা ঘামাও এবং চিন্তা করো।"[৪৩৬]

আল্লাহর প্রতি এরকম আত্মনিবেদন সম্ভব হয় হৃদয়কে তাঁর উদ্দেশ্যে জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে। কুরআন ও বিশ্বজগতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁর নিদর্শনগুলো নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করার মাধ্যমে। এই চিন্তাভাবনার ফলে অন্তর বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। মিথ্যা উপাস্যরা— "...ক্ষমতা রাখে না নিজেদের ক্ষতি বা উপকার করার; আর ক্ষমতা রাখে না মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থানের ওপর।"[৪৩৭]

অন্তর দেখতে পাবে যে, সারা বিশ্বজগৎ আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তিনি প্রজ্ঞাময়, সবকিছুর ব্যাপারে ওয়াকিবহাল, সর্বজ্ঞ, শ্রেষ্ঠতম দয়ালু ও সর্বশক্তিমান।

---

[৪৩৫] জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, ১/১৬১

[৪৩৬] সূরা সাবা ৩৪:৪৬

[৪৩৭] সূরা আল-ফুরকান ২৫:৩

কিন্তু এই জ্ঞানই কি অন্তরকে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণভাবে সমর্পিত করতে পারার জন্য যথেষ্ট? সুস্থ অন্তরের জন্য তা তো যথেষ্ট অবশ্যই। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে মিথ্যা উপাস্যদের উপাসনা করা অসুস্থ অন্তর সেগুলোর অসারতা টের পাওয়ার পরও অভ্যাসবশত সেগুলোর উপাসনা করে চলে। এই রোগের ঔষধ তা হলে কী? এর ঔষধ হলো একটু থেমে চিন্তাভাবনা করা। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব আর আখিরাতের চিরস্থায়িত্ব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা। নিজেকে জিজ্ঞেস করা যে, কোনটি আসলে বেশি মনোযোগ পাওয়ার দাবিদার। কবরের একাকী জীবন নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে, যেখানে সঙ্গী হিসেবে শুধু নেক আমল আর বদ আমল। নবীজি ﷺ বলেন, "তিনটি জিনিস মৃতের সাথে সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যায়। এদের মাঝে দুটি ফিরে আসে, আরেকটি তার সাথে রয়ে যায়। পরিবার, সম্পদ ও আমল তার সাথে যায়। তারপর পরিবার ও সম্পদ ফিরে আসে। আর তার আমল তার সাথে থেকে যায়।"[৪৩৮]

মহান প্রতিপালকের সামনে একাকী দাঁড়ানোর সেই দিবসটির ব্যাপারে ভাবতে হবে:

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

> "তোমরা আমার নিকট তেমনই নিঃসঙ্গ অবস্থায় হাজির হয়েছো, যেমনভাবে প্রথমবার আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে যা দান করেছিলাম, তোমরা তা তোমাদের পেছনে ফেলে রেখে এসেছ। আর তোমাদের সাথে সেই সুপারিশকারীদেরকেও দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমরা ধারণা করতে যে তোমাদের কার্য উদ্ধারের ব্যাপারে তাদের অংশ আছে। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেছে, আর তোমরা যেসব ধারণা করতে, সেসব অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।"[৪৩৯]

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

> "আসমান ও জমিনের সবাই দয়াময়ের নিকট বান্দা হয়ে হাজির হবে।"[৪৪০]

তাকে ভাবতে হবে প্রতিপালকের সামনে একাকী দাঁড়ানোর পর সে যে-কোনো একটি গন্তব্যের দিকে যাবে। হয় অনন্ত প্রজ্বলিত জাহান্নাম; নয়তো আসমান-জমিনের মতো

---

[৪৩৮] বুখারি : ৬৫১৪, মুসলিম : ৭৬১৩
[৪৩৯] সূরা আল-আনআম ৬:৯৪
[৪৪০] সূরা মারইয়াম ১৯:৯৩

প্রশস্ত জান্নাত, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, কোনো অন্তর চিন্তাও করেনি।

আল্লাহ যখন কোনো বান্দার ভালো চান, তখন তার অন্তরকে এভাবে জাগ্রত করে তোলেন। তাকে চিন্তাভাবনা করতে শেখান। তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে শেখান। বান্দার অন্তর তখন রব্বের প্রতি এক আমৃত্যু সেজদায় পড়ে যায়। অবশেষে মহান রব্ব তার শ্রেষ্ঠতম নেক আমলগুলো কবুল করে নেন এবং নিকৃষ্টতম বদ আমলগুলো মাফ করে দেন।

এটিই অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার তরিকা। আল্লাহর জন্য সমর্পিত অন্তরগুলোই সত্যিকারের মুত্তাকী। অন্তর তাকওয়া অর্জন করবে, অথচ শরীর সে অনুযায়ী কাজ না করলেও চলবে—এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। বরং অন্তরের ওপর শরীরের প্রভাব ব্যাপক। তাই নফস খুব করে চাইলেও শরীরকে গুনাহের দিকে ধাবিত হতে দেওয়া যাবে না। কঠোর মুজাহাদার মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে হবে। তখন আল্লাহ তাঁর আনুগত্যকে বান্দার কাছে প্রিয় করে তুলবেন, আর তাঁর অবাধ্যতাকে করে তুলবেন তার কাছে ঘৃণিত :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّـهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

“আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদের অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।”[৪৪১]

২. ইলম

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“বলো, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?”[৪৪২]

لَقَدْ مَنَّ اللَّـهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন, যখন তিনি তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। সে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনাচ্ছে, তাদের পরিশোধন করছে,

[৪৪১] সূরা আল-আনকাবূত ২৯:৬৯

[৪৪২] সূরা আয-যুমার ৩৯:৯

তাদের কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিচ্ছে, যদিও তারা পূর্বে সুস্পষ্ট গোমরাহিতে ছিল।"[৪৪৩]

সত্যকে তুলে ধরা, আল্লাহর বিধিনিষেধ মেনে চলা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা, আল্লাহর দ্বীনের জন্য লড়াই করা, খিলাফাত প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টারত, মানুষকে প্রতিপালকের ইবাদতের দিকে আনতে চাওয়া জামাতের জন্য ইলম বা দ্বীনি জ্ঞান অপরিহার্য। তাদের কর্মকাণ্ড নির্ধারিত হতে হবে সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে।

এই দায়িত্ব জামাত পেয়েছে স্বয়ং নবীজি ﷺ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে। তাই অবশ্যই জ্ঞানকে এই যাত্রার পাথেয়তে পরিণত করতে হবে। নবীজি ﷺ বলেন, "নবীগণ দিনার বা দিরহাম রেখে যান না। তাঁরা শুধু ইলম রেখে যান। কাজেই যে তা (ইলম) অর্জন করল, সে এক বিশাল অংশ পেলো।"[৪৪৪]

মুআয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত চমৎকার ভাষায় বলেছেন, "(ইলমের) মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা হয় এবং এর মাধ্যমেই হারাম থেকে হালালকে পৃথক করতে শেখা যায়। এ হলো এক নেতা, আর এর অনুসারী হলো আচরণ। সৌভাগ্যবানকেই তা দেওয়া হয়, আর দুর্ভাগাকে তা থেকে বিরত রাখা হয়।"

মুসলিম জামাত যদি আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই দ্বীনি জ্ঞান অন্বেষণ করতে হবে। বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য সালাফগণের অকীদাহ শিখতে হবে। নিজেরা এই দ্বীনকে ঠিকভাবে বোঝা, অপরকে শেখানো ও ইসলামের দিকে ডাকার জন্য জ্ঞান লাগবে।

قُلْ هَـٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى

"বলো, 'এটাই আমার পথ। আমি জেনেশুনে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি, আর যারা আমাকে অনুসরণ করে তারাও।'"[৪৪৫]

কোথায় কখন কীভাবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে হয়, তা শিখতে হবে। কীভাবে কার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হয়, তা শিখতে হবে। শিখতে হবে কাদের বন্ধু বানাতে হয়, আর কাদের শত্রু বানাতে হয়। মুসলিম জামাত এসব জ্ঞান অর্জন না করেই কাজে নেমে পড়লে নিশ্চিতভাবেই পথভ্রষ্ট হয়। ইলমবিহীন ইবাদত হলো ভুল পথ ধরে হেঁটে চলার মতো। ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "জ্ঞান ছাড়াই যে ব্যক্তি

[৪৪৩] সূরা আলে ইমরান ৩:১৬৪
[৪৪৪] তিরমিযি : ২৬৮২
[৪৪৫] সূরা ইউসুফ ১২:১০৮

কোনো পথকে জান্নাতের পথ ভেবে চলতে শুরু করে, সে পথের কষ্ট ভোগ করবে বটে, কিন্তু গন্তব্যে কখনোই পৌঁছতে পারবে না।"

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের কামিয়াবি অন্বেষণকারীদের জন্য ইলম হলো খাদ্য ও পানীয়ের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। নবীজি ﷺ বলেন, "যে ইলম অর্জনের রাস্তায় পা ফেলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।"[৪৪৬]

ইবনু রজব হাম্বলী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, "জ্ঞান মানুষকে ক্ষুদ্রতম ও সহজতম পথে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে। কাজেই যে-কেউ আল্লাহর রাস্তায় পা ফেলে এবং তা থেকে বিমুখ হয় না, সে অবশ্যই আল্লাহ ও জান্নাতের দিকে ক্ষুদ্রতম ও সহজতম রাস্তায় পৌঁছতে পারবে।"

যে মুত্তাকী হতে চায়, তার জন্য তাকওয়ার দিকে যাওয়ার রাস্তা হলো ইলম। একজন সালাফ বলেন, "কেউ কী করে পরহেজগার হতে পারে, যদি সে এটাই না জানে যে কোন জিনিস থেকে পরহেজ করতে হবে?" মা'রুফ কারখি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহকে কীভাবে ভয় করতে হবে এটাই যদি না জানো, তা হলে তুমি নিশ্চয় সুদ খেতে শুরু করবে।"

ইবনু রজব হাম্বলি বলেন, "তাকওয়ার সারকথা এই যে, বান্দা প্রথমে জেনে নেবে কী এড়িয়ে চলতে হয়, তারপর তা এড়িয়ে চলবে।"[৪৪৭]

আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখতে হলে অবশ্যই কীভাবে আস্থা রাখতে হয় তা শেখা লাগবে। নাহলে মানুষ প্রয়োজনীয় মাধ্যম ও আসবাব ব্যবহার না করেই ভাববে যে আল্লাহর ওপর ভরসা করছে। অথচ এটা আল্লাহর ওপর ভরসা করার সঠিক পথ নয়। এটা তো নিরস্ত্র হয়ে যুদ্ধে গিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করার দাবি করার শামিল।

যারা ধৈর্য ধরতে চায় ও অবিচল থাকতে চায়, তাদের এই লক্ষ্য পূরণে ইলমকে বাহন বানাতে হবে। নাহলে তারা অপদস্থতা ও অপমান মুখ বুজে সহ্য করাকেই ভাববে ধৈর্য ও অবিচলতা।

সকল আমলের পথ প্রদর্শক হলো ইলম। সেটা অন্তরের আমলই হোক বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। নিশ্চয় ইলম হলো সকল আমলের দরজা। আর আল্লাহ কুরআনে আমাদের ইলম অন্বেষণের আদেশ দিয়েছেন। এ কারণেই আলিমগণকে নবীগণের উত্তরসূরি হওয়ার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

---

[৪৪৬] মুসলিম : ৭০২৮

[৪৪৭] জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, ১/১৬০

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"বলো, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?"[৪৪৮]

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّـهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"বান্দাদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।"[৪৪৯]

বলা হয় যে, শয়তানের বিরুদ্ধে হাজার আবিদের চেয়ে একজন আলিম বেশি ভয়ঙ্কর। এজন্যই আলী ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। আল্লাহভীরু আলিম, নাজাত কামনাকারী শিক্ষার্থী এবং আবোলতাবোল মতাদর্শের অনুসারী বিশৃঙ্খল মানুষজন।[৪৫০] ইসলামের জন্য কাজ করা মুসলিম জামাতের সদস্যরা প্রথম দুই ভাগের যে-কোনোটিতে পড়তে পারে। কিন্তু ধিক্কার তাদের, যারা তৃতীয় ভাগে পড়ে।

আলিমগণ আমাদের প্রয়োজনীয় ইলমকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : আল্লাহর ব্যাপারে জ্ঞান, আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে জ্ঞান।

প্রথম ধরনের ইলমের অন্তর্ভুক্ত হলো আল্লাহর নামসমূহ এবং গুণাবলির ব্যাপারে জ্ঞান। এই জ্ঞান থাকার ফলে মুসলিমের মনে আল্লাহর প্রতি ভয়, বিনয়, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ তৈরি হয়। আল্লাহ তাআলা এই জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় এটিই জ্ঞানের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ শাখা। সালফে সালিহীনের অনেকেই বলতেন, "অনেক অনেক বাণী জানার নাম জ্ঞান নয়। জ্ঞান হলো আল্লাহর প্রতি ভয়।"[৪৫১] অনেকে বলতেন, "আল্লাহকে ভয় করতে শেখাটাই জ্ঞান হিসেবে যথেষ্ট।"[৪৫২] হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "জ্ঞানের ফলে যে জিনিসটি সর্বপ্রথম বৃদ্ধি পায়, তা হলো বিনয়।"[৪৫৩]

দ্বিতীয় প্রকার ইলম হলো হালাল-হারামের ব্যাপারে জ্ঞান। এ ছাড়া শরীয়তের অন্যান্য পর্যায়ের বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞানও এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্য প্রতিটি মুসলিমকে ততটুকু জ্ঞান অর্জন করতেই হবে, যতটুকু তার ইবাদত ও সামাজিক আচার-আচরণের জন্য অপরিহার্য। প্রতিটি মুসলিমকেই পাক-পবিত্রতার বিধান, সালাত, সওম ইত্যাদির জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর্থিক সামর্থ্যবান মুসলিমদের যাকাত, হাজ্জ,

---

[৪৪৮] সূরা আয-যুমার ৩৯:৯

[৪৪৯] সূরা ফাতির ৩৫:২৮

[৪৫০] সিফাতুস সাফওয়াত, ১/৩২৯

[৪৫১] ফাদ্বলু ইলমিস সালাফ, ১/৭

[৪৫২] লাতায়িফুল মাআরিফ, ১/৩৬৪

[৪৫৩] মাওয়ারিদুয যামান, ৮/১২২

জিহাদ ইত্যাদির বিধান শিখতে হবে। ব্যবসায়ীদের লেনদেনের হালাল-হারাম সংক্রান্ত মাসায়েল জানতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, "আমাদের হাট-বাজারে শুধু তারাই দোকান দিতে পারবে, যাদের দ্বীনের জ্ঞান আছে।"[৪৫৪] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "একজন মানুষকে ততটুকু জ্ঞান অর্জন করতেই হবে, যতটুকু হলে সে সালাত আদায় ও ঈমান প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।"

এই দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান আবার দুই প্রকার। ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া। ফরযে আইন প্রতিটি মুসলিমকেই অর্জন করতে হবে। অন্যথায় তার ইবাদত, লেনদেন, ঈমান ইত্যাদি কবুল হবে না। আর ফরযে কিফায়া আদায় করতে হয় ওই কাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের। কেউই যদি তা পালন না করে, তা হলে আবার সকলেই গুনাহগার হবে। ফরযে কিফায়ার উদাহরণ হলো ইলমুল হাদীস, রিজাল শাস্ত্র, উসুলুল ফিকহ ইত্যাদির জ্ঞান।

তা হলে মুসলিম জামাত এই ইলমের দরিয়া থেকে ঠিক কতটুকু পান করবে?

মুসলিম জামাতের প্রতিটি সদস্যকে আল্লাহর ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যতটুকু জ্ঞান থাকলে সে আল্লাহর আনুগত্য করতে পারবে, তাঁর আদেশ মেনে চলতে পারবে এবং তাঁর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলতে পারবে। তাদের উচিত এ জ্ঞান অর্জনের জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করা। কারণ যার জ্ঞান যত বেশি হবে, সে আল্লাহর ততই নিকটবর্তী হবে। তারপর সঠিক আকীদা, ইবাদত ও মুয়ামালাত সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এগুলো ফরযে আইন। একেকজনের দ্বীনি ও দুনিয়াবি জীবন পরিচালনায় যতটুকু জ্ঞান আবশ্যক, ততটুকু তার ওপর ফরযে আইন।

কোনো সদস্যকে যদি বিশেষ কোনো কাজ দেওয়া হয়, তা হলে ওই কাজটি সবচেয়ে উপযোগী উপায়ে করতে পারার মতো ইলম তাকে অর্জন করতে হবে। যাকে কোষাগারের দায়িত্বে রাখা হয়েছে, তাকে আয়-ব্যয়ের হালাল-হারাম সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। যাকে হিসবাহ-র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাকে এ-সংক্রান্ত মাসায়েল জানতে হবে।

একটি বিশেষ দল নিযুক্ত থাকবে ফরযে কিফায়া ইলম অর্জন করার জন্য। বিশেষ করে জামাতের কাজ সংক্রান্ত জ্ঞান তো লাগবেই। নাহলে জামাত শরীয়তের অনুযায়ী চলতে পারবে না।

আল্লাহর ব্যাপারে জ্ঞান কম, এরকম আলিমকে কিছুতেই জামাতের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এসকল আলিম হারামের ব্যাপারে জ্ঞান রাখলেও নিজেই হারামে লিপ্ত হয়। এমনকি হারামকে হালাল বলে ফাতওয়াও দিয়ে দিতে পারে। আবার দ্বীনি দায়িত্বগুলো এরা নিজেরাও পালন করে না, আবার ফতোয়াবাজির মাধ্যমে অন্যদেরকেও এমনটা করার

[৪৫৪] তিরমিযি : ৪৮৭

লাইসেন্স ধরিয়ে দেয়। তাকওয়াবিহীন এসকল আলিম জামাতের জন্য ও এর কর্মীদের জন্য দুর্গতি বয়ে আনবে। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যথার্থই বলেছিলেন, "বাকপটু জ্ঞানী মুনাফিকদের ব্যাপারে আমার ভয় হয়।"[৪৫৫]

৩. ইয়াকীন

সীরাতের কিতাব থেকে জানা যায় যে, মি'রাজ থেকে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদেরকে তাঁর অভিজ্ঞতা শোনালেন। তারা তো বিশ্বাস করলই না, উল্টো দৌড়ে গেল আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে। ভাবল, তাঁকে এই ঘটনা বললে তিনি একে আজগুবি গল্প ভেবে নবীজি ﷺ-কে অনুসরণ করা ছেড়ে দেবেন। কিন্তু আবূ বকর তা শুনে বললেন, "যদি তিনি তোমাদের তা বলে থাকেন, তা হলে এটিই সত্য।"

আবার এই আয়াতগুলো যখন নাযিল হলো :

غُلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝ فِي بِضْعِ سِنِينَ

"রোমানরা পরাজিত হয়েছে নিকটস্থ ভূমিতে। কিন্তু তারা তাদের পরাজয়ের পর শীঘ্রই জয়লাভ করবে কয়েক বছরের মধ্যেই।"[৪৫৬]

এবারও কাফিররা আবূ বকরের কাছে ছুটে গিয়ে বলল, "তোমার বন্ধু দাবি করছে রোমানরা নাকি জয়লাভ করবে।" আবূ বকর বললেন, "তিনি সত্য বলছেন।" বাজি ধরা হারাম হওয়া-সংক্রান্ত আয়াত তখনও নাযিল হয়নি। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে বাজি ধরলেন যে এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই সত্য হবে।

মুসলিম জামাতকে এই ধরনের ইয়াকীন দিয়ে সজ্জিত থাকতে হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওয়াদার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে।

وَعْدَ اللَّـهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّـهِ قِيلًا ۝

"আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর আল্লাহর কথার চেয়ে কার কথা বেশি সত্য হতে পারে?"[৪৫৭]

وَعْدَ اللَّـهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّـهُ وَعْدَهُ

---

[৪৫৫] মুসনাদ আহমাদ : ১৪৩
[৪৫৬] সূরা আর-রূম ৩০:২-৪
[৪৫৭] সূরা আন-নিসা ৪:১২২

"এটি আল্লাহর ওয়াদা, আর আল্লাহ তাঁর ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না।"[৪৫৮]

এমন ইয়াকীন রাখতে হবে যে, নবীজি ﷺ যা-ই বলেছেন, তা-ই সত্য। নিশ্চয় আজ আমাদের মাঝে এ ধরনের ইয়াকীনের বড় অভাব। এই ইয়াকীনের অভাব যে, আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের রক্ষা করেন। এই ইয়াকীনের অভাব যে, বিজয়ের আগে পরীক্ষাস্বরূপ দুঃখ-কষ্ট আসে। এই ইয়াকীনের অভাব যে, আল্লাহর রাস্তায় ধৈর্য ধরে সংগ্রাম করে যাওয়া সত্যবাদী ঈমানদাররা সংখ্যায় কম হলেও বিজয়ী হবে। আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউই কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে না; জীবন, মৃত্যু বা পুনরুত্থান করাতে পারে না। ইয়াকীন সম্পন্ন আন্দোলন আর ইয়াকীনবিহীন আন্দোলনের মাঝে পার্থক্য হলো জীবিত ও মৃতের পার্থক্যের মতো। যে আন্দোলনে আল্লাহর প্রতি ইয়াকীন নেই, তা এক প্রাণহীন দেহ। ইয়াকীনে টইটম্বুর আন্দোলন সকল পরীক্ষার মুখেই শান্ত ও অবিচল থাকে।

খন্দকের যুদ্ধে মুমিন ও মুনাফিকরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বাণী যে, মুসলিমরা পারস্য ও রোম বিজয় করবে। মুনাফিকরা অবিশ্বাস করেছিল, আর মুমিনরা এমনভাবে বিশ্বাস করে নিয়েছিল যেন এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। মুমিনদের ছেড়ে যেতে যেতে মুনাফিকরা বলেছিল:

وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছেন, তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৪৫৯]

মুসলিম জামাত যদি কথা ও কাজে ইয়াকীনের অভাবে ভোগে, তা হলে তা মুনাফিকদের একটি ফিরকায় পরিণত হবে।

অতি দুঃখের সাথে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, দুর্বল ঈমান আর মৃত অন্তরধারী কিছু লোকের উক্তি আজকাল ইসলামি আন্দোলনের ময়দানে উড়ে বেড়ায়। ইসলামের কর্মীদের কেউ কেউ আবার সেসব কথা ছড়ায়ও। এর কারণ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওয়াদার প্রতি ইয়াকীনের অভাব। তারা মানতে চায় না যে, হকপন্থীরা দুর্বল হলেও জিতবে। তারা মুনাফিকদের কথারই পুনরাবৃত্তি করে:

ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي

[৪৫৮] সূরা আর-রূম ৩০:৬
[৪৫৯] সূরা আল-আহযাব ৩৩:১২

"আমাদের (জিহাদে না যাওয়ার) অনুমতি দিন এবং আমাদের ফিতনায় ফেলবেন না।"[৪৬০]

لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ

"গরমের মধ্যে অভিযানে বের হোয়ো না।"[৪৬১]

بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ

"নিশ্চয় আমাদের ঘরগুলো অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে।"[৪৬২]

شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا

"আমাদের মালধন ও আমাদের পরিবার-পরিজন আমাদের ব্যস্ত রেখেছিল, কাজেই আমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।"[৪৬৩]

لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا

"তোমরা (শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে) দাঁড়াতেই পারবে না। কাজেই তোমরা ফিরে যাও।"[৪৬৪]

এসব মন ভেঙে দেওয়া কথাবার্তা শোনার পরও মুমিনরা বিশ্বাস ধরে রাখে। আল্লাহর দেওয়া বিজয়ের ওয়াদার প্রতি ঈমান রাখে। প্রথম প্রজন্মের মুমিনদের সাথে গলা মিলিয়ে বলে :

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

"আল্লাহর সাহায্যে কতবারই তো ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলের ওপর বিজয়ী হয়েছে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[৪৬৫]

[৪৬০] সূরা আত-তাওবা ৯:৪৯
[৪৬১] সূরা আত-তাওবা ৯:৮১
[৪৬২] সূরা আল-আহযাব ৩৩:১৩
[৪৬৩] সূরা আল-ফাতহ ৪৮:১১
[৪৬৪] সূরা আল-আহযাব ৩৩:১৩
[৪৬৫] সূরা আল-বাকারাহ ২:২৪৯

তারা পুনরাবৃত্তি করে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সেই উক্তি :

كَلَّآ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

"কিছুতেই না! আমার প্রতিপালক আমার সাথে আছেন। শীঘ্রই তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।"[৪৬৬]

তারা পুনরাবৃত্তি করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস, "আল্লাহ আমার জন্য পৃথিবীর শেষ সীমানাগুলো কাছে এনে দেখিয়েছেন এবং আমি পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত দেখেছি। যে সীমানাগুলো আমাকে কাছে এনে দেখানো হয়েছে, সেই সীমাগুলো পর্যন্ত আমার উম্মাতের শাসন বিস্তার লাভ করবে।"[৪৬৭]

সত্যবাদী মুমিনদের এই ক্ষুদ্র দলের ওপর আমরা আশা রাখি, যারা আল্লাহর ওয়াদার ব্যাপারে ইয়াকীন রাখেন। যারা সাহস ভেঙে দিতে আর মন দুর্বল করে দিতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে না, তাদের কথাবার্তা অগ্রাহ্য করে মুমিনরা কাজ চালিয়ে যাবে। আমাদের খুবই দৃঢ় ইয়াকীনের অধিকারী হতে হবে। কারণ জাহিলিয়াতের সেনারা আমাদের থেকে সংখ্যা, শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্রে অনেক এগিয়ে। আমাদের ইয়াকীন রাখতে হবে যে, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। তিনি আমাদের শত্রুদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান, প্রতিশোধ গ্রহণে দ্রুততর। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি তাঁর সত্যপন্থী বান্দাদের সাহায্য করেন ও তাদের বিজয়ের দিকে নিয়ে যান। তিনি তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করেন এবং এর বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা সকল ফিরকাকে পরাজিত করেন। আমরা এই ইয়াকীনের গুণে গুণান্বিত না হয়ে ইসলামের জন্য কাজ করতে পারব না, পারব না জিহাদের ময়দানে সামনে এগোতে।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ۝

"আর যখন তারা ধৈর্য অবলম্বন করেছিল তখন আমি তাদের মধ্য হতে মনোনীত করেছিলাম নেতা—যারা আমার নির্দেশ মোতাবেক সৎ পথ প্রদর্শন করত, এবং আমার আয়াতসমূহের ওপর ইয়াকীন রেখেছিল।"[৪৬৮]

৪. তাওয়াক্কুল

ইয়াকীন যদি একবার আমাদের অন্তরে প্রোথিত হয়ে যায়, তা হলে এর ফল হিসেবে উৎপন্ন হবে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা বা তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ। অতএব, দুর্বল

[৪৬৬] সূরা আশ-শু'আরা ২৬:৬২
[৪৬৭] মুসলিম : ৭৪৪০
[৪৬৮] সূরা আস-সাজদাহ ৩২:২৪

ঈমান ও মৃত অন্তরধারী লোকেরা এই তাওয়াক্কুলের সুমিষ্ট স্বাদ কখনোই পাবে না। কারণ তারা এর উৎসকেই অস্বীকার করেছে। সেই উৎস হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর ওয়াদার প্রতি ইয়াকীন।

এ ধরনের লোকেরা সব সময় মুমিনদের হতাশ করে দিতে চায়। তাদের পেছন থেকে টেনে ধরে অগ্রগতি থামিয়ে দিতে চায়। তারা মুমিনদেরকে স্বল্প সংখ্যা ও তুচ্ছ সরঞ্জাম নিয়ে মহাশক্তিধর শত্রুদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হতে দেখে বলে :

غَرَّ هَٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ

"এই লোকগুলোকে তাদের দ্বীন ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে।"[৪৬৯]

তারা বুঝতে পারে না যে মুমিনরা আসলে আল্লাহর প্রতি ইয়াকীন রেখেছে এবং তাঁর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করেছে।

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَإِنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

"...আর যে-কেউ আল্লাহর প্রতি ভরসা করে, (সে জেনে রাখুক,) আল্লাহ তো প্রবল পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।"[৪৭০]

তারা মুমিনদের ক্ষুদ্র সংখ্যা দেখে বলে :

النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

"একটি বড় বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে জড়ো হচ্ছে। কাজেই তাদের ভয় করো।"[৪৭১]

তারা যেসব কথা বলে মনোবল ভেঙে দিতে চায়, সেগুলো উল্টো মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি করে। আল্লাহর ওয়াদার প্রতি তাদের ইয়াকীন বাড়িয়ে দেয়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ইয়াকীন জন্ম দেয় আরো তাওয়াক্কুলের। মুমিনরা এগিয়ে যায় তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে।

فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّـهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

"কিন্তু এতে তাদের ঈমান (কেবল) বৃদ্ধিই পেল। আর তারা বলল, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই-না উত্তম

[৪৬৯] সূরা আল-আনফাল ৮:৪৯
[৪৭০] সূরা আল-আনফাল ৮:৪৯
[৪৭১] সূরা আলে ইমরান ৩:১৭৩

কর্মবিধায়ক।'"[৪৭২]

সত্যিকারের ঈমানদারদের সাথে গলা মিলিয়ে আমরা বলি, "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট।"

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

"আর যে-কেউ আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।"[৪৭৩]

أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

"আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?"[৪৭৪]

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা হলে বলে দাও, 'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই। তাঁর ওপরই আমি ভরসা করি। তিনি হলেন মহান আরশের অধিপতি।'[৪৭৫]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّـهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾

"হে নবী! তোমার আর তোমার অনুসারী ঈমানদারদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"[৪৭৬]

مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّـهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

"তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে যা করার করো, তাতে কোন ত্রুটি রেখো না এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিয়ো না। আমার ভরসা আল্লাহর ওপর, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব। এমন কোনো জীব নেই যার কর্তৃত্ব তাঁর হাতে নয়। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"[৪৭৭]

---

[৪৭২] সূরা আলে ইমরান ৩:১৭৩
[৪৭৩] সূরা আত-তালাক ৬৫:৩
[৪৭৪] সূরা আয-যুমার ৩৯:৩৬
[৪৭৫] সূরা আত-তাওবা ৯:১২৯
[৪৭৬] সূরা আল-আনফাল ৮:৬৪
[৪৭৭] সূরা হুদ ১১:৫৫-৫৬

فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾

"কারণ আমি ভরসা করি আল্লাহর ওপর। তোমরা তোমাদের শরীকদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে ষড়যন্ত্র করো। পরে তোমাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তোমাদের মাঝে যেন অস্পষ্টতা না থাকে। অতঃপর আমার ওপর তা কার্যকর করো, আর আমাকে কোনো অবকাশই দিয়ো না।"[৪৭৮]

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

"আমরা আল্লাহর ওপরই ভরসা করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিম জাতির অত্যাচারের পাত্র কোরো না। আর তোমার অনুগ্রহে আমাদেরকে কাফির সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করো।"[৪৭৯]

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾

"কেন আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করব না? তিনিই তো আমাদের পথ দেখিয়েছেন। তোমরা আমাদের যত কষ্টই দাও না কেন, আমরা তাতে অবশ্যই ধৈর্যধারণ করব। আর ভরসাকারীদের আল্লাহরই ওপর ভরসা করা উচিত।"[৪৮০]

সীরাতের কিতাবাদি থেকে আমরা জানতে পারি যে, উহুদের যুদ্ধ থেকে সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ফিরে আসার পর নবীজি ﷺ তাঁদেরকে অস্ত্র তুলে নেওয়ার ডাক দিলেন। তিনি বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, তিনি যেন লোকজনকে বলে দেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের হুকুম দিয়েছেন শত্রুদের পিছু ধাওয়া করার। আর আগের দিন যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, তারাই শুধু এতে অংশ নেবে। আগের দিন নয়টি আঘাত পাওয়া উসাইদ বিন হুযাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত তড়িৎ গতিতে সেই নির্দেশ পালন করেছেন। কোনো ইতস্তততও করেননি, ক্ষত পরিচর্যার জন্য সময়ও নেননি। বনু সালামাহ গোত্রের চল্লিশ জন আহত যোদ্ধা নবীজি ﷺ-এর সাথে এই অভিযানে সঙ্গ দেন। অথচ ঠিক এর আগেই দিনই শত্রুরা একরকম জয়লাভ করে গেছে। আগের দিনের চেয়ে কম

---

[৪৭৮] সূরা ইউনুস ১০:৭১
[৪৭৯] সূরা ইউনুস ১০:৮৫-৮৬
[৪৮০] সূরা ইবরাহীম ১৪:১২

ও দুর্বল অবস্থায় মুমিনরা বেরিয়ে পড়লেন। অস্ত্র হিসেবে ছিল আল্লাহর প্রতি ইয়াকীন ও তাওয়াক্কুল। কুরআন এই ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে :

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّـهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّـهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّـهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

"আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও যারা আল্লাহ এবং রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান। যাদেরকে লোকে খবর দিয়েছিল যে, একটি বড় বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে জড়ো হচ্ছে। কাজেই তাদের ভয় করো। তখন তা তাদের ঈমান (কেবল) বৃদ্ধিই করল এবং তারা বলল, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই-না উত্তম কর্মবিধায়ক!' অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে আসলো। কোনো প্রকার অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল এবং আল্লাহ মহাকল্যাণময়।"[৪৮১]

ইসলামি আন্দোলনের জন্য সাজ-সরঞ্জাম হিসেবে আমাদের এই ধরনের তাওয়াক্কুল দরকার। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে আদেশ দিচ্ছেন আল্লাহর ওপর ভরসা করার জন্য এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখার জন্য :

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

"আর তুমি নির্ভর করো সেই চিরঞ্জীবের ওপর, যিনি মরবেন না।"[৪৮২]

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾

"আর তুমি নির্ভর করো প্রবল পরাক্রান্ত, পরম দয়ালু (আল্লাহ)'র ওপর।"[৪৮৩]

এই আসমানী আদেশ দেওয়া হয়েছিল নবীজি ﷺ, আর তাঁর উম্মাহকে। যারা নবীজি ﷺ-এর এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে তাদের কর্তব্য হলো এরকম তাওয়াক্কুলের অধিকারী হওয়া।

[৪৮১] সূরা আলে ইমরান ৩:১৭২-১৭৪

[৪৮২] সূরা আল-ফুরকান ২৫:৫৮

[৪৮৩] সূরা আশ-শুআরা ২৬:২১৭

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝٧٩

"কাজেই তুমি আল্লাহর ওপর নির্ভর করো। তুমি তো সুস্পষ্ট সত্যের ওপর আছো।"[৪৮৪]

মুসলিমরা ছোট সেনাবাহিনী ও নগণ্য অস্ত্র নিয়ে বহু যুদ্ধ করেছে। কিন্তু তাদের মাঝে ছিল না কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। কারণ তারা নিশ্চিত ছিল যে আল্লাহ তাআলা তাঁর সৈনিকদের বিজয়ের দিকে নিয়ে যাবেন এবং তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এই ইয়াকীনের কারণে তারা আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করতে পেরেছিলেন। হুনাইনের যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুসলিমদের পরাজয়ের কারণ ছিল সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করতে শুরু করা আর আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল কমে যাওয়া।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ۝٢٥

"বস্তুত আল্লাহ তোমাদের বহু যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন আর হুনাইন যুদ্ধের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজেই আসেনি। জমিন সুপ্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তা তোমাদের নিকট সংকীর্ণই হয়ে গিয়েছিল। আর তোমরা পেছন ফিরে পালিয়ে গিয়েছিলে।"[৪৮৫]

একজন সাহাবী মুসলিমদের সংখ্যাধিক্য দেখে আনন্দের আতিশয্যে গর্বভরে বলেছিলেন, "আজ আমরা সংখ্যা স্বল্পতার কারণে পরাজিত হব না।" যেখানে নিশ্চিত বিজয়ের আশা করা হচ্ছিল, সেখানে ১২০০ মুসলিম সেনা সাময়িক পরাজয়ের মুখোমুখি হলো এবং ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল। তারপর মাত্র আশিজন যোদ্ধা নবীজি ﷺ-এর সাথে জড়ো হন এবং হাওয়াযিনের বিরুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে আনেন।

মুসলিমরা হুনাইনের দিন এক বিরাট শিক্ষা লাভ করেন। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব। সংখ্যা বা অস্ত্র কখনো বিজয় আনে না। শুধু আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলই বিজয় আনে। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলই যদি হারিয়ে যায়, তা হলে মুসলিমরা জিহাদ ছেড়ে দেবে। আল্লাহর রাস্তায় কাজ করা থেকে পিছু হটে ঘরে বসে থাকবে। আর বানী ইসরাঈলের সেই লোকদের মতো বলবে :

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا ۖ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا

[৪৮৪] সূরা আন-নামল ২৭:৭৯
[৪৮৫] সূরা আত-তাওবা ৯:২৫

قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾

"হে মূসা! তারা ওখানে যতদিন থাকবে, ততদিন আমরা ওখানে কখনো প্রবেশ করব না। কাজেই তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও আর যুদ্ধ করো। আমরা এখানেই বসলাম।"[৪৮৬]

তারা লড়াই করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। অজুহাত ছিল :

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ

"হে মূসা! ওখানে অত্যন্ত শক্তিধর এক সম্প্রদায় আছে।"[৪৮৭]

তারা পবিত্র ভূমি (ফিলিস্তিনে) প্রবেশ করতে চাইছিল না। অথচ আল্লাহ তাদের সেই ভূমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দুইজন মানুষ কেবল আল্লাহর অনুগ্রহে আল্লাহকে ভয় করতে শিখেছিলেন। তাঁরা বলেছেন :

ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّـهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

"তাদের দরজায় হানা দাও। ঢুকলেই তোমরা জয়ী হয়ে যাবে। তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকলে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করো।"[৪৮৮]

যারা আল্লাহর প্রতি ঠিকভাবে তাওয়াক্কুল করেনি, তাদের বিজয় থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনার শিকার করা হয় :

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۛ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

"(আল্লাহ) বললেন, 'তবে তা চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য নিষিদ্ধ হলো। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তারা জমিনে ঘুরে বেড়াবে। কাজেই এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য হা-হুতাশ কোরো না।"[৪৮৯]

আল্লাহর ওপর ভরসা না করলে এভাবেই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা চেপে বসে। শয়তান আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে।

---

[৪৮৬] সূরা আল-মাইদাহ ৫:২৪

[৪৮৭] সূরা আল-মাইদাহ ৫:২২

[৪৮৮] সূরা আল-মাইদাহ ৫:২৩

[৪৮৯] সূরা আল-মাইদাহ ৫:২৬

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾

"তুমি যখনই কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে। যারা ঈমান এনেছে, তাদের ওপর (শয়তানের) কোনো প্রভাব খাটে না। আর তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর তাওয়াক্কুল করে।"[৪৯০]

যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না ও আল্লাহর ওপর ভরসা করে না, শয়তান তাদের আওলিয়া (সাহায্যকারী, বন্ধু, অভিভাবক)।

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

"(শয়তানের) প্রভাব কেবল তাদের ওপরই খাটে, যারা তাকে আওলিয়া হিসেবে গ্রহণ করে আর যারা তাকে আল্লাহর শরীক করে।"[৪৯১]

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

"এ লোকেরা হচ্ছে শয়তান; তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। তোমরা তাদের ভয় কোরো না। আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।"[৪৯২]

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল যখন হারিয়ে যায়, তখন বান্দার প্রত্যয়, দৃঢ়তা, ও সাহসের জায়গা দখল করে নেয় ভীরুতা, দুর্বলতা, হতাশা ও ভয়। সে আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসাও হারিয়ে ফেলে।

إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর ওপর ভরসা করে।"[৪৯৩]

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে গেলে বান্দা সত্যিকারের ঈমান থেকে বঞ্চিত হয় :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

[৪৯০] সূরা আন-নাহল ১৬:৯৮-৯৯
[৪৯১] সূরা আন-নাহল ১৬:১০০
[৪৯২] সূরা আলে ইমরান ৩:১৭৫
[৪৯৩] সূরা আলে ইমরান ৩:১৫৯

"মুমিন তো তারাই, আল্লাহর কথা আলোচিত হলেই যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে; আর তাদের কাছে যখন তাঁর আয়াত পঠিত হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে।"[৪৯৪]

وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

"ঈমানদারদের আল্লাহর প্রতিই নির্ভর করা উচিত।"[৪৯৫]

وَعَلَى اللَّـهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকলে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করো।"[৪৯৬]

সাঈদ বিন জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল হলো পূর্ণ ঈমান।"[৪৯৭]

ওয়াহব ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "(ঈমানের) সবচেয়ে উঁচু পর্যায় হলো আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল।"[৪৯৮]

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার ওপর পূর্ণ ভরসা ছাড়া সত্যিকারের ইবাদত করা যায় না। এজন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআনে এ দুটির কথা একসাথে উল্লেখ করেন :

وَلِلَّـهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

"আসমান ও জমিনের অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই রয়েছে। সকল বিষয়ই (চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য) তাঁর কাছে ফিরে যায়। কাজেই তুমি তাঁরই ইবাদত করো আর তাঁরই ওপর নির্ভর করো।"[৪৯৯]

যথেষ্ট পরিমাণ তাওয়াক্কুল থাকলেই কেবল মুসলিম জামাত তাদের কাজে সফল হতে পারবে। আজকের জাহিলিয়াত কিন্তু সংখ্যা, শক্তি আর অস্ত্রে অনেক এগিয়ে। মুসলিম জামাতের যথাযথ তাওয়াক্কুল না থাকলে তারা আল্লাহর রাস্তায় একটা কদমও ফেলার সাহস পাবে না। পক্ষান্তরে, পূর্ণ ইখলাসের সাথে তাওয়াক্কুল রাখলে তারা নিঃসংকোচে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল শক্তিকে অগ্রাহ্য করতে পারবে। হুদ (আলাইহিস সালাম)-এর মতো বলতে পারবে :

---

[৪৯৪] সূরা আল-আনফাল ৮:২

[৪৯৫] সূরা আলে ইমরান ৩:১৬০

[৪৯৬] সূরা আল-মাইদাহ ৫:২৩

[৪৯৭] মাজমু আল-ফাতাওয়া, ১০/৫৫০

[৪৯৮] জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, ১/৪৩৭

[৪৯৯] সূরা হুদ ১১:১২৩

مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

"তাঁকে (আল্লাহ) ব্যতীত তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো আর আমাকে একটুও অবকাশ দিয়ো না। নিশ্চয় আমি ভরসা করি আল্লাহর ওপর যিনি আমার আর তোমাদের প্রতিপালক। এমন কোনো জীব নেই যার কর্তৃত্ব তাঁর হাতে নয়। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"[৫০০]

কী সুন্দর ছিল হুদ (আলাইহিস সালাম)-এর এই কথাটি, "নিশ্চয় আমি ভরসা করি আল্লাহর ওপর যিনি আমার এবং তোমাদের রব।"

তিনি তোমাদেরও রব, আমারও রব। কী করে তাঁর ওপর ভরসা না করে থাকতে পারি আমি? তিনি আমাকে তোমাদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম, আমাকে তোমাদের ওপর বিজয় দিতে সক্ষম। তা তোমাদের যত সাজ-সরঞ্জামই থাকুক না কেন! কারণ "এমন কোনো জীব নেই যার কর্তৃত্ব তাঁর হাতে নয়।"[৫০১]

কিন্তু আল্লাহর ওপর ভরসা করার অর্থ এই না যে জাগতিক ও বস্তুগত হালাল মাধ্যম ও সাজ-সরঞ্জামগুলো ব্যবহার করা যাবে না। যতক্ষণ অন্তরে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা আছে, দুনিয়াবি আসবাব ব্যবহার ততক্ষণ কোনো সমস্যাই নয়। তাওয়াক্কুল করতে হবে আল্লাহর ওপর, উপায়-উপকরণগুলোর ওপর নয়। পক্ষান্তরে, যারা বৈধ উপায়-উপকরণ ব্যবহার না করে দাবি করে যে তারা আল্লাহর ওপর ভরসা করছে, তারা আসলে গুনাহগার। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ

"আর তাদের মোকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী সদা প্রস্তুত রাখবে...।"[৫০২]

শত্রুদের বিরুদ্ধে সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করা হলো হালাল উপায়-উপকরণ অবলম্বনের অন্তর্ভুক্ত। এটি আসমানী হুকুম। যারা এসকল প্রস্তুতি না নিয়ে জিহাদে বের হয়ে যায় আর আল্লাহর ওপর ভরসা করার দাবি করে, তারা আসলে গুনাহগার। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের আদেশ দেন :

[৫০০] সূরা হুদ ১১:৫৫-৫৬
[৫০১] সূরা হুদ ১১:৫৬
[৫০২] সূরা আল-আনফাল ৮:৬০

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো।"[৫০৩]

জিহাদের ময়দানে সালাত পড়ার সময়ও অস্ত্র সাথে রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে যাতে শত্রু আক্রমণ আসলে প্রতিহত করা যায়। ইমাম শাফিঈ এর মতে এরকম পরিস্থিতিতে অস্ত্র সাথে রাখা ওয়াজিব। নবীজি ﷺ নিজেই পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ ও সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যুদ্ধের সময় ঢাল ব্যবহার করতেন, মক্কা থেকে হিজরতের সময় গুহায় লুকিয়েছেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় বলেছিলেন, "শত্রুদের (ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করে তাদের) তথ্য এনে দেওয়ার জন্য আমার একজনকে দরকার।" তিনি নুআইম বিন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছেন, "পারলে তাদের (শত্রুদেরকে) ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করো। কারণ, যুদ্ধ হলো ধোঁকা।" তিনি আরো বলেছেন, "কে আজ রাতে আমাদের পাহারা দেওয়ার জন্য জেগে থাকবে?" এক বেদুইনকে উট না বেঁধেই মাসজিদে প্রবেশ করছিল সালাত আদায়ের জন্য। সে বলছিল, "আমি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করছি।" রাসূল ﷺ বলেছেন, "উট বেঁধে (আল্লাহর ওপর) তাওয়াক্কুল করো।"[৫০৪] আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[৫০৫]

৫. শোকর

বান্দার জীবন হলো বিপদ ও আনন্দের পালাবদলের নাম। বিপদে-আপদে সে ধৈর্য ধরে আর আনন্দ-স্বাচ্ছ্যন্দে সে তার প্রতিপালকের কাছে কৃতজ্ঞতা জানায়। এ কারণেই সালাফগণ বলতেন, "ঈমানের দুটি অংশ। শোকর আর সবর।"[৫০৬] নবীজি ﷺ বলেন, "মুমিনের অবস্থা বিস্ময়কর। সবকিছুতেই তার কল্যাণ। শুধু মুমিনই এই অবস্থাটা পায়। সে ভালো কিছু পেলে তার জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হয়। ফলে তার কল্যাণ হয়। আর কোনো বিপদে পড়লে ধৈর্য ধরে। এতেও তার কল্যাণ হয়।"[৫০৭]

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "শোকর আর সবর যদি দুটি উট

---

[৫০৩] সূরা আন-নিসা ৪:৭১

[৫০৪] তিরমিযি : ২৫১৭

[৫০৫] সূরা আল-আহযাব ৩৩:২১

[৫০৬] মাদারিজুস সালিকিন, ২/২৪২

[৫০৭] মুসলিম : ৭৬৯২

হতো, তা হলে আমি এর যে-কোনোটিতে চড়তেই পছন্দ করতাম।"[৫০৮] রব্বের দিকে যাত্রায় মুসলিমদের দুটি পাথেয় হলো কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য। এজন্যই এই আয়াতটি কুরআনে বহুবার এসেছে :

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

"নিশ্চয় এতে পরম সহিষ্ণু ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[৫০৯]

এ ছাড়া, কুরআন মানুষকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। এক দল আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করেছে। আরেক দল আল্লাহর নিয়ামত স্বীকার করে কৃতজ্ঞ হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝

"নিশ্চয় আমি তাকে পথ দেখিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।"[৫১০]

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। কুরআন বলে :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করেন, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি আর অন্তর দান করেছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো।"[৫১১]

রব্বের সন্তুষ্টি পেতে হলে মুসলিম জামাতের প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব হলো আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের পদ্ধতি এবং অকৃতজ্ঞতার পরিণাম জেনে নিতে হবে। আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতার পরিণাম হলো আল্লাহর গযব।

মুসলিম জামাতের দৃঢ়তা-অবিচলতা অনেকাংশে নির্ভর করবে এর সদস্যরা আল্লাহর প্রতি কেমন কৃতজ্ঞ সেটির ওপর।

---

[৫০৮] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ১/৮৬
[৫০৯] সূরা ইবরাহীম ১৪:৫
[৫১০] সূরা আল-ইনসান ৭৬:৩
[৫১১] সূরা আন-নাহল ১৬:৭৮

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

"মুহাম্মাদ আল্লাহর একজন রাসূল মাত্র। তার পূর্বে আরো অনেক রাসূল গত হয়েছে। যদি সে মারা যায় কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা উল্টোদিকে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি উল্টোদিকে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আর আল্লাহ কৃতজ্ঞদের অতিশীঘ্রই বিনিময় প্রদান করবেন।"[৫১২]

মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহ আদেশ দেন :

قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

"হে মূসা! আমি আমার রিসালাত ও আমার বাক্য দ্বারা সকল লোকের মধ্য হতে তোমাকে নির্বাচিত করেছি। কাজেই যা তোমাকে দিয়েছি তা গ্রহণ করো আর কৃতজ্ঞতা আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।"[৫১৩]

মুসলিম জামাতের দায়িত্ব হলো তার সকল সদস্যকে এই নির্দেশ মেনে চলতে শেখানো। তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের বিপদ-আপদ দিয়ে যেমন পরীক্ষা করেন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েও তেমনি পরীক্ষা করেন :

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

"আর আমি তোমাদের ভালো ও মন্দ (উভয় অবস্থায় ফেলার) দ্বারা পরীক্ষা করি।"[৫১৪]

আল্লাহ তাআলা চাইলেই কোনো বান্দাকে বাঁধভাঙা নিয়ামত ও সম্পদ দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহ রহম করলে সেই বান্দা এসব নিয়ামত পেয়ে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবে। আল্লাহর নির্দেশিত হালাল পন্থায় তা ব্যয় করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চাইবে। আর নয়তো সে নিয়ামতদাতাকে ভুলে গিয়ে দুনিয়াবি ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে নিয়ামতকে পরিণত করবে অভিশাপে। জনৈক জ্ঞানী যথার্থই বলেছিলেন, "তুমি যদি আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নিয়ামত লাভ করতে থাকো, তা

[৫১২] সূরা আলে ইমরান ৩:১৪৪
[৫১৩] সূরা আল-আরাফ ৭:১৪৪
[৫১৪] সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৩৫

হলে সতর্ক হও। এমন এক দিক থেকে তোমার ওপর বিপদ আসতে চলেছে, যা তুমি কল্পনাও করতে পারোনি।"

কাজেই মুসলিম জামাত যেন অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। নাহলে হয় তারা এই নিয়ামত হারিয়ে ফেলবে, আর নয়তো তা হবে নিয়ামতের ছদ্মবেশে বিপদ। জামাত যদি দেখে তাদের দাওয়াত সাফল্য পাচ্ছে, সমর্থক সংখ্যাও জ্ঞান দিন দিন বাড়ছে, তা হলে যথাযথ শুকরিয়া আদায় করতে হবে। তা হলেই এসব নিয়ামত স্থায়ী হবে এবং আরো বৃদ্ধি পাবে।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝

"(স্মরণ করো) যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তা হলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য (আমার নিয়ামত) বৃদ্ধি করে দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, (তা হলে জেনে রেখো) আমার শাস্তি অবশ্যই কঠিন।"[৫১৫]

এজন্যই উলামায়ে কিরাম শোকরকে বলেন আল-হাফিয (রক্ষণাবেক্ষণকারী) এবং আল-জালিব (আনয়নকারী)। কারণ, যেসব নিয়ামত আছে, কৃতজ্ঞ হওয়ার ফলে সেগুলো স্থায়ী হয়। আর যেসব নিয়ামত এখনো আসেনি, সেগুলোও নিয়ে আসে।

উমর বিন আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ একবার বলেছিলেন, "কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামত সুরক্ষিত রাখো।" হাসান বাসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ যখন কোনো জাতির ওপর তাঁর নিয়ামত বর্ষিত করেন, তিনি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলেন। তারা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তা হলে তিনি তো এমনিই তাদের নিয়ামত বাড়িয়ে দিতে সক্ষম। কিন্তু যদি তারা তাঁর নিয়ামত অস্বীকার করে, তা হলে তিনি কিন্তু এগুলোকে আযাব ও বিপদে পরিণত করতে সক্ষম।"[৫১৬]

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কৃতজ্ঞতা বলতে আসলে কী বোঝায়। মুখে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেই কি দায়িত্ব শেষ, নাকি আরো কিছু আছে? আসলে আমরা এখানে যে কৃতজ্ঞতা নিয়ে কথা বলছি, তা ব্যাপক বিস্তৃত। বান্দার সকল অবস্থা, কথা ও কাজ এর অন্তর্ভুক্ত। যেই শোকরকে আমরা আমাদের পাথেয় বানাতে চাই, তা প্রধানত তিন প্রকার।

ক. জিহ্বার দ্বারা শোকর : এর অর্থ হলো বান্দা সর্বদা মুখের দ্বারা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সেই সাথে যথাযথভাবে শুকরিয়া আদায়

[৫১৫] সূরা ইবরাহীম ১৪:৭
[৫১৬] উদ্দাতুস সাবিরীন, ১/৪৭

করার ব্যাপারে নিজের অপারগতার কথা স্বীকার করবে। আবু সুলাইমান বলেছেন, "মুখের দ্বারা আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করলে তাঁর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।"[৫১৭]

খ. অন্তরের দ্বারা শোকর : এর অর্থ হলো বান্দা সর্বদা অন্তরের দ্বারা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সেই সাথে যথাযথভাবে শুকরিয়া আদায় করার ব্যাপারে নিজের অপারগতার কথা স্বীকার করবে।

গ. কাজের দ্বারা শোকর : এর অর্থ হলো আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত আল্লাহরই নির্দেশিত পন্থায় ব্যবহার করা।

اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا

"হে দাউদের সন্তানগণ! তোমরা কৃতজ্ঞচিত্তে কাজ করে যাও।"[৫১৮]

আবু হাযিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে নিয়ামত বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে না, তা আসলে আযাব।"[৫১৯] অতএব, মুসলিম জামাতের কর্তব্য হলো এর সদস্যদেরকে মুখ, অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে শেখানো। সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) বলতেন :

هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝٤٠

"এটি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, আমাকে পরীক্ষা করার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, অকৃতজ্ঞ হই না। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের কল্যাণেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ।"[৫২০]

আল্লাহর নিয়ামত হারিয়ে ফেলার ভয়ে হক কথা বলা ছেড়ে দেওয়া বা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ থামিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমরা কঠোরভাবে সাবধান করছি। বরং এসকল কাজ জারি রাখলেই নিয়ামত স্থায়ী হবে এবং বৃদ্ধি পাবে।

[৫১৭] উদ্দাতুস সাবিরিন, ১/৪৯

[৫১৮] সূরা সাবা ৩৪:১৩

[৫১৯] জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, ১/২৪৫

[৫২০] সূরা আন-নামল ২৭:৪০

৬. সবর

ইসলামের জন্য কাজ করতে চাওয়া প্রতিটি ব্যক্তি যেন তার পাথেয়র ঝুলিতে পর্যাপ্ত সবর মজুদ রাখে। নাহলে সে এই রাস্তা থেকে সরে পড়বে এবং আখেরে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দ্বীনের কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ তার জায়গায় অন্য আরেকদল সত্যবাদী ও ধৈর্যশীল মুমিন এসে দ্বীনের কাজ চালিয়ে নিয়েই যাবে।

ইবনু কাসীর তাঁর লিখিত সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ বছর মক্কা নগরীতে অবস্থানকালে মানুষজনের ঘরে ঘরে ও মজলিসে এই বলে আহ্বান করেন, 'আমি আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত কে আমাকে আশ্রয় ও সাহায্য দিতে চায়? সে জান্নাত লাভ করবে।' আনসাররা তাঁর প্রতি ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত কেউ তাঁকে আশ্রয় ও সমর্থ্যন দিতে রাজি হয়নি। আল-আকাবাহ নামক এক স্থানে বাহাত্তর জন আনসার আসেন তাঁর সাথে দেখা করতে। নবীজি ﷺ তাঁদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁরা এই শর্ত গ্রহণ করে নিলে তাঁরা জান্নাত লাভ করবেন। তাঁদের মধ্যকার কনিষ্ঠতম সদস্য আসআদ ইবনু যুরারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, 'চিন্তাভাবনা করে দেখো, হে ইয়াসরিববাসী! তাঁকে আল্লাহর রাসূল জেনেই আমরা আমাদের উটগুলোকে (এখান পর্যন্ত এনে) ক্লান্ত করেছি। তাঁকে সাহায্য করার অর্থ হলো সমগ্র আরবকে অমান্য করা। এর অর্থ তোমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিবর্গের নিহত হওয়া এবং তোমাদের ওপর তরবারির আঘাত আসা। হয় তোমরা তা সহ্য করে নিয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করবে। আর যদি অনিশ্চিত ও ভীত থাকো, তা হলে তাঁকে তাঁর ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দাও। অতএব, এখন তাঁকে তোমাদের সিদ্ধান্ত জানাও। যেটাই করো না কেন, সে বিষয়ে তিনি আল্লাহর সামনে সাক্ষ্য দেবেন।' তাঁরা বললেন, 'সরে দাঁড়াও, হে আসআদ! আল্লাহর কসম! আমরা তাঁর সাথে এই শপথ কখনোই ভঙ্গ করব না।'"

যেই মুসলিম জামাত দ্বীন ইসলামকে সাহায্য করতে চায় এবং জান্নাত লাভ করতে চায়, তাদের অবশ্যই এ কাজের জন্য ও শত্রু মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট ধৈর্য ও সহ্যশক্তি থাকতে হবে। কিন্তু তা যদি ধৈর্য সম্পর্কে না জানে, ধৈর্যধারণের কোনো নিয়্যত না রাখে, তা হলে অবশ্যই নিজেদের অপারগতা মেনে নিয়ে এ কাজ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে আল্লাহর সামনে হয়তো তারা ওজর পেশ করতে পারবে এবং ইসলামের জন্যেও এটি বেশি কল্যাণকর হবে। আর নাহলে তারা ইসলামের পতাকা নিয়ে হৈ চৈ করে কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই আবার পতাকা মাটিতে ফেলে উল্টো ঘুরে দৌড় দেবে। এতে ছড়িয়ে পড়বে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা ও যুলুম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জেনে রেখো, বিজয় আসে ধৈর্যের মাধ্যমে।" (মুস্তাদরাক হাকিম : ৬৩০৪) বিজয় লাভ করতে চাইলে ধৈর্য ও অবিচলতা প্রদর্শন করতেই হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا

"এভাবে বানী ইসরাঈলের ধৈর্যধারণের কারণে তোমার প্রতিপালকের কল্যাণময় অঙ্গীকার পূর্ণ হলো।"[৫২১]

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

"যখন তারা ধৈর্য অবলম্বন করেছিল তখন আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ মুতাবেক সৎপথপ্রদর্শন করত, আর তারা আমার আয়াতসমূহের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস (ইয়াকীন) রেখেছিল।"[৫২২]

অতএব, মুসলিম জামাত যেন অবশ্যই এর সদস্যদের ধৈর্য শিক্ষা দেয়। তাদের ধৈর্যের প্রশিক্ষণের চাদরে ঢেকে নেয়। নবীজি ﷺ বলেন, "যে ধৈর্য ধরার চেষ্টা করে, সে তার কাজে আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হয়।"[৫২৩] জামাতের সদস্যদের শিখতে হবে যে, মুসলিম উম্মাহর কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ধৈর্যের বাহনে চড়তেই হবে। ঈমানের সকল স্তরে যাওয়ার রাস্তা হলো ধৈর্য। যে কিছু শিখতে যায়, তাকে ধৈর্য ধরে অধ্যয়ন ও মুখস্থ করতে হবে। যে গুনাহ ছাড়তে চায়, তাকে ধৈর্য ধরে সেই প্রচেষ্টায় লেগে থাকতে হবে। নিশ্চয় ধৈর্য ও অবিচলতা হলো সকল কল্যাণের চাবি এবং হিদায়াতের আলো। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"আর যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায়, তাদের আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব।"[৫২৪]

তা ছাড়া যেসব লক্ষ্য ইতোমধ্যেই অর্জিত হয়ে গেছে, সেগুলো ধরে রাখার জন্যও আরো ধৈর্য প্রয়োজন। যারা ধৈর্যসংগ্রামে ক্ষান্ত দেয়, তাদের আগের অর্জনগুলো হারিয়ে যায়। মানের অবনমন ঘটে আর অগ্রগতি পাল্টে যায় পশ্চাৎগতিতে।

যারা আল্লাহর রাস্তায় কাজ করে, তাদের জন্য ধৈর্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। দাঈ যদি দেখে কেউ তার দাওয়াতে সাড়া দিচ্ছে না, তা হলে তাকে ধৈর্য ধরতে হবে। তাদের কাজের প্রতিক্রিয়ায় কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থাকলেও ধৈর্য ধরতে হবে। শিক্ষকদেরকে শিক্ষার্থীর ভুলভ্রান্তি ও অমনোযোগের ব্যাপারে ধৈর্যশীল হতে

[৫২১] সূরা আল-আরাফ ৭:১৩৭

[৫২২] সূরা আস-সাজদাহ ৩২:২৪

[৫২৩] বুখারি : ১৪৬৯, আবু দাউদ : ১৬৪৬, তিরমিযি : ২০২৪

[৫২৪] সূরা আল-'আনকাবুত ২৯:৬৯

হবে। নেতাকে অবাধ্য অনুসারীদের ব্যাপারে ধৈর্যশীল হতে হবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকারীদের ক্ষতি সহ্য করার ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে হবে। আর মুজাহিদদের তো সব থেকে বেশি ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

"যুদ্ধ তোমাদের ওপর ফরয করা হলো, যদিও তোমরা তা অপছন্দ করো।"[৫২৫]

অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে আজকের যুগে ধৈর্য বেশি দরকারি। যেসব শত্রুদের সরিয়ে আমরা শরীয়ত কায়েম করতে চাই, সেসব শত্রুদের দ্বারা শাসিত দেশেই আমরা আমাদের দাওয়াত নিয়ে বাস করছি। তারা আমাদের ওপর মুহুর্মুহু আক্রমণ চালাবে। আমরা অবিচল না থাকলে তারা সহজেই আমাদের দাওয়াতকে সমূলে উপড়ে ফেলবে। পৃথিবী থেকে আমাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

সত্য বলা থেকে বিরত থেকে মিথ্যের সাথে আপস করাকে অনেকে আজকাল ধৈর্য ধরা বলে মনে করে। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এভাবে চুপ করে থাকাটা বরং আপমান, অপদস্থতা ও অসম্মান। ধৈর্যের সাথে এর কোনো দূরতম সম্পর্ক নেই। শরীয়ত আমাদের যে ধৈর্যের আদেশ দেয়, তা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

ক. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণে ধৈর্যধারণ : নফস যেখানে আরাম-আয়েশ চায়, দ্বীনের নির্দেশ পালনে সেখানে বিভিন্ন মাত্রায় কষ্ট করা লাগে। যেমন- হিসবাহ-র চেয়ে জিহাদ বেশি কঠিন। উযু করার চেয়ে সাওম পালন বেশি কঠিন। গরমকালে উযু করার চেয়ে শীতকালে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে উযু করা বেশি কঠিন। আবার মানুষভেদেও কষ্টের পরিমাণ বাড়ে কমে। যাদের পরিবার-পরিজনের পিছুটান আছে, তাদের কাছে হিজরত বেশি কঠিন। যার অন্তর কঠিন, তার কাছে সালাত আদায় করা তুলনামূলক বেশি কষ্টকর। আর সব ইবাদতের মধ্যে জিহাদ হলো সবচেয়ে কঠিন। এজন্যই অনেকে বলেছিল :

رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ

"হে আমাদের প্রতিপালক! কেন আমাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করলেন? আরেকটু সময় কেন দিলেন না?"[৫২৬]

তার মানে প্রতিটি মুসলিমকেই তার নফসকে ইবাদতে বাধ্য করতে কিছু না কিছু ধৈর্য ধরতেই হয়। ইবাদত শুরু করার পর সর্বোত্তম উপায়ে তা করার জন্যও ধৈর্য ধরতে হয়। ইবাদত শেষ করার পরও সে ব্যাপারে অহংকার না করার ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে হয়।

---

[৫২৫] সূরা আল-বাকারাহ ২:২১৬

[৫২৬] সূরা আন-নিসা ৪:৭৭

খ. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা পরিহার করতে ধৈর্যধারণ : এটি আরো কঠিন। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী, মানুষের নফস এমনিতেই গুনাহের প্রতি আগ্রহপ্রবণ। তার ওপর শয়তান আরো বেশি করে এ কাজে উৎসাহ দিতে থাকে। গুনাহ করতে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা অন্যকেও গুনাহের দিকে ডাকে। সমাজ পাপাচারে অভ্যস্ত হলে সমাজও গুনাহের কাজে প্রশ্রয় দেয়, এমনকি কখনো কখনো পাপাচারের জন্য প্রশংসাও করে। এমন অবস্থায় গুনাহ পরিহার করা বান্দার জন্য কতই-না কঠিন! ধৈর্যই সেই জিনিস, যা বান্দাকে পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে প্রতিহত করে। আযীযের স্ত্রীর খারাপ আহ্বানের মোকাবিলায় ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ধৈর্যধারণের ঘটনা আমাদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ।

إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

"নিশ্চয় যে আল্লাহকে ভয় করে আর ধৈর্যধারণ করে, এমন সৎকর্মশীলদের ফলাফল আল্লাহ কখনো নষ্ট করে না।"[৫২৭]

মুসলিম জামাতের উচিত তাদের সদস্যদের এই ধরনের ধৈর্য শিক্ষা দেওয়া। অন্যথায় পরাজয় নিশ্চিত। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সেনাপতি সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে রাদিয়াল্লাহু আনহু যথার্থই উপদেশ দিয়েছেন, "আমি আপনাকে ও আপনার সৈনিকদেরকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিচ্ছি। এটিই শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রস্তুতি এবং সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। আমি নির্দেশ দিচ্ছি যেন আপনি ও আপনার সৈনিকরা শত্রুদের বিরুদ্ধে সতর্ক হওয়ার চেয়ে নিজেদের গুনাহর বিরুদ্ধে অধিক সতর্ক হোন। কারণ গুনাহকেই শত্রুদের চেয়ে বেশি ভয় করা উচিত। নিশ্চয় মুসলিমরা জয়লাভ করে তাদের শত্রুদের গুনাহের কারণে। নাহলে আমরা শক্তিসামর্থ্যে তাদের ওপর কোনো প্রাধান্যই বিস্তার করতে পারতাম না। আমাদের সংখ্যা ও রসদ তাদের সংখ্যা ও রসদের মতো নয়। আমরা যদি গুনাহে তাদের সমান হয়ে যাই, তারা তাদের শারিরীক শক্তির মাধ্যমে আমাদের হারিয়ে দেবে। আমরা যদি তাদের তাকওয়ায় হারাতে না পারি, তা হলে শক্তি দিয়ে কখনোই তাদের হারাতে পারব না।" তিনি আরো বলেন, "আর এমনটা বলবেন না যে আমাদের শত্রুরা আমাদের চেয়ে বেশি খারাপ, আর আমরা গুনাহ করলে আল্লাহ তাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে পাঠাবেন না। কারণ এমনও অনেকবার ঘটেছে যে আল্লাহ এক জাতির বিরুদ্ধে তাদের চেয়েও মন্দ কোনো জাতি প্রেরণ করেছেন। যেমন ইহুদীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা অগ্নিপূজারি কাফিরদের প্রেরণ করেছিলেন। তারা তাদের ঘরের একেবারে ভেতর পর্যন্ত প্রবেশ করে বসে। আর এ ছিল এক প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা।"

---

[৫২৭] সূরা ইউসুফ ১২:৯০

মুসলিম জামাতের সদস্যদের শিখতে হবে কী করে পাপাচারকে ঘৃণা করতে হয়। তারা যদি অন্যায় থেকে নিজেদের মুক্ত করতে না শেখে, তা হলে ক্ষমতায় আরোহণ করার পর তারা নিজেরাই যালিম হয়ে বসবে। আরেকটি মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় কর্মীদের শিখতে হবে, তা হলো নেতৃত্বের লোভ ত্যাগ করা। মুসলিমদের ইতিহাসে নেতৃত্ব নিয়ে নিজেরা ঝগড়াঝাঁটি করে দুর্বল হয়ে পড়ার অনেক উদাহরণ আছে।

গ. বিপদ ও পরীক্ষার সময় ধৈর্যধারণ : এই অভ্যাস অর্জন না করলে বান্দা একসময় তাকদিরের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করার মতো কুফরিতে লিপ্ত হবে।

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝٢ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۝٣

"মানুষ কি মনে করে 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের অব্যাহতি দিয়ে দেওয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করে হবে না? অথচ তাদের পূর্বে যারা ছিল, আমি তাদের পরীক্ষা করেছিলাম। অতঃপর আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যেবাদী।"[৫২৮]

ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট করে মন্দগুলোকে কাফেলা থেকে ছুড়ে ফেলার জন্য এসব পরীক্ষার দরকার আছে। যাতে কাফেলা পরিপূর্ণরূপে সত্যবাদী ও ধৈর্যশীলদের কাফেলায় পরিণত হয়।

জীবন পুষ্পশয্যা নয়। এখানে রয়েছে মানুষকে আল্লাহর দ্বীন অনুযায়ী পরিচালিত করার কষ্টকর দায়িত্ব। আল্লাহর সৃষ্ট বিশ্বজগতের নিয়মই এমন যে, নেতৃত্বের আসন লাভের যোগ্য লোকেরাই তা লাভ করার হকদার। এজন্যই ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্যকারী পরীক্ষা দরকার। শুধুমাত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করবে :

مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

"তোমরা এখন যে অবস্থায় আছ, অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মুমিনদের এ অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না।"[৫২৯]

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝٣٧

[৫২৮] সূরা আল-'আনকাবূত ২৯:২-৩
[৫২৯] সূরা আলে ইমরান ৩:১৭৯

"যাতে আল্লাহ পবিত্র থেকে অপবিত্রকে আলাদা করে দেন। অতঃপর অপবিত্রদের একেকে অন্যের ওপর রাখবেন, সকলকে স্তূপীকৃত করবেন। অতঃপর এই সমষ্টিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এরাই হলো সর্বস্বান্ত।"[৫৩০]

ক্ষমতা লাভের যোগ্য হতে হলে মুসলিম জামাতের সদস্যদের ধৈর্যধারণ শিখতে হবে। মুসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর জাতির কাছে যা প্রচার করতেন, জামাতের সদস্যদের কাছেও দিনরাত তা শোনাতে হবে :

لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّـهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّـهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

"তোমরা আল্লাহর সাহায্য কামনা করো আর ধৈর্য অবলম্বন করো। জমিনের মালিক হলেন আল্লাহ। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছে করবেন, তাকে এর উত্তরাধিকারী বানাবেন। কল্যাণময় পরিণাম হচ্ছে মুত্তাকীদের জন্য।"[৫৩১]

মুসলিম জামাত যেন তার সদস্যদের শেখায় :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّـهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّـهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

"নাকি তোমরা এমন ধারণা পোষণ করো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের আগের লোকদের মতো অবস্থা তোমাদের সামনে আসেনি? তাদের অভাবের তীব্র তাড়না এবং মুসিবত স্পর্শ করেছিল। আর তারা এতদূর প্রকম্পিত হয়েছিল যে, নবী ও তার সঙ্গের মুমিনগণ বলেছিল, 'কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য?' জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।"[৫৩২]

জামাতের সদস্যরা যেন পরীক্ষা এলে বীর পুরুষের মতো বলতে পারে :

هَـٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّـهُ وَرَسُولُ

[৫৩০] সূরা আল-আনফাল ৮:৩৭

[৫৩১] সূরা আল-আরাফ ৭:১২৮

[৫৩২] সূরা আল-বাকারাহ ২:২১৪

""আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তো এরই ওয়াদা করেছিলেন। এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন।"[৫৩৩]

এমন লোকেরাই কেবল ঈমানের এই আমানত বহনের যোগ্য। আগুন যেভাবে ধাতু থেকে ভেজাল পরিষ্কার করে ফেলে, তাদের শত্রুরাও শীঘ্রই এভাবে দূর হয়ে যাবে। ধৈর্য ধরে কষ্ট সহ্য করার জন্য যেসব গুণাবলি দরকার, তা হলো :

১। তাকদিরের ব্যাপারে অভিযোগ ও বিদ্রোহ করা থেকে হৃদয়কে প্রতিহত করা। আল্লাহ তাকদিরে যা-ই রেখেছেন, তা সানন্দে মেনে নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির মঞ্জিল হাসিল করার জন্য সংগ্রাম করা।

২। ভয়ভীতি প্রকাশ করা ও হারাম কিছু বলা থেকে জিহ্বাকে প্রতিহত করতে হবে। আল্লাহ যা বলতে বলেছেন, তা বলার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজের মর্যাদা বাড়াতে চেষ্টা করতে হবে :

"ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন (নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য, আর তাঁর নিকটই আমাদের প্রত্যাবর্তন)।"[৫৩৪]

৩। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহের কাজ করা ও মাতম করা থেকে প্রতিহত করতে হবে। এসব কাজ আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশের লক্ষণ।

এই ধরনের ধৈর্য ধারণই তো আমাদের দরকার। আর তা কতই-না উত্তম পাথেয়!

وَاللَّـهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

"আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।"[৫৩৫]

৭. দুনিয়ার ওপর আখিরাতের প্রাধান্য

আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّـهِ بَاقٍ

"তোমাদের কাছে যা আছে, তা শেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা টিকে থাকবে।"[৫৩৬]

---

[৫৩৩] সূরা আল-আহযাব ৩৩:২২
[৫৩৪] সূরা আল-বাকারাহ ২:১৫৬
[৫৩৫] সূরা আলে ইমরান ৩:১৪৬
[৫৩৬] সূরা আন-নাহল ১৬:৯৬

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

"পার্থিব এ জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া কিছু নয়। আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত!"[৫৩৭]

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

"পার্থিব জীবন ছলনার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৫৩৮]

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

"বলো, 'পার্থিব ভোগ সামান্য। যে তাকওয়া অবলম্বন করে, তার জন্য আখিরাতই উত্তম। তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় করা হবে না।'"[৫৩৯]

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٧﴾

"কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দাও। অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী।"[৫৪০]

ক্ষণস্থায়ী ও তুচ্ছ দুনিয়াকে অগ্রাহ্য করে চিরস্থায়ী আখিরাতের জন্য কাজ করার উৎসাহ দেওয়া-সংক্রান্ত আয়াতে কুরআন ভর্তি। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থাকা ও আখিরাতের সুখ-শান্তি তালাশ করা পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "দুনিয়াবি জীবন (এর বিলাসিতা) ত্যাগ করার অর্থ হলো আখিরাতে মূল্যহীন কাজ পরিত্যাগ করা।"

নবীজি ﷺ বলেন, "আল্লাহর কসম! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া হলো সাগর থেকে আঙুলের আগায় করে তোলা পানির মতো।"[৫৪১]

তিনি আরো বলেন, "কবিদের কথার মধ্যে সবচেয়ে সত্য হলো কবি লাবীদের কথা, 'নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া সবই মিথ্যে।'"[৫৪২]

---

[৫৩৭] সূরা আল-আনকাবূত ২৯:৬৪

[৫৩৮] সূরা আলে ইমরান ৩:১৮৫

[৫৩৯] সূরা আন-নিসা ৪:৭৭

[৫৪০] সূরা আল-আ'লা ৮৭:১৬-১৭

[৫৪১] মুসলিম : ৭৩৭৬

[৫৪২] বুখারি : ৩৮৪১, মুসলিম : ৬০২৬

তিনি ﷺ বলেন, "এ দুনিয়ায় আছেটা কী? আমি এখানে একজন মুসাফিরের চেয়ে বেশি কিছু নই, যে কিছুক্ষণের জন্য গাছের ছায়ায় বসে আবার উঠে গিয়ে পথ চলতে লাগল।"[৫৪৩]

"আল্লাহর কাছে এই দুনিয়ার মূল্য একটি মশার পাখার সমান হলেও তিনি কোনো কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।"[৫৪৪]

"দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হও, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন।"[৫৪৫]

কুরআন-সুন্নাহ মানুষকে বারবার উৎসাহ দিয়েছে দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হয়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী কামিয়াবি হাসিল করতে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ

"মুত্তাকীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার উপমা হলো—তাতে আছে নির্মল পানির ঝরনা আর আছে দুধের নদী যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নদী আর পরিশোধিত মধুর নদী। তাদের জন্য সেখানে আছে সব ধরনের ফলমূল আর তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে ক্ষমা।"[৫৪৬]

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

"(মুত্তাকীদের বলা হবে) হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই আর তোমরা দুঃখিতও হবে না। তোমরা যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করেছিলে ও অনুগত ছিলে। সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো তোমরা আর তোমাদের স্ত্রীরা। তাদের কাছে চক্রাকারে পরিবেশন করা হবে থালা ও

[৫৪৩] তিরমিযি : ২৩৭৭, ইবনু মাজাহ : ৪১০৯
[৫৪৪] তিরমিযি : ২৩২০, ইবনু মাজাহ : ৪১১০
[৫৪৫] ইবনু মাজাহ : ৪১০২
[৫৪৬] সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৫

পানপাত্র। সেখানে তা-ই আছে মন যা চাইবে, আর চোখ যাতে তৃপ্ত হবে। তোমরা তাতে চিরকাল থাকবে। এই হলো জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমাদের। কারণ তোমরা (সৎ)কাজ করেছিলে। তোমাদের জন্য সেখানে আছে প্রচুর ফল, যা থেকে তোমরা আহার করবে।"[৫৪৭]

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۝ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

"নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে বাগান ও ঝরনাধারার মাঝে। প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার স্থানে। সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী (আল্লাহ)র নিকটে।"[৫৪৮]

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝

"কতক মুখ সেদিন উজ্জ্বল হিবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।"[৫৪৯]

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ۝ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۝ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۝

"কতক মুখ সেদিন হবে আনন্দে উজ্জ্বল। নিজেদের চেষ্টা-সাধনার ফলে সন্তুষ্ট। উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ জান্নাতে। সেখানে শুনবে না কোনো অনর্থক কথাবার্তা। সেখানে থাকবে প্রবহমান ঝরনা। সেখানে থাকবে উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন আসন। পানপাত্র থাকবে প্রস্তুত। সারি সারি বালিশ। আর থাকবে মখমল বিছানো।"[৫৫০]

নবীজি ﷺ বলেন, "তোমরা যেভাবে চাঁদ দেখো, তোমাদের প্রতিপালককেও তোমরা সেভাবে দেখতে পাবে। তাঁকে দেখে কখনো ক্লান্ত হবে না।"[৫৫১]

"জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া ও এতে যা আছে সবকিছু থেকে উত্তম।"[৫৫২]

"জান্নাত থেকে সর্বনিম্ন দূরত্বও দুনিয়ার সেই সকল ভূমি থেকে উত্তম যেসবের ওপর সূর্য

[৫৪৭] সূরা আয-যুখরুফ ৪৩:৬৮-৭৩
[৫৪৮] সূরা আল-কামার ৫৪:৫৪-৫৫
[৫৪৯] সূরা আল-কিয়ামাহ ৭৫:২২-২৩
[৫৫০] সূরা আল-গাশিয়াহ ৮৮:৮-১৬
[৫৫১] বুখারি : ৫৫৪, মুসলিম : ১৪৬৬
[৫৫২] বুখারি : ৬৪১৫

উদিত হয় ও অস্ত যায়।"[৫৫৩]

অতএব, এই দুনিয়া কোনো মুসলিমের স্থায়ী নিবাস হতে পারে না। এটি বরং পরীক্ষাক্ষেত্র। নবীজি ﷺ বলেন, "দুনিয়া হলো মুমিনের জন্য কারাগার আর কাফিরের জন্য জান্নাত।"[৫৫৪]

মুসলিমের নিবাস তো আরেক জায়গায়। তা সে জানে এবং সেটির জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। যেখানে ছিলেন স্বয়ং আদম (আলাইহিস সালাম)। মুমিনের সেই ঘরে পৌঁছতে যতটুকু নেক আমল দরকার, দুনিয়া থেকে সে এর চেয়ে বেশি কিছু চায় না। সেই ঘর হলো জান্নাত, যার প্রশস্ততা আসমান-জমিন সমতুল্য। সেই নিবাসে পৌঁছতে দুনিয়াবি খাহেশাত যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, মুমিন সেই বাধা পায়ে মাড়িয়ে সামনে এগিয়ে চলে।

আখিরাতে উপকার করে না, এমন সকল বিষয় পরিত্যাগ করাই হলো যুহদ। এজন্যই দুনিয়াবি সুখ-শান্তি কুরবানি করা অপরিহার্য। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যুহদ হলো আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ছোট করা।"[৫৫৫]

আরো বলা হয়, যুহদ হলো দুনিয়াকে খাটো করা ও মন থেকে এর প্রতি সকল ভালোবাসা মুছে ফেলা।

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "জ্ঞানবানগণের মতে, দুনিয়াবিমুখিতার অর্থ হলো হৃদয়কে এই দুনিয়া ত্যাগ করিয়ে আখিরাতে নিয়ে যাওয়া।"[৫৫৬]

তিনি আরো বলেন, "আখিরাত কামনা করা সম্ভব হতে পারে শুধুমাত্র দুনিয়াবিমুখ হওয়ার মাধ্যমে। আর দুনিয়াবিমুখ হওয়া সম্ভব দুটি জিনিসের দিকে ঠিকভাবে তাকালে। একটি হলো দুনিয়ার সংক্ষিপ্ততা, স্থায়িত্বহীনতা ও জঘন্যতা। আরেকটি হলো আখিরাতের নিশ্চয়তা, চিরস্থায়িত্ব, উৎকৃষ্টতা, এর সুখ-শান্তির মর্যাদা, আর দুনিয়ার সাথে এর তুলনা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٧﴾

> "কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দাও। অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী।"[৫৫৭]

ইবনুল কাইয়্যিম আরো বলেন, "দুনিয়ার প্রতি বান্দার ভালোবাসা ও আগ্রহ হলো

[৫৫৩] বুখারি : ২৮৯২
[৫৫৪] মুসলিম : ৭৬০৬
[৫৫৫] জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, ১/২৯১
[৫৫৬] মাদারিজুস সালিকিন, ২/১২
[৫৫৭] সূরা আল-আ'লা ৮৭:১৬-১৭

আল্লাহর আদেশ পালন ও আখিরাত কামনায় গড়িমসি করার সমানুপাতিক।"[৫৫৮]

কতই-না সত্যি কথা! এজন্যই ইসলামের কর্মীদের জন্য দুনিয়াবিমুখিতা এত অপরিহার্য পাথেয়। ইসলামের বিজয় আনতে যত কুরবানি প্রয়োজন, তা দুনিয়াবিমুখিতা ছাড়া অসম্ভব।

এই পাথেয়র অভাব থাকলে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। যেসব মুমিন দুনিয়া ভালোবাসে, তাদের তিরস্কার করে কুরআন বলে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদের আল্লাহর পথে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তোমরা আরো জোরে মাটি কামড়ে ধরো? তোমরা কি আখিরাতের স্থলে দুনিয়ার জীবনকেই বেশি পছন্দ করো? আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী তো অতি সামান্য।"[৫৫৯]

এই দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারীদের আল্লাহ কঠিনতম শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন :

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"তোমরা যদি অগ্রসর না হও, তা হলে তিনি তোমাদের ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করবেন। আর তোমাদের স্থলে অন্য সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন। অথচ তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৫৬০]

দুনিয়াবি জীবনের প্রতি ভালোবাসা, এর প্রতি হৃদয়ের আসক্তি ও এর পেছনে ব্যস্ত হয়ে পড়ার ফলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে আখিরাতের বিনিময়ে এ জীবন বিক্রয় করে দিলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা সহজ হয়ে পড়ে :

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে, তারা আল্লাহর

---

[৫৫৮] আল-ফাওয়ায়িদ, ১/১০০

[৫৫৯] সূরা আত-তাওবা ৯:৩৮

[৫৬০] সূরা আত-তাওবা ৯:৩৯

পথে জিহাদ করুক।"[৫৬১]

আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়া কুরবানি করতে শিখলেই কেবল আল্লাহর জন্য কষ্ট সহ্য করা যায় :

فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾

"কাজেই তুমি যা করতে চাও, তা-ই করো। তুমি তো কেবল এ পার্থিব জীবনেই কর্তৃত্ব খাটাতে পারো।"[৫৬২]

আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়া কুরবানি করতে জেনেছিলেন বলেই আনাস বিন নাযির রাদিয়াল্লাহু আনহু উহুদের যুদ্ধে আশিটি আঘাত পেয়ে শেষে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যান। তিনি উহুদের কাছ থেকে জান্নাতের গন্ধ পেয়ে তার দিকে দৌড়ে যান। ফলে আল্লাহ তাঁকে অন্য সবার আগে শাহাদাত দানে ধন্য করেন।

দুনিয়ার ওপর আখিরাতের প্রাধান্য দিয়ে অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল উমাইর বিন হুমাম রাদিয়াল্লাহু আনহু এর। তিনি বদরের যুদ্ধের দিন নবীজি ﷺ-কে বলতে শুনলেন, "ওঠো সেই জান্নাতের জন্য, যার প্রশস্ততা আসমান-জমিনের সমান।" তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাত আসমান-জমিনের সমান প্রশস্ত?" তিনি ﷺ জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।" উমর বললেন, "বাহ! দারুণ!" নবীজি ﷺ বললেন, "এ কথা কেন বললে?" 'উমাইর জবাব দিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি এর অধিবাসীদের একজন হতে চাই।" নবীজি ﷺ বললেন, "তুমি তাদের একজন হবে।" 'উমাইর (যুদ্ধে শক্তি পাওয়ার জন্য) কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "খেজুর খেতে যত সময় লাগবে, ততক্ষণ আমি বেঁচে থাকলে তো বড্ড দেরি হয়ে যাবে!" তিনি খেজুর ছুড়ে ফেলে লড়াইয়ে চলে গিয়ে শহীদ হয়ে গেলেন।[৫৬৩]

এই ধরনের মানুষের আজ আমাদের বড় অভাব। এই ধরনের লোকেরাই কেবল ইসলামের জন্য কাজ করতে সক্ষম। সাহসিকতা, নির্ভীকতা ও কুরবানিতে আমরা কখনোই এমন হতে পারব না, যদি না আমরা দুনিয়াবিমুখিতা ও আখিরাত কামনার গুণ অর্জন করি। হাদীস ও সীরাতের বইগুলো এরকম মানুষদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে ভরপুর, যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়াবি জীবন বিক্রয় করে দিয়েছেন। জাগতিক যেসব বন্ধন আমাদের পেছন থেকে টেনে ধরে, সেগুলোকে অগ্রাহ্য করতে না শিখলে আমরা কখনোই এমন কুরবানি করতে পারব না।

[৫৬১] সূরা আন-নিসা ৪:৭৪
[৫৬২] সূরা ত-হা ২০:৭২
[৫৬৩] মুসলিম : ১৯০১

দুনিয়াবিমুখিতা (যুহদ) বলতে আমরা হালাল সম্পদ-খাদ্য-বিবাহ ত্যাগ করা বোঝাচ্ছি না। মাথা নিচু করে অসম্মানিতের মতো বেশভূষা পরে চলাফেরা করাও বোঝাচ্ছি না। আমরা যেই যুহদ নিয়ে আলোচনা করছি, তার মূল কথা তিনটি :

১. হারাম ত্যাগ করা। এটি ফরযে আইন।

২. অপছন্দনীয় জিনিস এবং অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসও পরিহার করা। মুসলিম জামাতের সদস্যদের এই গুণ অর্জন করা বাঞ্ছনীয়। আমাদের এসব বিষয়ের খুব একটা দরকার নেই। আমাদের ঈমানী আন্দোলনকে এগুলো পিছিয়ে দেবে।

৩. সাধারণভাবে নিরাসক্ত থাকা। কোনো জিনিসের মালিক হওয়া, কিন্তু অন্তরকে তার সাথে সেঁটে না ফেলা। দুনিয়াবি কোনো প্রাপ্তি যদি ধরা দিয়ে আবার হারিয়ে যায়, তা হলে তার জন্য একেবারে ভেঙে না পড়া। আবার দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কোনো প্রাপ্তি হাতে এলে খুশিতে ফেটে না পড়া।

আমাদের ওয়ালা' (মিত্রতা)

আমাদের ওয়ালা' হলো আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল ﷺ এবং মুমিনদের প্রতি

اللَّـهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

"আল্লাহ মুমিনদের ওলি (অভিভাবক, রক্ষক, বন্ধু)। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন।"[৫৬৪]

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّـهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾

"আল্লাহই হলেন আমার ওলি, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আর তিনিই সৎকর্মশীলদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।"[৫৬৫]

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّـهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا

"এর কারণ এই যে, আল্লাহ হলেন ঈমানদারদের মাওলা।"[৫৬৬]

قُلْ أَغَيْرَ اللَّـهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

"বলো, 'আমি কি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ওলি বানিয়ে নেব? অথচ তিনিই খাওয়ান। তাঁকে খাওয়ানো হয় না।"[৫৬৭]

আল্লাহ হলেন ঈমানদারদের রক্ষাকর্তা। তিনিই সৃষ্টি করেন, তিনিই রিযিক দেন। তিনি জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনিই সত্যের দিকে পথ দেখান ও সত্যপন্থীদের বিজয় দান করেন। তিনি তাওবা কবুল করেন ও বিপদ দূর করেন। তিনি অণু পরিমাণ ভালো কাজও কবুল করেন এবং তা সম্পাদনকারীকে পুরস্কৃত করেন। তিনি অসংখ্য গুনাহ ক্ষমা করেন। মুনকার-নাকিরের প্রশ্নের সঠিক জবাব তিনিই মুমিন বান্দাদের জানান এবং তাদের

[৫৬৪] সূরা আল-বাকারাহ ২:২৫৭
[৫৬৫] সূরা আল-আরাফ ৭:১৯৬
[৫৬৬] সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১১
[৫৬৭] সূরা আল-আনআম ৬:১৪

সাহায্য ও নিরাপত্তা দেন। বিচারদিবসে যখন সকলে তাঁর সামনে কম্পমান থাকবে, তখন তিনিই মুমিন বান্দাদের প্রশান্ত রাখেন। তিনি মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশ করান ও বাকিদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। তা হলে কেন আমরা আল্লাহর অভিভাবকত্ব চাইব না? তিনি এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের ত্যাগ করলে আমরা কার কাছে যাব, আমাদের কী অবস্থা হবে? আমরা কেবল তাঁর কাছে একান্ত বিনীতভাবে দুআ করতে পারি, যা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) করেছিলেন :

أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾

"আপনিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার ওলি। আপনি মুসলিম অবস্থায় আমার মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"[৫৬৮]

এটিই সঠিক অবস্থান। জগতের সকল কিছুর প্রতি আনুগত্য ও মিত্রতা উপড়ে ফেলে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্য ও মিত্রতা গড়তে হবে।

আল্লাহ যেহেতু মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তাই কুরআনের চল্লিশটি আয়াতে নবীজির আনুগত্যকে আল্লাহ তাঁর নিজের আনুগত্যের সাথে সংযুক্ত করেছেন। তিনি তাঁর প্রতি ভালোবাসাকে নবীজি ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার সাথে যুক্ত করেছেন। আদেশ দিয়েছেন আমরা যেন নবীজি ﷺ-কে আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশি ভালোবাসি।

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

"নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ।"[৫৬৯]

আমাদের দায়িত্ব হলো নিঃস্বার্থভাবে নবীজির প্রতি ওয়ালা (আনুগত্য ও মিত্রতা) প্রদর্শন করা ও তাঁকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসা। তা না করার কী যুক্তি থাকতে পারে? আমরা নিজেরা নিজেদের জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, আর তিনি আমাদের হাত ধরে জান্নাতে টেনে নিচ্ছেন। আমাদের নফস যখন জাহান্নামে লাফ দিতে উদ্যত, তিনি তখন ঢাল হয়ে আমাদের রক্ষা করেন। এজন্যই তিনি উমর ইবনুল খাত্তাবকে রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁকে নিজের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে।

আমাদের আনুগত্য ও মিত্রতা হলো দয়াময় আল্লাহর প্রতি যিনি সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন, এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি যিনি আল্লাহর হিদায়াত আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন :

---

[৫৬৮] সূরা ইউসুফ ১২:১০১

[৫৬৯] সূরা আল-আহযাব ৩৩:৬

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

"বলো, 'যদি তোমাদের পিতারা, আর তোমাদের সন্তানেরা, আর তোমাদের ভাইয়েরা, আর তোমাদের স্ত্রীরা, আর তোমাদের গোষ্ঠীর লোকেরা আর ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর তোমরা যে ব্যবসায় মন্দার ভয় করো, আর বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাসো, (এসব) যদি তোমাদের নিকট প্রিয়তর হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তা হলে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের কাছে নিয়ে আসেন।' আর আল্লাহ অবাধ্য আচরণকারীদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।"[৫৭০]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ছাড়া অন্য যে-কোনো কিছুর আনুগত্য ও ভালোবাসা আমাদের হৃদয় থেকে সমূলে উচ্ছেদ হলো। মুমিন বান্দা তার সকল ভালোবাসা নির্ধারিত রাখে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং অপেক্ষা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিটি নির্দেশে ঝাঁপিয়ে পড়ার :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾
وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

"নিশ্চয় তোমাদের ওলি কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে আর আল্লাহর কাছে অবনত হয়। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারগণকে ওলি হিসেবে গ্রহণ করবে, (সে দেখতে পাবে যে) আল্লাহর দলই বিজয়ী।"[৫৭১]

الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই।"[৫৭২]

আল্লাহ মুমিনদেরকে আদেশ নিয়েছেন যেন তারা পরস্পরের প্রতিরক্ষা করে, একে অপরকে ভালোবাসে, সাহায্য করে; অর্থাৎ পরস্পরের আওলিয়া হয়ে যায়। তারা সীসাঢালা প্রাচীরের মতো। তাদের আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা, চেতনা, নীতি, উদ্দেশ্য, বিশ্বাস, কার্যপদ্ধতি, ঐতিহ্য, অভ্যাস একইরকম। মুমিনরা সকলে একটিই দল। তাদের সকলের অন্তরের সকল ভালোবাসা ও আনুগত্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি।

[৫৭০] সূরা আত-তাওবা ৯:২৪
[৫৭১] সূরা আল-মাইদাহ ৫:৫৫-৫৬
[৫৭২] সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১০

এটিই ঐক্যবদ্ধকারী সত্যিকারের বন্ধন। আকীদা ছাড়া অন্য যত গোত্রীয়, রক্ত সম্পর্কীয়, জাতীয়, ভাষাগত ও চামড়ার রঙভিত্তিক বন্ধন আছে, সবই জাহিলি বন্ধন। এই সকল জাহিলি বন্ধন ইসলামের পায়ের নিচে।

ইসলাম এসকল চেতনা ধ্বংস করে একমাত্র মহত্তম বন্ধনে মুসলিমদের আবদ্ধ করেছে। আরব মুসলিমের ওপর অনারব মুসলিমের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালো চামড়ার মুসলিমের ওপর সাদা চামড়ার মুসলিমের প্রাধান্য নেই। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি তাকওয়ার পরিমাণ। মুমিনরা তাদের আনুগত্য নির্ধারিত রাখে কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি :

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

> "যারা অগ্রবর্তীদের পরে (ইসলামের ছায়াতলে) এসেছে, তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আর আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন, যারা ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রবর্তী হয়েছে। আর যারা ঈমান এনেছে, তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি বড়ই করুণাময়, অতি দয়ালু।"[৫৭৩]

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালে আসন্ন সকল মুমিনদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা। সকল মিথ্যে বন্ধন অদৃশ্য হয়ে গিয়ে শুধু ঈমানের বন্ধনে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি। আমাদের ঈমানের উৎস একই। আমাদের কার্যপদ্ধতি একই। ভালো-মন্দ পার্থক্য করার জন্য আমাদের মানদণ্ড একই। আমাদের সার্বিক গঠনই সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কাঠামো।

কোনো মুসলিম দুর্বল হয়ে গেলে তার ভাইরা তাকে শক্তি জোগায়। কারো পা হড়কে গেলে অন্যরা টেনে তুলে ধরে। কেউ ভালো কাজে এগিয়ে গেলে ভাইয়েরা তাকে সাহায্য করে। এই বন্ধন মুসলিমদের দেয় সর্বোচ্চ শক্তি। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য, ভালোবাসা ও সুরক্ষা আসে এর মাধ্যমে। শত্রুরা বুঝতে পারে যে, ঐক্যের এই পবিত্র বন্ধন ভেদ করে খঞ্জরের আঘাত প্রবেশ করানো অসম্ভব। আমাদের শক্তি কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। আমাদের একমাত্র বন্ধন ঈমানের বন্ধন। আমরা এই বন্ধনকে অবজ্ঞা করলে আল্লাহ আমাদের পরিত্যাগ করবেন। আমরা হয়ে যাবো বর্ণ, জাতি, ভাষা, দেশ ও রাজনৈতিক সমর্থ্যনের ভিত্তিতে খণ্ড-বিখণ্ড; বাতাসে এলমেলো উড়তে থাকা শুকনো পাতা। নবীজি ﷺ বলেন, "ঈমানের মজবুততম কড়া হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তাঁর শত্রুদের প্রতি শত্রুতা। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং তিনি যা অপছন্দ করেন সেসবের প্রতি ঘৃণা।"[৫৭৪] বান্দার ঈমানের পরিমাণই হলো আল্লাহ ও রাসূলের ﷺ প্রতি তার আনুগত্যের পরিমাণ।

---

[৫৭৩] সূরা আল-হাশর ৫৯:১০

[৫৭৪] নাওয়াদিরুল উসুল, ১/১৫

আমাদের 'আদা' (শত্রুতা)

আমাদের 'আদা' হলো যালিমদের (কাফির, মুশরিক, ফাসিক) বিরুদ্ধে

আমাদের শত্রুতা হলো যালিমদের অর্থাৎ সীমালঙ্ঘনকারীদের সাথে। যুলুম দুই রকমের :

১. যুলম আকবার, বা বড় যুলুম। এ ধরনের যুলুম হলো কুফরি।

২. যুলম আসগার, বা ছোট যুলুম। পাপাচারী মুসলিম কর্তৃক সংঘটিত পাপ এই যুলুমের অন্তর্ভুক্ত।

কাফিরদের সাথে আমাদের পূর্ণ শত্রুতা ছাড়া আর কিছুই নেই। তারাও আমাদের সাথে শত্রুভাবাপন্ন।

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

"শত্রুতাবশত বিদ্বেষ তাদের মুখ থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর তাদের অন্তর যা লুকিয়ে রাখে, তা আরও ভয়ঙ্কর।"[৫৭৫]

يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ

"যদি তাদের সাধ্যে কুলায় তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে দিচ্ছে।"[৫৭৬]

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّـهِ بِأَفْوَاهِهِمْ

"তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূর নির্বাপিত করে দিতে চায়।"[৫৭৭]

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

---

[৫৭৫] সূরা আলে ইমরান ৩:১১৮

[৫৭৬] সূরা আল-বাকারাহ ২:২১৭

[৫৭৭] সূরা আস-সফ ৬১:৮

"ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা কখনোই তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতদিন না তোমরা তাদের দ্বীন ধর্মাদর্শ অনুসরণ করছো।"[৫৭৮]

لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

"মুমিনগণ যেন মুমিনগণকে ছেড়ে কাফিরদের আওলিয়া (রক্ষক, সাহায্যকারী, অভিভাবক, বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ না করে।"[৫৭৯]

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

"আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায় তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতাকারীদের ভালোবাসে। হোক না এই বিরোধীরা তাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী।"[৫৮০]

ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "হোক না এই বিরোধীরা তাদের পিতা এই অংশে আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কথা বলা হচ্ছে যিনি বদরের জিহাদে তাঁর পিতাকে হত্যা করেন। আর অথবা পুত্র এই অংশে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা বলা হয়েছে, যিনি সেই একই জিহাদে তাঁর পুত্র আব্দুর রহমানকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু আনহু, যিনি তখনও মুশরিক ছিলেন) প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিলেন। অথবা তাদের ভাই এই অংশে মুসআব বিন উমাইরের রাদিয়াল্লাহু আনহু কথা বলা হচ্ছে, যিনি বদরের জিহাদে আপন ভাই উবাইদ বিন উমাইরকে হত্যা করেন। অথবা তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী অংশে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা বলা হচ্ছে, যিনি একই দিনে তাঁর এক আত্মীয়কে কতল করেন। এ ছাড়াও হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আলীও রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেদের আত্মীয়দের মধ্য থেকে উতবাহ, শাইবাহ ও ওলিদ বিন উতবাহকে হত্যা করেন। আল্লাহই ভালো জানেন।"[৫৮১]

ইসলাম আল্লাহর দলকে শয়তানের দলের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করে। ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে যে একজন কাফিরের সাথে একজন মুসলিমের অবস্থান কী হবে। তা হলো শত্রুতা, বিদ্বেষ, কঠোরতা। কুফফারদের প্রতি একটুও ঝোঁকা যাবে না, করা যাবে না

---

[৫৭৮] সূরা আল-বাকারাহ ২:১২০

[৫৭৯] সূরা আলে ইমরান ৩:২৮

[৫৮০] সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮:২২

[৫৮১] তাফসির ইবনু কাসির, ৮/৫৪

তাদের দ্বীনের সাথে কোনো সমঝোতা।

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

"তোমরা যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। তা হলে আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে।"[৫৮২]

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۝

"তারা চায় যে তুমি নমনীয় হও, তা হলে তারাও নমনীয় হবে।"[৫৮৩]

কাফিরদের প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং তাদের সাথে সমঝোতা করা ইসলামে হারাম। আল-ওয়ালা বা মিত্রতার দুটি রূপ আছে। প্রকাশ্য ও গোপন। অন্তরে কুফফারদের প্রতি মিত্রতা গোপন থাকলে তা কুফর আকবার বা বড় কুফর হবে। অর্থাৎ তা প্রকাশ না করলেও এই মনোভাব পোষণকারী ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। আর প্রকাশ্যে মিত্রতা করলে সেটি শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী ক্ষেত্র বিশেষে বড় কুফর বা সাধারণ গুনাহ হতে পারে। কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কেউ পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য মুসলিমদের গোপন তথ্যাদি শত্রুদের কাছে পাচার করলে তাকে কাফির বলে সাব্যস্ত করা হবে না। এমন ঘটনাই ঘটেছিল হাতিব বিন আবী বালতার রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে। তিনি মুরতাদ হওয়ার উদ্দেশ্যে তথ্য পাচার করার চেষ্টা করেননি।" কুরতুবীর উল্লেখিত এই ঘটনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে কুফফারদের প্রতি সঠিক আচরণ হলো তাদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করা।

كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّـهِ

"আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের আর তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়েছে, যে পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছ।"[৫৮৪]

কিন্তু কুফরের চেয়ে কম মাত্রার গুনাহ করা মুসলিম (যেমন : ফাসিক বা বিদআতি) এদের ব্যাপারে বিধান কী? আমরা কি তাদের ইসলামের কারণে তাদের ভালোবাসব, না গুনাহের কারণে ঘৃণা করব? আমরা কি আমাদের বন্ধুত্বের হাত তাদের দিকে বাড়িয়ে দেব, নাকি শত্রুতা পোষণ করব?

---

[৫৮২] সূরা হুদ ১১:১১৩

[৫৮৩] সূরা আল-কলাম ৬৮:৯

[৫৮৪] সূরা আল-মুমতাহিনা ৬০:৪

ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আল্লাহ তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে দ্বীন সম্পূর্ণরূপে শুধু আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়। অতএব, ভালোবাসা থাকতে হবে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বাধ্যগত বান্দাদের প্রতি এবং শত্রুতা থাকতে হবে তাঁর শত্রুদের প্রতি। তাঁর বাধ্যগত বান্দারা মর্যাদাসম্পন্ন আর তাঁর শত্রুরা মর্যাদাহীন। ঈমানদারের জন্য পুরস্কার আর তাঁর শত্রুদের জন্য সকল শাস্তি। কিন্তু কোনো মানুষের মধ্যে যদি ভালো-খারাপ, আনুগত্য-বিদ্রোহ, সুন্নাহ-বিদআত দুই রকমের বৈশিষ্ট্যই থাকে, তা হলে তার মধ্যকার ভালোর পরিমাণ অনুযায়ী তার সুরক্ষা ও বন্ধুত্ব প্রাপ্য। আর তার মধ্যকার মন্দের পরিমাণ অনুযায়ী তার শত্রুতা ও শাস্তি প্রাপ্য। এই মূলনীতির ওপর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত একমত। শুধুমাত্র খাওয়ারিজ, মু'তাযিলা ও এসব ফির্কার অনুসারীরাই এ মূলনীতির বিরোধিতা করতে পারে। এই ভ্রান্ত ফির্কার লোকেরা মানবজাতিকে কেবল দুটি ভাগে ভাগ করে। এক দল শুধুই পুরস্কার লাভের যোগ্য, আরে দল শুধুই শাস্তি লাভের যোগ্য।”[৫৮৫]

[৫৮৫] মাজমু আল-ফাতাওয়া, ২৮/২০৯

আমাদের সংঘবদ্ধতা

আমরা একত্রিত হব একটি মাত্র লক্ষ্য নিয়ে, একই আকীদার ভিত্তিতে এবং একই বুদ্ধিবৃত্তিক পতাকাতলে।

জামাত-সংক্রান্ত আমাদের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে, শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত একটি সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া আমাদের লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব। আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের অনেক বিধান দলবদ্ধ না হয়ে একাকী আদায় করা অসম্ভব। শরীয়ত বলে, একটি ফরয পালনের জন্য যে উপায়-উপকরণ অপরিহার্য, সেটি অর্জন করাও ফরয। আমাদের আদেশ করা হয়েছে ভালো কাজ, তাকওয়া ও আল্লাহর রজ্জু ধরার ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য করার জন্য। আমরা আরো দেখিয়েছি যে, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা ফরযে আইন, যা একজন মুসলিমও অবহেলা করতে পারবে না।

অতএব, সম্মিলিত প্রচেষ্টা হলো ইসলামি আন্দোলনের একটি জরুরি ভিত্তি। এর ফলে শক্তি বজায় থাকে। অন্যথায় ছাড়া ছাড়া হয়ে এলমেলো কাজ করলে আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এটাও ভাবতে হবে যে, যেমন তেমন একটা দল গড়ে তুললেই লক্ষ্য অর্জন হবে কি না। অন্য কথায় বললে, দল গঠনের এমন কোনো পদ্ধতি কি আছে, যেভাবে দল গড়লে উল্টো দুর্বলতাই বৃদ্ধি পাবে? মুসলিমদের এমন কোনো ফিরকা কি আছে, যাদেরকে বর্জন করাটাই আখেরে অধিক কল্যাণকর?

প্রশংসনীয় সম্মিলিত প্রচেষ্টা হলো সেগুলো, যার ফলে হালাল মাধ্যম ব্যবহার করে জামাতের লক্ষ্য পূরণে সহায়তা হয়। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি বা দলের সাথে জোট করার কারণে কাজ পিছিয়ে যায়, আল্লাহর সাহায্য আসা বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে এই ধরনের সম্মেলন নিন্দনীয়।

শরীয়তের আমাদের যেমন দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার নির্দেশ দেয়, তেমনি কাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আর কাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যাবে না—এ বিষয়েও নির্দেশ দেয়। আমাদের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। কোনো চরমপন্থার দিকে যাওয়া যাবে না। এলোপাথাড়ি যার তার সাথে হাত মেলালেই হবে না। আবার একটু থেকে একটু ভুলের কারণেই কারো সাথে হাত মেলানো ত্যাগ করা যাবে না। অতি গ্রহণশীলতাও ঠিক

নয়, অতি বর্জনশীলতাও ঠিক নয়। কোনটি গ্রহণ করতে হবে, আর কোনটি বর্জন করতে হবে—তা ঠিক ঠিকভাবে বুঝে নেওয়া আমাদের কর্তব্য।

শরীয়তের বিধিনিষেধ, উম্মাহর অতীত-বর্তমানের বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলনের ইতিহাস, আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা, চারপাশের বাস্তবতা দেখে আমরা তিনটি স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারি। গ্রহণযোগ্য ঐক্যের বৈশিষ্ট্য হলো :

১। লক্ষ্যের ঐক্য

২। আকীদার ঐক্য

৩। আল্লাহ তাআলার দ্বীনের বুঝের ঐক্য

এই তিনটি শর্ত পূরণ হয়ে গেলে মত ও পদ্ধতির ভিন্নতা কোনো সমস্যা করবে না। এই তিনটি বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে মতভেদ হতেই পারে। সেগুলো ঐক্যের পথে কোনো বাধা নয়। কিন্তু এই তিনটি বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলে কোনো ঐক্য হতে পারে না। শাখাগত ও ফিকহি মাসয়ালায় মতপার্থক্য থাকলে অসুবিধে নেই। আমাদের সালাফগণ কয়েক শতাব্দী ধরে অনেক ফিকহি মাসয়ালায় মতপার্থক্য করেছেন। হারাম মাসগুলোতে যুদ্ধ করা জায়েয কি না এ নিয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেন শুধুমাত্র ইহুদী, নাসারা ও মাজুসীদের থেকেই জিযিয়া নেওয়া যাবে। কেউ বলেন জাযিরাতুল আরবের বাইরে অবস্থানকারী পৌত্তলিক ও অন্যান্য কাফিরদের থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে। এমন বৈচিত্র্যের আরো অসংখ্য উদাহরণ আছে। যেমন : কত দূরত্ব গেলে সালাত কসর করতে হবে, বিসমিল্লাহ সশব্দে পড়তে হবে নাকি নিঃশব্দে ইত্যাদি।

যেসব মতভেদকে আলিমগণ বলেন 'ইখতিলাফুত তানাউয়ু', সেগুলো একই জামাতের সদস্যদের মধ্যেও থাকতে পারে। পক্ষান্তরে, জামাতের সাধারণ কর্মনীতির যেসব বিষয় শরীয়তের বিপরীত নয় এবং সঠিক, সেগুলো সকল সদস্য মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

কিন্তু যেসব মতপার্থক্য আবার 'ইখতিলাফ তাদ্বাদ', তা হলে দুই পক্ষের যে-কোনো একটির সাথে ঐক্য জায়েয হবে না। ভুল দলটিকে সঠিকটির ব্যাপারে জানাতে হবে। তারা সঠিক পথে ফিরে আসলে জামাতে তাদের সাদরে বরণ করা হবে। যদি তারা ভুলের ওপরই অটল থাকে, তা হলে তাদের বর্জন করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। এ ধরনের মতপার্থক্যের উদাহরণ হলো মিউজিকের বৈধতা, মু'তা বিবাহের বৈধতা, আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে অপব্যাখ্যা করা ইত্যাদি। এমনটা বলা যাবে না যে, অতীতে কিছু আলিম এরকম মত দিয়েছেন বলে সেগুলো বৈধ হয়ে গেছে অথবা ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করা যাবে না। বরং, যে-সকল আলিম ইজতিহাদ করে এসকল মতে পৌঁছেছিলেন, তাঁরা ভুল করেছিলেন। এসব বিষয়ে সঠিক মত এখন উলামা, তুল্লাব ও আওয়াম সবার

কাছেই পরিষ্কার। কোনো আলিমের মত ভুল হিসেবে প্রমাণিত হওয়ার পর তার অনুসরণ করা ঠিক নয়। আজকেও যে এসব ভুল মতের অনুসরণ করবে, তাকে সঠিক মত জানাতে হবে। আর সে ভুল মতে অটল থাকলে তাকে জামাতে গ্রহণ করা হবে না।

এখন উল্লেখিত শর্ত তিনটির ব্যাপারে আলোচনা করা যাক। লক্ষ্যের ঐক্য, আকীদার ঐক্য, আল্লাহ তাআলার দ্বীনের বুঝের ঐক্য।

যাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া অন্য কিছু, তাদের জামাতে গ্রহণ করা যাবে না। যারা গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, পার্থিব অর্জন লাভ করতে চায়, নিজেদের খেয়াল-খুশি পূরণ করতে চায়, তাদের আমরা প্রত্যাখ্যান করি।

নবীজি ﷺ যখন বনু আমর বিন সা'সা' গোত্রকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন, তারা একটি শর্ত দিতে চাইল। তা হলো নবীজির মৃত্যুর পর আরবের রাজত্ব তাদের হাতে দিতে হবে। নবীজি ﷺ তাদের শর্ত প্রত্যাখ্যান করে তাদের ফিরিয়ে দেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির বদলে পার্থিব লাভ অন্বেষণকারীদের তিনি গ্রহণ করেননি।

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনকে চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বানায় না, এমন প্রত্যেককে বর্জন করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা সকল জাতীয়তাবাদী ও সেক্যুলারিস্টদের প্রত্যাখ্যান করি। বরং আমরা তাদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করি। আমরা তাদেরও প্রত্যাখ্যান করি, যারা শুধু পার্থিব জ্ঞান হাসিলেই ব্যস্ত থাকে, অথবা নিজেদের প্রবৃত্তিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে, অথবা প্রকাশ্যে কবীরা গুনাহ করতেই থাকে। আর কেউ যদি সগীরা গুনাহ বা পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তা হলে সেই গুনাহের ধরন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে তাকে গ্রহণ করা কি জামাতের জন্য কল্যাণকর নাকি অকল্যাণকর। আকীদার মৌলিক বিষয়গুলোতে দ্বিমতকারীদেরকেও জামাতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। কোনো পরিস্থিতিতেই কুফফার ও বিদআতিদের আমাদের জামাতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

নবীজি ﷺ বিদআতি গোষ্ঠী খাওয়ারিজদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ করেছেন। অথচ তারা সালাত আদায় করে, সাওম পালন করে, কুরআন তিলাওয়াত করে। সাহাবাগণ খাওয়ারিজদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, তাদের হত্যা করেছেন, আর তা করে সন্তুষ্ট থেকেছেন। যারা তাদের সাথে লড়াই করতে অস্বীকৃতি জানায়, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাদের সাথে দূরত্ব বজায় রেখেছেন। এটি চিরন্তন বিষয়। আকীদার সকল বিষয়ে যারা সালফে সালিহীনের অনুসরণ করে না, সেসব বিদআতিদের বর্জন করা আমাদের কর্তব্য। খাওয়ারিজ, শিয়া, সুফি, মুরজিয়াহ, মুশাব্বিহা, মুআত্তিলাহ, মুতাওয়াক্কিফাহ (যারা মুখে ইসলামের ঘোষণাদানকারীদের সত্যিকার মুমিন বা কাফির বলে ঘোষণা করতে অস্বীকৃতি জানায়) এদের কাউকে আমরা গ্রহণ করব না। তাদেরও প্রত্যাখ্যান করা হবে, যাদের দ্বীনের বুঝ বিকৃত। আকীদার ক্ষেত্রে সালফে সালেহীনদের

সাথে দ্বিমতকারী ও দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় উদ্ভাবনকারীদের সাথে আমরা হাত মেলাব না। আমাদের লক্ষ্য, আমাদের বুঝ, আমাদের ওয়ালা' ও বারাআ' এর ক্ষেত্রে দ্বিমতকারীদের আমরা প্রত্যাখ্যান করি। যারা ইসলাম বহির্ভূত কোনো পন্থায় কাজ করতে চায়, যেমন রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করা, তাদেরও আমরা প্রত্যাখ্যান করি।

কৃপণতা ও ভীরুতার কারণে যাকাত দিতে ও জিহাদ করতে অস্বীকার করা এক ব্যক্তির বায়আত গ্রহণ করেননি রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি বলে দেন, "যাকাতও না, জিহাদও না! তা হলে তুমি জান্নাতে যাবে কী দিয়ে?"[৫৮৬] যাকাত, জিহাদ, হিসবাহ, দাওয়াত ইত্যাদির প্রতি যারা বিমুখ হয়, তাদের প্রত্যাখ্যান করা আমাদের কর্তব্য ও অধিকার। এজন্য কেউ আমাদের তিরস্কার করার অধিকার রাখে না। এখানে সাকীফ গোত্রের উদাহরণ টানা যাবে না, যারা যাকাত না দেওয়া ও জিহাদ না করার শর্তে ইসলাম কবুল করেছিল। নবীজি ﷺ তাদের বায়আত গ্রহণ করলেও বলেছিলেন, "তারা (একসময়) যাকাত দেবে ও জিহাদ করবে।"[৫৮৭] আল্লাহ তাআলা তাঁকে ওহির মাধ্যমে বিষয়টি জানিয়ে দেন। তাই তিনি তাদের বায়'আত গ্রহণ করেন।

আকীদা, চূড়ান্ত উদ্দেশ্য, দ্বীনের বুঝ, লক্ষ্য, পথ, পাথেয়, শত্রুতা, মিত্রতার ব্যাপারে দ্বিমতকারীদের সাথে কোনো ঐক্য নেই। এতে বুদ্ধিবৃত্তিক অনৈক্য সৃষ্টি হয়। সঠিক শর্ত বাদ দিয়ে এ ধরনের ঐক্য গড়লে কেবল বিচ্ছিন্নতা ও ক্ষতিই বাড়বে। তৈরি হবে স্থবিরতা, বন্ধ হবে কাজের ময়দানের অগ্রগতি।

আমাদের দুর্গগুলো ভেতর থেকে ক্ষয়ে যাচ্ছে, কারণ আমরা ভ্রান্ত বিশ্বাস ও আদর্শধারীদের এখানে ঢুকতে দিয়েছি। ফলে আমাদের কাঠামোটাই হুমকির মুখে পড়ে গেছে। আমাদের দুর্গগুলো ভিড়ের চাপে হেলে পড়ছে। শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধই করতে পারছে না, পাল্টা আক্রমণ করবে কীভাবে? মুসলিমদের প্রতি আমাদের পরামর্শ হলো ভাঙন সৃষ্টিকারী এসব আবর্জনা দ্রুত পরিষ্কার করুন। তারা যদি এ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে, তা হলে উত্তম। যদি তা অগ্রাহ্য করে, তা হলে আমরা তো বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেছিই।

হক ও হকপন্থীদের ছাড়া আর কারো সাথে হাত না মেলানো শিখতে হবে।

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّـهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

"আর তোমরা সকলে মিলে দৃঢ়ভাবে আল্লাহর রজ্জু ধরে থাকো। আর

---

[৫৮৬] মু'জামুত তাবারানি : ১১২৬

[৫৮৭] আবু দাউদ : ৩০২৭

নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না।"[৫৮৮]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের ওপর বাধ্যতামূলক করেছেন যে তারা তাঁর কিতাব দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে এরই শরণাপন্ন হবে। তিনি আরো আদেশ দিয়েছেন বিশ্বাস ও কাজে কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে থাকার জন্য। এর ফলে ঐক্য বজায় থাকবে, অনৈক্য দূর হবে, দ্বীন ও দুনিয়ায় লাভবান হওয়া যাবে।"

আল্লাহ আমাদের আলিমগণকে রহম করুন। তাঁরা কতই-না জ্ঞানী ছিলেন! যারা ঐক্য চায়, অনৈক্য দূর করতে চায়, দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ চায়, তাদের অবশ্যই বিশ্বাস ও কাজকর্মে কুরআন-সুন্নাহর অনুগামী হতে হবে।

উল্লেখ্য, যেসব ফিরকার সাথে ঐক্য করা হারাম, তাদের থেকে দ্বীনি ও দুনিয়াবি প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা নেওয়া নিষিদ্ধ নয়। ঐক্য গড়া আর সহযোগিতা চাওয়ার মাঝে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। ফুকাহায়ে কিরাম কিছু শর্তসাপেক্ষে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করা বাহিনীতে কাফিরদের নিয়োগ করাও বৈধ করেছেন। কেউ কেউ খাওয়ারিজদের সাথে মিলে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয বলেছেন। কিন্তু কাফিরদেরকে আমরা আমাদের দলে নেব না, খাওয়ারিজদেরকে আমাদের মাঝে রাখব না। অতএব, ঐক্য করা ও সহযোগিতা চাওয়ার মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট।

[৫৮৮] সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩

ইবনু তাইমিয়াকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হকপন্থী আলেমদের কোথায় খুঁজে পাব?
তিনি বলেছিলেন, কারাগারে, যুদ্ধের ময়দানে, নয়তো মাটির নিচে।
এই জামানায় শুধুমাত্র হক কথা বলার কারণে নির্যাতন ভোগ করা আলেমের সংখ্যা কতই-না কমে গেছে! কাউকে হত্যা করা হয়েছে, কাউকে কারাবন্দি করা হয়েছে, কাউকে করা হয়েছে গৃহবন্দি।
"আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে" বইটি "মীসাকুল আমালিল ইসলামি" (ইসলামি কাজের রূপরেখা) গ্রন্থের অনুবাদ। এর লেখক তিনজন আলেম : ডক্টর নাজীহ ইবরাহীম, আসিম আবদুল মাজিদ এবং ইসামুদ্দীন দারবালাহ। মিশরের 'লিমান তুররাহ' কারাগারের ভেতর থেকে ১৯৮৪ ঈসায়ি সনের ফেব্রুয়ারি মাসে এটি প্রকাশিত হয়। বইটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ডক্টর শাইখ উমার আব্দুর রহমান, যিনি কেবলমাত্র হক কথা বলার অপরাধে আমেরিকার কারাগারে দীর্ঘ তেইশ বছর কাটিয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।
বর্তমান যুগে ইসলামি আন্দোলন কেমন হতে হবে, তার একটি পরিপূর্ণ রূপরেখা তুলে ধরেছেন লেখকগণ। 'আকীদা থেকে দাওয়াত, জিহাদ থেকে খিলাফা, তাকওয়া থেকে সবর—এই সবকিছু কীভাবে প্রতিটি মুসলিমের জীবনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একসাথে কাজ করে, তা দেখানো হয়েছে। আর সেই উদ্দেশ্য হলো পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। কারাবন্দি আলেমদের লেখনী থেকে উঠে এসেছে আজকের মুসলিমদের সার্বিক অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র।

সাহাবিরা কেন এত সফলতা পেয়েছিলেন? কেন বিশ্ব তাঁদের পদতলে মাথা ঝুকিয়ে দিয়েছিল? কী ছিল সেই গুপ্ত রহস্য, যার জন্যে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা বিশ্বের সুপার পাওয়ারে পরিণত হয়েছিলেন?

আল্লাহর দ্বীন। হ্যাঁ, আল্লাহর দ্বীনের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমেই তাঁরা সফলতা পেয়েছিলেন। আল্লাহর হুকুম এবং নবিজির শিক্ষা তাঁরা আঁকড়ে ধরেছিলেন বলেই আল্লাহ তাঁদের শাসন-কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। এটাই তাঁদের সাফল্যের নিগূঢ় রহস্য। আমরাও যদি সাফল্য পেতে চাই, হারানো গৌরব ফিরে পাবার তামান্না যদি আমাদের হৃদয়ে সত্যিই থাকে, তবে তাঁদের দেখানো পথেই হাঁটতে হবে। এ ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তাতেই সম্মান ও ইজ্জত নেই। নেই সাফল্য।

সাহাবিরা দিনের বেলায় ছিলেন অশ্বারোহী আর রাতের বেলায় সন্ন্যাসী। দিনের আলোয় তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন প্রবল বিক্রমে। আর রাতের বেলায় জায়নামাজে দাঁড়িয়ে বাচ্চা শিশুর মতন ডুকরে ডুকরে কাঁদতেন। নীরবে নিভৃতে অশ্রু ঝরাতেন। আমরাও যদি তাঁদের দেখানো পথ ধরে এগোতে থাকি, তবে নিশ্চয় সফলতার উচ্চশিখরে পৌঁছোতে পারব।